# নির্জন গঙ্গা

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক, ১৩৬০

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

কাল সারারাত নিষাদবাগে বড় ধুম ছিল। ধনপতি সরকারের মেয়ের বিয়ে। গাঁসুদ্ধ ছুঁড়িবুড়ি খুব নাচনকোঁদন করেছে। সরবতিয়ার মা, ওই যে পাড়াকুঁদুলি মেয়েটা—দিনমান যার বাড়িতে শ্যালশকুনের খেয়োখেয়ি, সেও মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাবুলিওয়ালার সঙ দিয়েছে। নয়নসুখের তিন বেটি—চঞ্চলা, অঞ্চলা, সঞ্চলা—হাত ধরাধরি করে মাজা দুলিয়ে নেচেছে। আর গলায় লহরা তুলে গান গেয়েছে এতোয়ারির বউ ফুলকলিয়া। কলাবেড়িয়ার মেয়েরা কত না ঠাট জানে! সেই ঠাটের একটুখানি দেখেই নিষাদবাগের মেয়েরা থ। ধনপতি সরকারের বুড়ি থুথ্‌ড়ি মা, যাকে ও মাসে ভুল করে চিতের চাপাতে নিয়ে যাচ্ছিল, তারও যেন পরমায়ু বেড়ে গেল এবং খাটিয়ায় সেই নিশুতি রাতের ডামাডোলে তালে তাল দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। ফুলকলিয়ার কত গয়না। রূপোর মল, বাজু, পাঁহুচি, নিকঁরি, চাঁদির কাঁকন। তিনটে হেরিকেনের ছটায় একশো ঝলমলানি। শেষে ঝমর ঝমর নাচও জুড়ে দিল। আর সেই ভিড়ের মধ্যিখানে বসে থেকেছে বিয়ের কনে সন্ধ্যামণি। মোটে তো বারোয় শরীরের আড় ভাঙেনি, গায়ে হলুদ মেখে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ছোট্ট জাঁতি হাতে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঢুলেছে আর ঢুলেছে। সেই কখন পুবের আকাশে উঠেছে ঝিকমিকি তারা। কখন দূর কাশিমবাজারের কারখানার পয়লা ভোঁ বেজেছে। তখন আসর গেছে ভেঙে। ধনপতি সরকারের উঠোনে খেজুর তালাইয়ে কত বহুবেটির আলুথালু গতরে দিনের প্রথম হাওয়া খেলেছে। উন্মোচিত স্তনের ওপর ঠোঁট রেখেছে শিশুর মতো দিনের প্রথম আলো। সবার কাপড়চোপড়ে চাপ চাপ লালরঙ লেগে আছে। সারা রাত পিচকিরিতে রঙ খেলেছে সবাই। এখন জখমী লাশের মতো পড়ে আছে মেয়েরা। আর বাড়ির সেরা পুরুষটি হুঁকোয় আগুন দিতে দিতে আড়চোখে উঠোন দেখতে দেখতে হাঁক দিয়েছে—হেই গে বহু-বহুড়ি! উঠ্‌ সব! উঠ্‌ যা।…

কাল রাতের নাচনকোঁদনটা বড্ড বেশি রকমই হয়েছিল। হবেই তো। ধনপতি সরকারের মেয়ের বিয়ে। দশ বিঘে ক্ষেতি যার, পাঁচ কুঠি আউশধান ফলে বছরে, বারোটা কলাগাছে বড় বড় কাঁদি ঝুলছে, বিশাল করেলার মাচায় থোকা থোকা করেলা ঝুলছে, বেগুন ক্ষেতে বেগুন, ঢ্যাঁড়স খেতে ঢ্যাঁড়স, গরু ছাগল হাঁস, জোয়ান ছেলে যার লিখাপড়হা শিখে পণ্ডিত হয়েছে এবং সাইকেলে চেপে কত কাজে-অকাজে দিনমান ঘোরে—ধনপতি সরকার নিষাদবাগের মোড়লমানুষ, তার মেয়ের বিয়ে।

এতোয়ারি মাটির মানুষ। কোন প্যাঁচে নেই। পাশের জায়গা সারারাত খালি পড়ে থেকেছে, তার তাতে কী? দিব্যি ঘুমিয়েছে। অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেছে। ভোরের দিকে একটা কুস্বপ্ন হল। বাড়ির নীচের নদী থেকে এক বিশাল শুওর গাঁক গাঁক করে উঠে আসছিল। এতোয়ারি গোঁ গোঁ করে উঠলে তার মা সরস্বতী ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তারপর বুড়ি ক্ষেপেছে। বেটার পাশে বহু নেই সারারাত—কোথায় আছে তাও জানে, কেন আছে সেও তো অজানা নয়। তক্ষুণি গেছে ধনপতি সরকারের বাড়ি। চুল ধরে টেনে তুলেছে বহু ফুলকলিয়াকে। তারপর যা হবার হল।

তো এতোয়ারি মাটির মানুষ। উঠোনে বহুর ওপর মা তম্বি করছে দেখতে দেখতে নির্বিকার মুখে জামবাটির ছাতু শেষ করেছে। জল খেয়ে ঢেকুর তুলেছে। তারপর ঘরের কোণা থেকে 'বাঁইক' নিয়ে দুধারে দুটো মস্তো ঝুড়ি ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেছে গাঁওয়ালে। দুই ঝুড়িতে আছে মরশুমের পেঁয়াজ, রশুন, কয়েক থড়ি পাকা কলা, সের তিনেক উচ্ছে, এইসব। আজ এলাকায় কোথাও হাটবার নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেচবে। ফিরতে সেই মুখঢাকা আঁধার। নদীর তলায় যেটুকু জল আছে, তাতেই গতরের ঘাম ধুয়ে লোকটা ঘরে ফিরবে।

আর ফুলকলিয়া কিনা ওপারের কলাবেড়িয়ার মেয়ে। আরে ছো-ছো! নিষাদ-বাগের এরা আবার মানুষ নাকি? ভূত পেরেতের দল। যত দিন যাচ্ছে, তত ধরা পড়ছে ভেতরকার গুমোর। না আছে পয়সা কড়ি, না ক্ষেতি। এরা গান গাইবার জোর পাবে কোথায়? নাচবেই বা কেমন করে? ছুঁড়িগুলোর গতর সব পাটকাঠির মতো। ফুলকলিয়া ইচ্ছে করলেই মুটমুট করে সব ভাঙতে পারে।

পারতই তো। শাস-ঠাকরুণটিকে তিন টুকরো করতে পারত। করল না, তার বেটার ভাগ্যি আর নিজের বাবার হুকুম। যতবার আসে পইপই করে বলে যায়—মা ফুলি গে! জেরা ঠাহর কারকে শুন বেটিয়া। কভি শাসকী সাথ মুখড়া না কিবি। খবর্দার গে!

তাই 'মুখড়া কিবে নাই' ফুলকলিয়া। আর সেই জ্বালা বুকে চেপে চলে এসেছে শ্মশানের ধারে বটতলায়। মোটা লম্বা যে শেকড়টা নদীর গা বেয়ে নেমেছে, তার ওপর চুপচাপ বসে আছে সেই সোঁরাতকাল থেকে। ঘন ছায়ার মধ্যে দুধে খড়িসের মতো গায়ের রঙ ফুলকলিয়ার। গা-ভরা রূপোর গয়না। ছলছল বড় দুটি চোখে একটুখানি লালের ঘোর লেগেছে। শাড়িটাও লালে-হলুদে বিচিত্তির। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখছে নদীর ওপারে টানা সবুজ গ্রাম-রেখা। তার সারা ছেলেবেলা জড়ো হয়ে আছে ওই কলাবেড়িয়ায়।

এ নদীর নাম ভাগীরথী। লোকে বলে গঙ্গা। এখন শুখার দিনকাল। শুকনো বালির চড়া আগলেগোছে সরিয়ে কয়েকফালি কালো জল পটুয়ার তুলির টানের মতো চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। একটু দক্ষিণে এগোলে দহ কিছুদূর। থমকানো গাঢ় কাজল জল, কিন্তু স্বচ্ছ। তলার বালিতে অভ্রের কণা রোদে ঝিকমিক করে। নীলচে শ্যাওলায় ঠোঁট ঘষে বেড়ায় মৌরলার ঝাঁক। নিষাদবাগের নাহানের ঘাট এখন ওখানে সরে গেছে। বটতলার ওপাশ দিয়ে নীচু বাঁধের পথে নাহানে যাচ্ছে গাঁয়ের লোক। ফুলকলিয়া ঝুরির আড়ালে বলে নজর চলে না। নয়নসুখের করেলা মাচানের ওপাশে কারা কোঁদল করছে। নিষাদবাগের মেয়েরা বড্ড কুঁদুলি। যাও না কলাবেড়িয়ায়—দেখে এসো কী শান্তি কী সুখ! খাঁ খাঁ পথঘাট। সবাই ক্ষেতির কাজে মত্ত. নয়তো গাঁওয়ালে সব্জী বেচতে চলে গেছে। দুচারজন বুড়ো-বুড়ি আছে। তাদের বা-চা নেই। ঢ্যারা ঘুরিয়ে শনের দড়ি বানাচ্ছে। চোখে উদাস চাউনি। হেই মা গে! কাঁহা তেরা বিটিয়া, কঁাহা তু চলা গেইলা যে—সব ছোড়কে মা গে …!

হঠাৎ হু হু করে কান্না আসে ফুলকলিয়ার। বাপসোহাগী বেটিদের বরাতে অনেক দুখ্—তার মা বরাবর বলত।

এর মধ্যে বারতিনেক এসেছে এতোয়ারির বোন ছোটি।—বহুদিদি গে! মা বোলাইছে। ঘর আ।

—যা যা! ঘর যাবে না ফুলকলিয়া। ভারি তো ঘর। পাটকাঠির বেড়া, শনের চালে এক বোঝা আউশ খড় চাপানো। সেই বেড়ায় মাটির লেপন দেবারও সাধ্যি ছিল না মড়াখাকী বুড়িটার। ফুলকলিয়া এসে গুঁড়ো দুধের মতো নরম সুন্দর মাটি পুরু করে লেপেছে। তার ওপর খড়িগোলা রঙে এঁকে দিয়েছে পাখি পদ্মফুল লক্ষ্মী-মায়ের চরণ। দূর দূর! নিষাদবাগের মেয়েরা জানেই বা কি?

বহুদিদি গে! ঘর আ।

বোঁচা সিকনিঝরা ছুঁড়িটা তো বড্ড জ্বালায়। ফুলকলিয়া ঢিল কুড়োবার ভঙ্গী করেছে। তখন হাসতে হাসতে পালিয়ে বাঁচে ছোটি। বহুদিদিকে তার এ্যাদ্দিনে অনেকটা চেনা হয়ে গেছে। এত রাগ, অত রাগ, বেলা গড়ালে আবার মুখে হাসির খই ফোটাফুটি। পেতলের ঘড়া কাঁখে নিয়ে মাজা দুলিয়ে বেরোবে ঘর থেকে।—আ গে ছোটি, নাহানে যাই গাঙ্গমে।

দহের জল তোলপাড় করে ননদ-ভাজ নাহান করবে। ওপরে হাজার হাজার নাকি লক্ষ নাকি কোটি বছরের ঈশ্বরের বাথান। নীল ধুধু শূন্য বাথান। হেই ঠাকুরবাবা, কাঁহা তেরা কালা ভঁইসাঠো? গাঁক গাঁক করে শিঙ নেড়ে পুবে কী

পশ্চিমে একবার হাঁক দিক। গাছগাছালি তোলপাড় হোক। শিল পড়ুক। ননদ-ভাজ আঁচলভরে কুড়োবে। দুনিয়ার ছাতি হু-হু-জলে যায় এদিকে। পিয়াসী চিড়িয়া বাজপড়া শিমুলগাছের ডালে একলাটি কাঁদে ফ-টি-ক জ ল।

এই রুখা গরমে মেজাজ ঠিক থাকে না মানুষের। সজীব পাতায় সবুজ জলে যায়। ঠাহর করে দেখ, ধোঁয়া উড়ছে। আমড়ার ডালে দাঁড়কাক ডাকছে। দিনদুপুরে অলক্ষণ। খালডোবার ফাঁকে বুকডুবিয়ে জিভ বের করে হাঁপায় গাঁয়ের নেড়ী কুত্তারা। ক্ষেতে ধানপাট শুকিয়ে খড়ি-খড়ি হয়েছে। হেই ঠাকুরবাবা, জেরাসে কিরপা কর।...

বহুদিদি গো! হুই দেখ, মা নিকালিস। দূর থেকে ছোটি ডাকে।

তোর মা খিড়কির দরজায় বেরিয়েছে তো কী হয়েছে! যা, যা, ভাগ। ঘর যাবে না ফুলকলিয়া। মরদেঠা ঘরে ফিরুক, বিচার করুক—তা'পরে কথা।

এতোয়ারীর মা সরস্বতী কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করে বহুকে খোঁজার চেষ্টা করছে। এই ঘন ছায়ার মধ্যে দুধে খরিসের মতো বসে আছে বহু। দেখতে পেলে তো! এত নজর বুড়ির নেই। একটু পরেই ছোটি গে বলে দুটো হাঁক মেরে সে বাড়ি ঢুকে পড়ল।

নেহাৎ বরাতটাই মন্দ। নয়তো এই আজেবাজে গাঁয়ে ফুলকলিয়ার বিয়ে হয়? এই গাঙ বরাবর চলে গেলে রাধারঘাট—তার ডাইনে জেলার সদর শহর। তাও ছাড়িয়ে চলে যাও। সৈদাবাদ ছাড়িয়ে ফরাসডাঙা পেরিয়ে নদীর পাড়বরাবর—যত পুরনো শহর, নসীপুর-লালবাগ জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ ছাড়িয়ে আরো চলো উত্তরে। তার পর পাবে ধন পত্তনগর। জঙ্গীপুর শহরের কোল ঘেঁষে ছোট্ট সবুজ গ্রাম। সেখানেই তো বহু হবার কথা ছিল ফুলকলিয়ার। হাজার হলেও লিখাপড়হা জানা লোকের গাঁ। তারা ফুলকলিয়ার মর্যাদা বুঝত। আর ছেলেটাও ছিল পণ্ডিত। নিষাদবাগের ধনপতির বেটার চেয়েও বড় পণ্ডিত। তো ফুলকলিয়ার বরাত। সব ঠিকঠাক হয়েও ভেস্তে গেল। ফুলকলিয়া যে লিখাপড়হা জানেনা!

আরে, জানেনা তো কী হয়েছে! মেয়েরা পণ্ডিত হয়ে কলম চালাতে কাছারি যাবে, না সাইকেল চেপে বাবুদের গদীতে আনাগোনা করবে? রূপ দেখ, স্বাস্থ্য দেখ—বাস! হায় ঠাকুরবাবা, কী হাল হয়েছে মানুষের—রূপ দেখে না, বলে ইলেমদার ঔরত চাই! ফুলকলিয়ার বাবার হাঁটু অব্দি ধুলো—পা ধোবার আগেই গুড়জল খেয়ে শান্তবান্ত হয়ে জানিয়েছিল—ছোড় গে, ছোড় দে। সব উল্টা বাত।...

আর বড় অভিমান হয়েছিল ফুলকলিয়ার। তার মনে শুভদিনে এক স্বপ্ন।

উত্তরের আকাশ থেকে দিগন্তে দৃষ্টি পড়তেই সরমে মন গুটিয়ে যেত। এই নদীতে যে স্নিগ্ধ সুন্দর রূপের ধারা শরীরে শান্তি দিতে চলে আসছে, তার মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে একজন জোয়ানের চেহারা দেখা দিত। আহা এমনও তো হতে পারে—আজ সকাল-সকাল সে নাহান করেছে, এবং সেই সুন্দর শরীরে স্বাদেভরা জল এতক্ষণে কলাবেড়িয়ার ঘাটে এসে পৌঁছেছে ফুলকলিয়ার জন্যে! বুক ডুবিয়ে বসে থেকে সে কী সুখ ছিল মেয়ের!

তারপর তো দিনগুলো চলে গেল। কলাবেড়িয়ার ঘাট থেকে জল শুকিয়ে কমে এল মাঝবরাবর। তির তির করে কয়েক ফালি ধারা বয়ে যায়। ফুলকলিয়া দুঃখে রাগে পায়ের পাতা ডোবাতে গিয়ে সরে আসে। পা পুড়ে যায় যেন।

হেই বহু! ফুলি গে! হুয়া ক্যা গে? এঁ্যা? দেখো, দেখো মেয়ের কাণ্ড!

নির্মলা নাহানে যাচ্ছিল। কাঁধে রঙীন গামছা, হাতে সাবানের কৌটো। নিয়াদবাগের এই একটি বউ কাকের ঝাঁকে ময়ূরী। ফুলকলিয়া কতবার ভেবেছে ওর সঙ্গে গঙ্গাজল পাতাবে। কত মজার-মজার কথা জানে নির্মলা। দুনিয়াটার অনেক বেশি পরিচয় তার জানা। হবে না? ওর পুরুষ সজী বেচে না। পাটের দালালী করে মরশুমে। আবার চৈতালী উঠলে শহরের মহাজন যখন তল্লাটে আসে, তখন সে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। সারা দিন সে পড়ে থাকে শহরের গদীতে। তারও একটা সাইকেল আছে। অল্পস্বল্প লেখাপড়াও জানে। পকেটে নোটবই আর কলের কলম থাকে। ফুলকলিয়া ভাবে ধনপতনগরের পুরুষটিও কি এমনি ছিল?

খিলখিল করে হাসতে হাসতে দৌড়ে আসে নির্মলা। ক্যা গে? ক্যা হুয়া তেরা?

যেই না কাছে এসে ধুপ করে বসে কাঁধে হাত রাখা, ফুলকলিয়া হু-হু করে কেঁদে ওঠে আবার। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জানাতে থাকে সব। শাস মার দেইলা। হুঁ, চুল পাকাড়কে মার দেইলা! মড়াখাকী বুড়ি! আজ বাদে কাল ওই শ্মশানে ভুট্টাপোড়া হবে। শ্যাল শকুনে ছিঁড়ে খাবে দেখে নিও। ও পুড়বে ভাবছ? মোটেও না। পাথর। স্রিফ পাথর। পরের বেটিকে সবার চোখের সামনে মার লাগাল?

নির্মলা তবু হাসে। শাস পিট্টি দিয়েছে তো কী হয়েছে। আরে, এই তো রেওয়াজ। নির্মলার শাস বেঁচে থাকলে নির্মলাও পিট্টি খেত। বহু-বেটিদের জন্ম তো শাসের হাতের পিট্টি খেতে। তো ওঠ। চল, গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়োবে। দেখবি, তখন কী শান্তি, কী আরাম!

চোখ মুছে তাকায় ফুলকলিয়া। নির্মলা যা বলছে, তা ঠাট্টার কথা সে বোঝে। হুঁ তুমি হলে কী করতে বহিন? বলছ তো ভাল। বলো, কী করতে—যদি শাস ঠুকনি দিত!

হামি? নির্মলা ঠোঁট টিপে হাসে। হামি কুছ না বলত। আরে, আমি তো জওয়ান বেটি। বুঢ়টি মেয়ের হাতের জোর কোথায় যে হামাকে ব্যথা বাজাবে? মার, যেত্তা খুশি মার!

ঠোঁট উল্টে ফুলকলিয়া বলে—বাবার কাছে খবর ভেজছি। দেখো না বাবা কী করে।

নির্মলা ওর গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে চাপা গলায় বলে—ছোড় বাত। শুন রী ফুলি। আজ বিকালমে মেরা সাথ শহর যাবি? এতোয়ারিদা ফিরতে ফিরতে আমরা ঘরে এসে যাব। যাবি? চুপসে যাবো, চুপসে আবো।

উঁ? একটু অবাক হয়ে তাকায় ফুলকলিয়া।

আ রী, শাসের ডর আর করিস না…ফিসফিস করে নির্মলা বলতে থাকে। শাশুড়ীটাকে সে কায়দা করে সামলে নেবে। বুড়ি নির্মলার কাছে দুটো টাকা ধার নিয়ে এসেছে কাল। নির্মলা বলবে, বহুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। রিকশোতে যাবে। রিকশোতে আসবে। যাবে কি না ডাগদারের কাছে। তো ফুলকলিয়ারও ছেলেপুলে হওয়া দরকার। এখনও কোন লক্ষণ নেই, এতো ভাল কথা নয়। ডাগদার পরীক্ষা করে দেখুক। টাকা পয়সা সব খরচ নির্মলাই করবে।

শুনে ফুলকলিয়া বলে—উও বিশোয়াস করবে না।

করবে—ওর ঠাকুরবাবা করবে। নির্মলা একা মেয়েমানুষ যেতে ভরসা পাচ্ছে না বলেই তো সরস্বতীর বহুকে ধার চাচ্ছে একবেলা। হামি তুমকো রূপেয়া উধার দিইস, তুম হামকে বহু উধার দো না গে!

বলে খিলখিল করে হেসে ওঠে নির্মলা। আর এতক্ষণে ফুলকলিয়াও হাসে। সব দুখ চাপা পড়ে গেছে এতক্ষণে। তো সত্যি কি ডাগদারবাবুর কাছে যাবে দিদি?

নির্মলা চোখ নাচিয়ে জবাব দেয়—নেহ রী। ছেনিমা, ছেনিমা দেখব। সমঝা?

ছেনিমা? পটের বাজী? সাচ?

সাচ। তেরা বেটাকা কিরিয়ারী!

চাপা তোলপাড় বুকে নিয়ে ফুলকলিয়া তার পেট থেকে নির্মলার দুষ্টু হাতটা সরিয়ে দেয়। ছেনিমার কথা ছেলেবেলা থেকে সে শুনে আসছে। শহরের মাত্র ক্রোশটাক দূরে বাড়ি—কতবার শহরে গেছে বাবার সঙ্গে। কত কী দেখা হয়েছে। শুধু ওই জিনিসটাই বাদ পড়েছে। তাই বলে বাবাকে মুখ ফুটে বলা তো যায় না।

আর আসলে বাবার মত হচ্ছে, ছেনিমা দেখলে বহুবেটির মাথা বিগড়ে খারাপ হয়ে যায়। ফুলকলিয়া ভেবেছে, বাবা যখন বলছে, তখন তাই ঠিক। কিন্তু এমন অনেক বহুবেটি আছে, অবশ্য খু'ই কম তাদের সংখ্যা—যারা ও জিনিস দু একবার দেখে এসেছে—তারা খারাপ হয়েছে কি? কে জানে ভেতর-ভেতর কে কতটা কী হল, কেমন করে বুঝবে? ফুলকলিয়ার দুনিয়াটা খুব ছোট। সেই দুনিয়ায় ছেনিমা জিনিসটা এত দিন ধরে বাদ পড়ে থাকা ঠিক হয়েছে, না ভুল হয়েছে বলা কঠিন। বাবার অনেক মতামতই সে বিশ্বাস করে না। যেমন বাবা বলে, ছটপরবের দিনে নোনতা খেলে মুখ চিরকালের মতো নোনতা হয়। কিন্তু ফুলকলিয়া ইচ্ছে করেই একবার নোনতা খেয়েছিল। মাঝে মাঝে এই ধরনের ছোটখাট বিদ্রোহ করা তার স্বভাব। যেমন, কাল রাতের ব্যাপারটা। নেচেকুঁদে ধনপতি সরকারের উঠোনে আরও পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শুয়ে পড়া তার উচিত ছিল না। সে গাঁয়ের নতুন বহু। অন্যদের মতো পুরনো হোক, তখন সব সাজবে। এখনই কেন?

ফুলকলিয়া চুল ঝটপট বেঁধে উঠে দাঁড়ায়। বুকের ভেতর চাপা আবেগ অথচ কী ভয় ভয় আবছা চমক খেলে। দ্বিধার ঝিলিক দিগন্তের আবছা মেঘে বিদ্যুতের মতো চনমন করে ওঠে তবু! সত্যি কি সে খারাপ হয়ে যাবে—মাথা বিগ'ড় যাবে? শেকড়-বাকড়ের মধ্যে চঞ্চল পা ফেলতে গিয়ে টের পায় উরু দুটো ভারি হয়ে গেছে যেন। আর নির্মলা তার একটা হাত আলগোছে ধরেছ। এখন একেবারে চুপচাপ। ওর ঠোঁটের চাপা হাসিটা একবার ঘুরেই দেখতে পায় ফুলকলিয়া এবং একটু ছমছম করে গা। পরমুহূর্তে ভাবে, নির্মলার সঙ্গে তার জমে ভাল। গঙ্গাজল পাতাবার ইচ্ছে আছে না? এ মাসেই একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে সেটা চুকিয়ে নেবে। বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে সে।

বটতলার পর ডাইনে শ্মশান। ওপরে নীচু বাঁধ। বাঁধের দুধারে আকন্দ সাইবাবলায় ঝাড়। ঝোপে সোমলতার ঝালর। জাম, জারুল, হিজলের ঠাসবুনোনি এখানে ওখানে। তার ফাঁকে কুমড়ো তরমুজ শসাক্ষেত। লাঠির ডগায় মড়ার মাথা বসানো। কাকুর ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া। ঘাটের দুধারে সরবত্তি শকরকন্দের ক্ষেত। বাবল কাঁটার বেড়া। নির্মলা হঠাৎ মা রী বলে অস্ফুট ককিয়ে হেঁট হয়। কাঁটা তুলে ফেলে থুতু ঘষে। অশ্লীল গাল দিতে থাকে চাপা গলায়। ফুলকলিয়া বলে—চুপ চুপ। হুই দেখো, সরকারজী মাচায় বসে হুঁকো খাচ্ছে।

হুঁ, সরকারজীর মেয়ের বিয়ে। আজই তো বর আসবে বাবলবুনিয়া থেকে। বাড়িতে কত কাজ। তা ফেলে চলে এসেছে সরবতীর ক্ষেত দেখতে। হিজলতলার মাচায় বসে হুঁকো খাচ্ছে। নির্মলা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে—সরকারজী! জান মার দিইস বাবা! এত্তা কাঁটা! হামি আগ জ্বালিয়ে দেব, হুঁ!

ধনপতি সরকার হুকো নামিয়ে হেঁড়ে গলায় বলে—কৌন গে ?

—হামি নির্মলা।

—কুছ্ বলিস্ বেটিয়া ?

—হাঁ বাপ। বলিস কী আগ লাগা দেগা তেরা কাঁটামে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিকট হাসে ধনপতি সরকার। বুকের লোমগুলো সাদা হয়ে গেছে, অথচ মাথার চুল কুচকুচে কালো। মাচা থেকে উঠে গেরিলার মতো দুলতে দুলতে আসে এদিকে।—উও কৌন গে—এতোয়ারিকা বহু ? বেটিয়া, তেরা শাস কুছ বোলিস শুনা। আভি শুনা। হামকো ভি গাল দিইস বহুৎ !

ফুলকলিয়া খুব উৎসাহ পায়। মাথাটা জোরে দোলায় সায় দিতে। ভাবখানা এই, তুমি স্বয়ং গাঁয়ের পঞ্চায়েতমোড়ল। তোমার বেটার বিয়েতে গিয়েই আমার কপালে এত লাঞ্ছনা। তার ওপর তোমাকেও গালমন্দ দিয়েছে। দেখি এবার মোড়লের বিচারটা কী দাঁড়ায়।

নোনা আতা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ধনপতি বলতে থাকে—তিন পুরুষ কেটে গিয়ে চার পুরুষ পড়েছে নিষাদবাগে। তোমার শাশুড়ীর মতো হিংসুটে মেয়ে কখনও দেখা যায় নি, বেটি। ধনপতির বাবা রঘুপতি, তার বাবা মহাপতি (মহীপতি) এই তিনপুরুষ। মহাপতিয়া ছিল হনুমানজীর মতো দেবতা মানুষ। পূর্ণিয়া থেকে পায়দল আসছিল ভাগীরথীর দিকে। তো এল, কিন্তু মাটি পছন্দ হল না। তখন হাঁটতে থাকল। দিনরাত হেঁটে মুখসুদাবাদ পৌঁছল। তারপর পোঁহাতে উঠে ফের হাঁটতে হাঁটতে বহরমপুর শহর ছাড়িয়ে দুনিয়ার শোভা দেখতে দেখতে নিষাদবাগে এসে দাঁড়াল। বিলকুল জঙ্গল আর জঙ্গল। বাঁধের দুদিকে গেরস্থালির ঝুড়ি, পিছনে বহু, তার কোলে রঘুপতি স্তন চুষছে। তো ঠাকুরবাবা বাতাসের ভাষায় বললেন, বেটা, পঁহুছ গেয়া ! ব্যস ! মহাপতিয়া ঝুড়ি থেকে কোদাল নিয়ে মাটিতে কোপ দিল। মাটি ভি কথা বলল। যাক গে, সে সব বড় পুরনো কথা।

তখন নির্মলা চলে গেছে দহের ঘাটে। গিয়ে হাত তুলে ইসারা করছে ফুলকলিয়াকে। ফুলকলিয়া যায় কেমন করে ? ঘোমটা প্রচুর টেনে মাথা দোলাচ্ছে আর দোলাচ্ছে। নতুন বউ। গাঁয়ের মুখিয়ার কথা না ফুরোলে যাওয়া যায় না।

তো বেটি, তেরা শাস—শাশুড়ীর কবে না পঞ্চায়েতী হয়। কতবার ওকে বাঁচিয়েছি। গ্রাহ্যই করে না। আজ সকালে গিয়ে মুখে যা না তাই উগরে এল আমার বাড়িতে। বাড়িভরা কুটুম্ব। আমি কিনা মোড়ল মানুষ। শুভ কাজের দিন বলে কান পাতলাম না। বুঝিয়ে-বাঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।…বলেই ধনপতি বড় বড় পা ফেলে পিছনে বাঁধের দিকে দৌড়তে থাকে।

হু, কার একপাল ছাগল ঢুকে পড়েছে। ফুলকলিয়া আরো একটু দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ী কী নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়েছিল সে খুঁজে পায় না।

অ রী ফুলিয়া! বুঢ়াঁকা সাথ ক্যা এত্তা বাত রী? নির্মলা চেঁচায়।

দহের ঘাটে ভিড় থই থই। মোড়লের মেয়ের বিয়ে। তাই অনেকেই আজ গাঁওয়ালে যায়নি। নয় তো খাঁ খাঁ করে থাকত ঘাট। মাঝে মাঝে কিছু বাচ্চাকাচ্চার ঝাঁক আসত। বুড়োবুড়িরা এসে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। হাঁটতে শিখলেই মানুষ তখন কাজের যন্তর। কাজ তাকে করতেই হবে। মেয়ে হও, বা পুরুষ—ন্যাংটা হও কিংবা কাপড় পরার বয়স পাও, গতর না খাটিয়ে পার নেই। একটুখানি বসে থাকলেই তারপর কোন এক সময় দেখবে হাঁড়ি খালি। পেটের কুত্তা কুঁইকুঁই করে কাঁদছে। তাই ওঠ, গতর লাগাও। গঙ্গা মা তাঁর দুধারের মাটিতে অমৃত মিশিয়ে রেখেছেন। নরম সাদা জমানো দুধের মতো এই মাটি বড় উর্বর। একটু মেহনত করলেই মুখিয়ে উঠবে এক চিলতে জীবন—তার রঙ ঈষৎ হলুদ। সেই হলুদ একদিন গাঢ় সবুজ হবে। তখন তোমার সুদিন। কুমড়ো ফলাও। শকরকন্দ সরবতী আলুর লতা পোঁতো। শশাক্ষেতে শ্মশান থেকে মড়ার মুণ্ডু এনে টাঙিয়ে রাখো। শহর থেকে আনো ইঁদুরমারা বিষ। আর বিষই বা কতরকম আছে। মরশুমে মরশুমে কত সব্জী কত শস্য—তেমনি তার কত শত্তুর।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্ন সৃষ্টি করলেন। সে এক ঔরত। ঢলো ঢলো লাবণ্য তার। তো মানুষ বললে, ঠাকুর বাবা! শুধু শুথা অন্ন যে গলায় আটকে যায়! তখন অন্নরানীর দুই পাঁজরের মাংস থেকে ব্রহ্মা ঠাকুর বানালেন দুই ঔরত—ভুরি ঔর ভারি। একজনকে বললেন—তুই থাক বেটি মাটির ওপরে। আরেকজনকে বললেন—তুই চলে যা মাটির তলায়। তো এই দুই ঔরতের জিম্মাদারী দিলেন যাকে—তার থেকেই তাদের জন্ম। মানুষকে তরিতরকারী যোগাতেই তাদের জীবন কাটে।

সেই জীবনের বহুৎ দুখ। মেয়েদের দেখনশোভা চুলের রাশি যায় চেপ্টে, আর পুরুষের কাঁধে ভারবওয়া কালো ছোপ পড়ে যায়। নিষাদবাগের দু তিনটি মানুষের বরাত—তাদের এই দুঃখ নেই। যেমন নির্মলা আর তার বর শরৎ, আর যেমন ধনপতির লিখাপড়হা জানা ছেলে সূর্য। স্বয়ং ধনপতির কাঁধে কালো ছোপ রয়েছে। তার ছেলে সূর্য হাত ফুল ফুল পা ফুল ফুল চেকনচাকন গতর। খদ্দরের পানজাবি পরে। কাঁধে ঝোলা অবশ্য থাকে। তাতে কাগজ পত্তর এক ছটাকও ওজন নয়।

লখিয়ার মা নাক তুলে সাবানের গন্ধ পেতেই মুখ বাঁকা করেছে। সোডায় সেদ্ধ কাপড় কাচছে সে। আপন মনে গজগজ করছে। তার গায়ে ফুলকলিয়ার ছায়া পড়তেই মুখ তোলে আবার।—শাস মারিস তোকে? কাহে গে?

গা জলে যায় ফুলকলিয়ার। যেন দুনিয়ায় একটা নতুন কাণ্ড ঘটেছে। ছ মাহিস্! উসকী তাকত বড়ী! গাল দিইস্ দুচারঠো।

লখিয়ার মা কিন্তু হেসে ফেলে। উ বড়ী হাতউয়ালী ঔরত। ছোড় দে বেটি। তবে কথাটা হচ্ছে, সরস্বতী দিদি যতই দজ্জাল হোক, মনটা খুব নরম। আসার সময় কেঁদেকেটে বলছিল লখিয়ার মাকে—বড় ঘর দেখে বিয়ে দিলাম বেটার। বড় ঘরের বেটি। সারারাত ইদিকে বেটা আমার 'নিদের ঘোরে গোঁ গোঁ করল কুস্বপ্ন দেখে। আমি না থাকলে কে জাগাত, শুনি? বুঝলি দিদি আমার, রাগ কিসের—দুঃখই বা কিসের? আজ যদি আমি মরি, ছেলেটার দুর্দশার চূড়ান্ত হবে। সাদাসিদে গোবেচারা ছেলে। খিদে পেলেও টের পায় না, যদি না মনে করিয়ে দিই। গাঁওয়ালে গিয়ে কী কাণ্ড করে শোন। এখনও বাটখারা চেনে না। দু'সের পটল বেচে একসেরের দাম নেয়। রোজ রোজ এই রকম কাণ্ড। তাই দেখেশুনে ভালঘরের বুদ্ধিমতী মেয়ে আনলাম। ওকে আকেলদারি শেখাক। তো হা ঠাকুরবাবা! এ বেটিও যে তেমনি দুধে ধোওয়া কাপড়!··

এই সব শুনে ফুলকলিয়া নরম না হয়ে পারে না। বলে—কুছ না কাকী, ছোড় দে।

নির্মলা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—আয় রী! তোকে সাবান মাখাই।

সরমে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ফুলকলিয়ার। ঘাটে দুচারজন পুরুষ মানুষও আছে। তাদের সামনে এ কী কথা! সে অস্ফুট স্বরে বলে—নেহী রী।

নির্মলা খপ করে তার হাত ধরে টানে। ফুলকলিয়া হুড়মুড় করে জলে পড়ে যায়। আর নির্মলা তার সাদা সাবানটা ওর গলার কাছে ঘষতে ঘষতে বলে- চুপচাপ বৈঠা থাক। বাত করিলে শালকা মাফিক মার দেগা।

ঘাটসুদ্ধ লোক ঘুরে দেখছে আর হাসছে। কচিকাঁচারা হাততালি দিচ্ছে। আজ নিষাদবাগের মোড়লের বাড়ি বিয়ে। এমনদিনে এমনটি তো হবেই। কতজনের কাপড়ে লাল রঙ। কালরাতে পিচকিরি ভরে লাল রঙ ছড়িয়েছে ছেলেরা। ফুলকলিয়াকেও রেহাই দেয়নি। সেই লাল রঙ সাবানের ফেনার সঙ্গে মিশে ফুলকলিয়ার গা লালচে হয়ে উঠেছে। লখিয়ার মাও শেষ অব্দি বলে—আচ্ছাসে পাথলা কর বেটিকে। ওর শাস ভাববে—এ যে এক রাজার বেটি রাজকন্যে। রূপের বাহার খুলবে। তখন কোন সাহসে গায়ে হাত তুলতে যায়?

ফুলকলিয়া হার মেনেছে। চুপচাপ বসে আছে হাঁটু জলে। নির্মলা হাসছে আর তার বুকের কাপড়ের তলায় সাবান ঘষছে নিলাজে। গঙ্গার দহে সূর্যের ঝলমলানি। এখনও দুপুর হয়নি। দূরে বালির চড়ায় শকুন বসে আছে। ওপারে

ধূসর কলাবেড়িয়া যেন চোখে খুশি নিয়ে তার এক বেটির কদর দেখে তারিফ করছে।

মুখে ঘষতেই মা রী বলে আর্তনাদ করে ওঠে ফুলকলিয়া। তারপর পিছনে চলে যায় গভীর জলের দিকে। কার সঙ্গে ধাক্কা লাগে গ্রাহ্য করে না। মুখ তুলে চোখ কচলায়। নির্মলা ততক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ফুলকলিয়া বারবার ডুব দেয়। কতক্ষণ পরে নির্মলা পাশে এসে ফিস ফিস করে বলে—কিসকা সাথ ধাক্কা খাইস রী? মা গো মা। ধনপতি বুঢচাকা বেটা সুরুজ!

আ ছি ছি! চমকে দ্রুত ঘোরে ফুলকলিয়া। হ্যাঁ সূর্য। মুখ ফিরিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে গায়ে গামছা ঘষছে। ঘাটে সূর্য ছিল, পোড়ার চোখ দুটো তাও লক্ষ্য করেনি। আর নির্মলার কী আক্কেল! ছিছি! গাঁয়ের মাথা-লোকের বেটা লিখাপড়হা জানা পুরুষ মানুষটার সামনে এ কেলেঙ্কারি হয়ে গেল! মেয়েদের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কথা উঠবেই পঞ্চায়েতে।

আর কে কে দেখল ব্যাপারটা—ঘুরে দেখতে দেখতে আবার আঁতকে ওঠে সে। ঘাটের ওপরে বেড়ার ধারে ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে আছে তার শাশুড়ী। হাতে ছাগলের দড়ি। ছাগলটা এদিক ওদিক টানাটানি করছে। বুড়ি ঠায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে।

ফুলকলিয়া আপন মনে হিস হিস করে বলে—ছোড় দে রী! হুঁঃ!

## ॥ দুই ॥

সমাজের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয়েছে এতোয়ারির। বেশি মানে কতো, সে-হিসেব এতোয়ারি দিতে পারবে না। সে ওর মা জানে। আর জানে ধনপতি মোড়ল, নয়নসুখ, মেনকা কিংবা আরো জনাকতক বুড়োবুড়ি। সেই যেবার খরায় দিনদুপুরে আগুন লেগে নিবাদবাগ বিলকুল ছাই হয়ে গিয়েছিল, গঙ্গাবাঈজীর দহে একহাঁটু মাত্র জল ছিল, ক্ষেতের শস্য শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাচ্ছিল—সেইবার এতোরিয়ার মা সরস্বতী তাদের গাবগাছটার তলায় মোটাসোটা একটা বাচ্চা বিইয়েছিল। সেদিন ছিল মহল্লার হাটবার। রবিবার। তাই বারের নামে বাচ্চার নাম হয়েছিল এতোয়ারি। ভাগ্যিস সরস্বতী সেদিন হাটে যায়নি।

গেলেই বা কী হত! শরতের বউ নির্মলা বলেছিল এতোয়ারির বিয়ের সময়। গেলে এতোয়ারিদার নাম হত হাটু! আর তাই শুনে যার নাম হাটু, নয়নসুখের ভাগ্নে—সে খামোকা রেগে আগুন। হাটে গিয়ে মায়ের পেটে ব্যথা উঠল আর পাশের স্কুলবাড়ির পিছনে কাঁঠা ফুলের ঝোপে বাচ্চা বিয়োল—তাতে দোষটা কী

হয়েছে? ঠাকুরবাবার এই দুনিয়ায় যেখানে হোক, তুমি জন্মাও, বাঁচো, বিয়ে করে ছেলে-পুলের বাপ হও—এটাই তো নিয়ম। হাঁ গে নির্মলাবউদি, এক হি বাত হামাকে সমঝে দাও দিকি, মানুষ কি আসমানে জন্মায়, নাকি হাওয়া বাতাসে? তুমি কোথায় জন্মেছিলে গে? কোন আসমানে, কোন বাতাসে? হাটুর রাগ দেখে নির্মলা গালে হাত রেখে চোখ বড়ো করে অবাক আর অবাক। আসলে হাটুটা বড্ড রগচটা ছেলে। কম বয়সেই বুড়োর মতো হালচাল। ত্রিভঙ্গ হাড়-মোটা গড়ন। গাঁয়ের রসিক বউরা বলে—হাটুয়া! ভারি-ভুরির পুজো দে। তোকে কেউ বিয়েই করবেনা রে। তা করবেনা তো করবেনা। হাটু তখন কিন্তু বড়ো বড়ো দাঁত খুলে হাসে।

রবিবার, হাটবার, একই দিনে জন্ম, এইগুলো মিলিয়ে হাটুর সঙ্গে এতোয়রির গলায় গলায় ভাব। দুজনেই বেশ ভারিক্কি চালের যোয়ান। বয়সের হেরফেরে কিছু যায় আসে না। একদিন গাওয়াল সেরে ফেরার পথে হাটু হঠাৎ বলেছিল ভাই এতোয়ারি, বিয়ে যদি করি একঘরেই করব দুজনায়। এক বাড়ির দুইবোন। তা শুনে এতোয়ারীর গম্ভীর মুখে যা হাসি ফুটল, ভাবা যায় না। সোনাইতলার মাঠে ঢেলাই চণ্ডীর থান। সেখান দিয়ে আসতে-যেতে সবাইকে একটা করে ঢিল ছুঁড়তেই হয়—নয়তো পাতক লাগে। সেদিন দুই বন্ধু দু'খানা ঢিল ছোঁড়ার সময় মনে মনে কী প্রার্থনা করেছিল, পাথরে মাথা ঠুকে দিলেও বলবেনা কাকেও। তখন অবশ্যি বয়স ছিল আরও কম। এতোয়ারী তার বিয়ের পর হাটুকে বলেছিল—মা ঢেলাইচণ্ডী যদি কথা না শোনেন কারও কিছু করার নেই—এই হচ্ছে মুশকিল। হাটু বলেছিল—ছোড় দো। ছেড়ে দাও।

কলাবেড়িয়ার মাতব্বর মোড়লের মেয়ে মোটে একটাই। মা ঢেলাইচণ্ডী কী আর করবেন? এ দিকে নয়নসুখের ভাগ্নেটার মা নেই বাবা নেই- মাতব্বরের আরেক মেয়ে থাকলেও সে কেনেকেনার টাকা কোথায় পাবে? বেচারা নয়নসুখের নিজের ছেলেটার বিয়ে হবে কি না তার ঠিক নেই তো ভাগ্নে! বাপরে বাপ! মাতব্বরের যা টাকার খাঁকতি। ফুলকলিয়াকে কিনতে এতোয়ারির মা'বা সরস্বতীর সর্বস্ব ঘুচে গেছে। তিন বিঘে ক্ষেতের এক বিঘে বিক্রি, এক বিঘে বন্ধক গেছে মহাজনের ঘরে। মহাজন আবার যে সে নয়, রাধারঘাটের ছোটে লালাজী। ফি বছর শহরের সদরঘাটটা ডেকে নেন তিনি। লোকে বলে ঘাটোয়ারিবাবু—কেউ বলে ঘাটবাবু। এলাকায় সুদে টাকাও খাটান। কলাবেড়িয়া-নিষাদবাগ-জীবন্তী থেকে মহুলা অব্দি তাঁর সুদের মধ্যে কারবার ছড়ানো। ইতিমধ্যে গঙ্গার দু'ধারে কত ক্ষেতির মালিক হয়ে বসেছেন, লেখাজোকা নেই। হতভাগা হাটুর নিজের দু'এক টুকরো ক্ষেতি থাকলে তো ছোটে লালজীর কিরপা পাবে!

অতএব বিয়ের নামে আপাতত হাত ধুয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী হাটুর? কিন্তু মুখে অন্য বুলি—আরে দূর দূর! ঔরত মানেই হরেক ঝামেলা। এই তো এতোয়ারি কলাবেড়িয়ার মোড়লবাড়ির মেয়ে ঘরে এনেছে—সুখটা কী পাচ্ছে সমঝে দাও হামাকে! দেমাগ খারাপ করতে হচ্ছে সারাক্ষণ। এতোয়ারির মা কী ছিল, কী হয়েছে দেখে এসো। দিনরাত বকবক ঝকঝক খই ফুটছে মুখের। উঠোনে চিল শকুন উড়ছে। গিদেরে পা মাটিতে পড়েনা কলাবেড়িয়ার মেয়েটার। মরদ, না বলদ এতোয়ারিটা?

এতোয়ারির সামনেও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথাগুলো বলছে হাটুয়া। শুনে এতোয়ারি একটা বড়োরকমের নিশ্বাস ছেড়েছে। ঠিকই বলছে হাটুয়া। কী দরকার ছিল অমন রাক্ষুসে জেদের? মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আসলে। জীবন্তীর বেণুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। পণটন নগদ চায়নি। তবে গয়না-পত্তর দিতে হবে। মহুলার স্যাঁকরাকে বায়না দেওয়াও হয়েছিল। বিয়ের দুদিন আগে বেণুর মেয়েটা ইটভাটার এক কর্মচারী শচীবাবুর সঙ্গে রাতারাতি ভেগে গেল। সখ করে বেণু গাই-গরু পুষত আর যুবতী মেয়েকে পাঠাত দুধ নিয়ে শচীবাবুর ডেরায়। গাঁয়ের বাইরে ইটভাটা। বাঁশবন চারদিকে। ওপাশে পাকা সড়ক। ভাটার একপাশে বাঁশতলায় ইটবাবুদের দরমার ঘর। শচীবাবু বামুনের ছেলে। তার মাথা খারাপ। তবে রূপসী বলতে হবে বেণুর মেয়েকে। গরীবের ঘরেও তো চাঁদের আলো এসে হেসে যায়—এই হচ্ছে ঠাকুরবাবার মহিমা।

এতোয়ারি কতদিন জীবন্তী গাঁয়ের পথে বেণুর বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে। মুখ তুলে দেখতে ভারি লজ্জা করেছে তার। আড়চোখে দেখেছে বেণুর মেয়ে গাইগরুটার দড়ি ধরে দৌড়াচ্ছে মুখে একশো গালমন্দ। গাইগরুটাই লেজ তুলে দৌড়চ্ছে। আসলে মেয়েটা ভাল নয়। বুঝতে দেরী হয়েছে এতোয়ারির। এই! এই লোকটা ধরো!—ধরো! এতোয়ারি হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। পাশ দিয়ে গরুটা দৌড়ে গেল। দড়ির ধাক্কায় ওর কাঁধের ভার টালমাটাল হল। তখন তার কাছে এসে বেণুর মেয়ে বলেছিল—ভারি হাঁ'করা লোক রে বাবা! বাড়ি কোথায়? এতোয়ারি ওর দিকে তাকাতেই পারেনি। আর মেয়েটার মুখে পরিষ্কার বাংলা বুলি। স্বজাতির মেয়ে, তা বোঝে সাধ্যি কার? যেন বাঙালী বাবুবাড়ির মেয়ে।

আরও কতবার দেখেছে মাথায় গোল করে গামছার বিড়ে বসিয়ে তাতে দুধের ঘটি রেখে দিব্যি নাচুনীর মতো হাঁটছে। সঙ্গী হাটুয়া চাপা গলায় বলেছে—তেরা বহু লাগে রে এতোয়ারী! দেখ দেখ! এতোয়ারী লজ্জায় লাল হয়ে বলেছে—ছোড় দে রে!

কিন্তু ছেড়ে দেওয়া সহজ ছিল না। মনে মনে ঘর বেঁধে ঘরকন্না করে এতোয়ারির মতো চাপা যুবকের দিনকাল খুব ভাল কেটেছিল। তো পরে বিনিপণে বিয়ে দেবার রহস্য ফাঁস হয়ে গেল বলা যায়। বেণু যেভাবে হোক, যত শিগগির হোক, মেয়েকে পর-হাতি করতে চেয়েছিল। অমন বোলচালওয়ালী নির্লাজ মেয়ে, অমন জাতনাশা মেয়েকে স্বজাতির কারও ঘাড়ে চাপাতে পারলে খুব বেচে যেতে বেণু। জেনেশুনে গাঁয়ের বা পাশের কোন ছেলে ওকে নিতে চাইবে? অতএব তিনক্রোশ দূরে গঙ্গা পেরিয়ে নিষাদবাগে সম্বন্ধ হচ্ছিল।

এতোয়ারির মায়ের কাণ্ডটা দেখ। সে তো গাঁওয়াল-ফেরা পুরুষ-চরানী মেয়ে। কত তার জানাশোনা খোঁজ-খবর। বেণুর মেয়েটা যে খারাপ তাও কি জানতনা? হাটুয়া বলেছে—আলবাৎ জানত মাসি। জেনেও তোর গলায় ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল। আসলে কী জানিস ভাই এতোয়ারি? ঔরতলোক শ্রিফ নাদান—বোকা! বোকার হদ্দ।

ওদিকে রেগে-মেগে সরস্বতী বলেছে—শাসের পাল্লায় পড়লে সব মেয়ে ঠিক হয়ে যায়। সে মওকা যে মিলল না। নয়তো গাঁওয়ালারা দেখত, কী হত। এত যে ঝাঁকে ঝাঁকে বহু-বহুড়ী এসেছে নিষাদবাগে। কার বুকে এত হিম্মত বলুক তো ঠাকুরবাবার থানে হাত রেখে—হামি বিলকুল সাচ্চা মোতি! সব দেখতে দেখতে হামার চুলপাক গেইলা গে! হামি শ্মশানবাগে পাঁও বাঢ়াইলা গে!

সরস্বতী তার জীবনে দেখেছে, শাসনই হল বউগুলোর মোক্ষম দাওয়াই। যত বেচালের মেয়ে হোক, শ্বশুড়ী চোখে চোখে রাখবে আর উঠতে বসতে শাসন করবে—ব্যস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনো-কোনো মেয়ে ঘরে অনেককাল আইবুড়ি থাকলে একটু আধটু বেচালে হাঁটে। ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সংসারে তোমার একজন বহু দরকার, এই হল আসল কথা। বেণুর মেয়েকেও বারকতক চুলের ঝুঁটি ধরে দুচারটে চড় থাপ্পড় দিলে সব বদখুন নিকলে যেত দেখ্‌ত। তারপর গঙ্গামাঈজীর বুকে আচ্ছাসে চুবিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরবাবার থানে মাথাটা ঘষে দিতে। তখন বিলকুল নদী কা পানি নদীমে বহে যেত।

তবে ফুলকলিয়ার তেমন কোন বেচাল নেই। তাই অতটা বাড়াবাড়ি সরস্বতী বুড়ি করেনি এতোদিন। সরস্বতী যেন তাকে পেটের বেটির মতো ভেবেছে। খাওয়ার সময় যত্নআত্যি করেছে। প্রথম-প্রথম এতোয়ারি ভেবেছিল, বড়ঘরের মেয়ে বলে এত খাতির। পরে বকুনি, গালমন্দ এবং শাসনতর্জন দেখে সে আশ্বস্ত হয়েছিল। শাস বউকে সবসময় খাতির করে চলছে দেখলে গা ছমছম করে। বউয়ের পাশে শুয়ে মরদটাও ভাবে, খুব ইজ্জতওয়ালী মেয়ে—না জানি কিসে খুঁত ধরে বসবে।

এতোয়ারি সেই সম্ভ্রম দেখিয়েছে গোড়ায়। আজকাল আর এতটা করে না। কিন্তু টের পায়, মাস্তবরের মেয়ে যেন তাকে মরদ বলে গ্রাহ্যই করে না। শুতে না শুতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। গায়ে হাত রাখলে বা কাছে টানলে কোন সাড়াই নেই। অগত্যা অভিমানে সরে আসে এতোয়ারি। চিত হয়ে শুয়ে থাকে। পায়ের ওপর পা, বুকে দুইহাতের আঙুলে আঙুল। চাপে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়।…

কিন্তু আজ এতোয়ারির ভাল ঘুম হয়নি। চোখ দুটোর জ্বালা বেলা বাড়তে-বাড়তে খর হয়ে উঠেছে। কাঁধের ভার ওজনদার ঠেকছে। হেই হাটুয়া! জেরাসে থাম রে! বুনো ঘোড়ার মতো দৌড়সনে। তুই দৌড়লেই বা কী, না দৌড়লেই বা কী—গাঁগে রাম যেখানকার সেখানেই থাকবে।

হাটুয়া বরাবর আগেই হাঁটে। খালি-খালি হাঁটতে দাও ওকে। মনে হবে একটা কচ্ছপ। দিনভোর হেঁটেও কুল পাবেনা। কিন্তু কাঁধে ওজনদার ভার পড়লে সে গুলবাঘার মতো দৌড়বাজ। আর সে কী ছন্দতাল! ত্রিভঙ্গ মোটা হাড়ের গতর তার মটমট করে আওয়াজ দিচ্ছে। মাঠের ধারে বিশাল গাছটার ঘন ছায়া দেখিয়ে সে আঙুল তোলে- হুঁয়া যাকে বিড়ি খাব।

—বাত হায় রে। কথা আছে এতোয়ারির। তার তামাটে মুখে রোদ ধোঁয়াচ্ছে। গলায় নুনের সাদা কণা জমেছে। বাঁ হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে শূন্যে কিছু আঁকড়াতে চাইছে যেন। ডানহাতে নাকের ডগা অনেক কষ্টে মুছে ফের বলে—বাত আছে। শুন রে!

হাটুয়া দাঁড়ায় অগত্যা। দাঁড়ালে কষ্ট। হাঁসফাস করে বুক। ভারবাহী মানুষের এই এক মজা। তালে তালে চললে আরাম। থামলে কষ্ট। ক্যা বাত রে ভাতিজাকা বেটা? সে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। রাতমে বহু তোর গলা ধরে শোয়নি তো কী হয়েছে? আজ শোবে। পঞ্চয়েতজীর মেয়ের 'বিভা' বলে কথা।

এই গরমে মাঠের মধ্যিখানে তামাশা ভাল লাগে না এতোয়ারির। সে হাটুয়ার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে—হরবখত তামাসা রে! তোর বয়স যত বাড়ছে, ত বাচ্চা হয়ে যাচ্ছিস।

হাটুয়া তবু দাঁড়িয়েই থাকে। চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলে—বাঃ বাহা রে বাঃ! ইঞ্জিনকা মাফিক চলে যাচ্ছিস যে? হামাকে দাঁড়াতে বলে নিজে টাট্টু বনে যাচ্ছিস! বাহা রে!

তবু এতোয়ারি দুলতে দুলতে সামনে পা ফেলছে দেখে অগত্যা সে দৌড় শুরু

করে। হাটুয়াকে পেছনে ফেলে যাবে, এতোয়ারির অত তাকদ নেই। নিষাদবাগের সবাই জানে, হাটুয়া কাঁধে কতটা ওজন নিয়ে কতটা পথ দৌড়ুতে পারে। তার দুই কাঁধের দগদগে কালো ছোপ দেখলে মনে হবে মোষের কাঁধ। একদমেই এতোয়ারির পাশ কাটিয়ে কচি পাটের ক্ষেত ভেঙে হাটুয়া চেঁচায়—আয় রে দেখি!

এতোয়ারি গুম। আপন বেগে হাঁটে। একটা কথা বলবে ভেবেছিল, হাটুয়া অমন বাজে তামাসা করল—এতে তার দুখ বেজেছে মনে। আসলে এতোয়ারির এই হচ্ছে স্বভাব। মুখ খোলে কম—নেহাৎ মনে কিছু ভেসে না এলে এমন গলায় বলে ওঠেনা—একঠো বাত আছে! তখন যদি বলা না হল তো তার গুরুত্ব ফুরিয়ে গেল এতোয়ারির কাছে। একটু পরে যখন হাটুয়া তিলের ক্ষেত পেরিয়ে সেই বড় গাবতলায় ঢুকেছে, তখন এতোয়ারির মনে কথাটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে। বলেই বা কী ফল হত: হাটুয়াটা যা গল্পবাজ আর যা বকবক করা স্বভাব, মুখ ফসকে বলে দিত লোকজনের সামনে। অতএব থাক, ঠাকুরবাবা যা করেন, ভাল সমঝেই করেন।

গাঁওয়াল-করা মানুষদের কাছে নিজের গাঁ-গেরাম বাদেও কত জায়গা, কত রাস্তাঘাট, আঁকাবাঁকা আলপথ, দু'ধারে রাঙচিতার বেড়া, কত মাঠ, নিঃঝুম বনজঙ্গল যে আপন হয়ে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। দূর থেকেই এই গাব গাছের মাথা চোখে পড়লেই মনে হয় আপনজন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখানে-ওখানে এমন কত জায়গায় সকাল-দুপুর বিকেল সন্ধ্যায় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ছায়ায় ঢুকতেই মনে হয়, এও এক ঘর। একবুক আরাম নিয়ে ক্লান্ত লোকটার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—বোল রে এতোয়ারি, ক্যা তেরা বাত?

হাটুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এতোয়ারি একটু হাসে। বলার মতো কিছু না রে ভাই। মেচবাত্তিঠো দে। বিলকুল ভুলে গেছি কৌটোটা আনতে। এক বাণ্ডিল বিড়ি ছিল, একঠো মেচবাত্তি ছিল। কাল বিকেলে জীবন্তীর বাজারে কিনেছিলাম। তো এই বিড়িটা কানে গোঁজা ছিল। টানতে টানতে বুতে গেল, তাই।

এমন ভুল বেশ গুরুতর। এতোয়ারির ভুলো মন নিয়ে অনেক গল্প আছে। কিন্তু বিড়ির বেলা তা খাটে না। বিড়ি না খেলে তার মনে হয় জীবনটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চুপ করে বসে আকাশ দেখতে দেখতে বিড়ি টানা তার অভ্যেস। হুঁ, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তার মনে কী যে তোলপাড় চলছে, বলেই বা কী হবে? তারপর রাতের বেলা সেই ভয়ঙ্কর শুয়োরের স্বপ্ন। জঙ্গলার তলা থেকে গাঁক গাঁক করে তেড়ে আসছে মোষের মতো প্রকাণ্ড শুয়োর—এতোয়ারির দিকেই তার লক্ষ্য। মা ভোরবেলা চুলোয় বাসিচুলোর ছাই নিয়ে দোরগোড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে—যে ভঙ্গীতে চৈতালী

ফসল ঝাড়া হয়। ওই ছাই কুস্বপ্নের কু-টুকু নষ্ট করে দেবে। কিন্তু এতোয়ারির মনে গণ্ডগোল বাড়ছে আর বাড়ছে—যত বেলা বাড়ছে। কাল সন্ধ্যেবেলা গাঁওয়াল থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে গঙ্গার ধারে মাঠ সারতে বেরিয়েছিল সে। ঝোপের আড়ালে বসে কথাটা শুনেছিল। শরৎদার বহু নির্মলা চাপা গলায় অঞ্চলার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ কানে এল নির্মলা অঞ্চলাকে বলছে—তিশঠো টাকা, সাতভরি চাঁদি। বোল রী বোল্। এত্তা কৌন দেগা, শোচকে বোল্।

এর মানে কী? কিসের টাকা-চাঁদি, কে কাকে দেবে? এতোয়ারি ভেবে কূল পাচ্ছে না সেই থেকে। অঞ্চলা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি আছে। স্যাঙার কথা তুললে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। নির্মলা কি তার বিয়ে লাগাচ্ছে আবার, তাই লোভ দেখাছে মেয়েটাকে? অঞ্চলা ইদানীং এতোয়ারিকে দেখলে কেমন চোখে তাকায়, কেমন বাঁকা হাসে। এতোয়ারি সাদাসিদে মানুষ। মেয়েদের দিকে পুরো চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। তবে কি না ওই বাঁকা হাসি ছুরির ধারে মনের কোনখানটা কেটে যেন ঘা করে দিয়েছে। কেন এমন হাসে তাকে দেখে? এক ছেলের মা অঞ্চলা। ইচ্ছে না করলেও তার বড়বড় স্তনদুটো দেখা হয়ে যাবেই—এমন বেইজ্জতে মেয়ে। সবার সুমুখে ছেলেকে মাই দেবে আর ছেলেটা হাত বাড়িয়ে অন্য স্তনটা একেবারে উদোম করে ফেলবে—এ ভাবেই কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে। সেদিন অঞ্চলা এতোয়ারিদের বাড়ি এল ঘুঁটের আগুন নিতে। এসে চুলোর পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসল তো যাবার নাম নেই। এতোয়ারির সেদিন ক্ষেতির কাজ ছিল বলে গাঁওয়ালে বেরোয়নি। অঞ্চলা ফুলকলিয়াকে কী তামাসা না করল! ফুলকলিয়া রেগে কলসী নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে বেরোল। একটু পরে সরস্বতী বুড়িও ছোটীকে ফুটন্ত ভাত দেখতে বলে ছাগল বাঁধতে বেরোল। আর ছোটীর সামনেই অঞ্চলা এতোয়ারিকে বলে বসল কি না—অ্যাই এতোয়ারিদা! হামি তোমার বিয়েতে কেত্তা নাচ নেচেছিল, তো সুন্দরী বহু পেয়ে হামাকে ভুলেই গেলে! আরে বাবা! হামি না হয় তোমার বহুর মতো সুন্দরী নই, তাবলে মেয়ে তো বটি।

এতোয়ারি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেছিল—তো?

—তো? অঞ্চলা সেই বাঁকা হাসি ছুঁড়ে বলেছিল—হুঁ, কুছ নেহি। আপনে সমঝো।

ঘুঁটের ধোঁয়ানো আগুন নিয়ে যেভাবে সে বেরিয়ে গিয়েছিল, এতোয়ারি ভয়ে দারা—যেন নিষাদবাগে আগুন লেগে তার জন্মের বছরটার মতো সব ছাই হয়ে যাবে। সময়টা শুখার। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। চারপাশে পাটকাঠি বিচালি খড় আর কাঠের গাদা। এক পলকে সব জ্বলে যাবে।…

অঞ্জলার খারাপ মেয়ে বলে গাঁয়ে বদনাম অবিশ্যি নেই। বিয়ে হয়েছিল রেল লাইনের ধারে একটা গাঁয়ে। তার স্বামী রেল লাইনের মাঝবরাবর কাঠে পা ফেলে কাঁধে ভার নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছিল। এমন সময় পিছন থেকে রেলগাড়ি এসে পড়ে। নিজের গানের আওয়াজে রেলের বাঁশি শুনতে পায়নি। বিধবা হয়ে দিনকতক ছিল ওখানে অঞ্জলা। তারপর আর পোষালনা। সেই শাস-বহুড়ির চিরকেলে কোঁদল! ছেলে কেড়ে নিত- না নেয়ার কারণ মাই টানবার বয়স যায়নি ছেলেটার।

কিন্তু ওইসব কথা, অমন কথার ভঙ্গী, চোখঠার বাঁকা হাসি দেখেশুনে নতুন বহুটার মনে কী ধারণা হবে মরদ সম্পর্কে, অঞ্জলার বোঝা উচিত। ভাগ্যিস শেষ বোলচালটা ফুলকলিয়া শোনে নি! শুনলে ভাবত, বিয়ের আগে থেকে দুজনের মধ্যে একটা 'নটো-ঘটো' ছিল।···

—আরে এতোয়া'রি! বাতঠো বলবি, না বসে বসে বিড়ি ফুঁকবি?

অপ্রস্তুত হাসে এতোয়ারি। না ভাই, ওঠ। খুব আরাম করা গেল। সামনে শঙ্খদহ। বাবুভদ্রলোক আছেন কয়েক ঘর। সব মাল ওখানেই খতম হয়ে যাবে। কী বলিস?

হাটুয়া বড়ো-বড়ো দুটো কুমড়ো এনেছে। পেঁপে এনেছে অনেকগুলো। পাকা কলা এনেছে খড়ি পাঁচেক। বাকিটা মুসুর। মুসুরগুলো অন্নদির। মধুকাকার মা অন্নবুড়ি হাটুয়াকে বড্ড স্নেহ করে। হয়তো এ্যা'দ্দিন মামার গালমন্দ আর মামাতো ভাইবোনদের চিমটি কাটার জ্বালা থেকে হাটুয়া বাঁচার রাস্তা হাতড়াতো। অন্নদি ইদানীং বলে—হাটুয়ারে! শোচ মাৎ করিস ভাই! তোর বিভা হামি লাগাবই লাগাব। আ ছি ছি! জিভ কেটে হাটুয়া বলেছে—ও কী বাত অন্নদি! হাম বিভা মাৎ কিবে।

আঁকাবাঁকা আলপথ ঘুরে-ঘুরে চলেছে শঙ্খদহের দিকে। মাঠ ক্রমশঃ উঁচু হচ্ছে। হাঁফ ধরে যায়। ফুসফুসে চাপ লাগে। মুখ হাঁ হয়ে দম ফেলতে হয়। এইসব সময় মনে হয়, জীবনটা মোটেই সুখের নয়। এতোয়ারি ভাবে সে যদি ধনপতির ঘরে জন্ম নিত, তো সাইকেল চেপে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে শহরে যেত। বাবু-মহাজনদের গদীতে গিয়ে বসে-বসে সিগ্রেট ফুঁকত. চা খেত। হাটুয়া ভাবে, সে যদি শরতের বাবা মাধবের বেটা হত, ছোটেলালজীর সঙ্গে পাটের দাদন দিতে যেত এখানে ওখানে। ছোটেলালজী কথায়-কথায় পকেট থেকে খৈনীর কৌটো বের করে বলতেন—লে বে শরৎলাল, পাকড়া। শরৎ লাল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছোটেলাল আর শরৎলাল। লোকের কর্জ দরকার হলে শরতের কাছেই আরজিটা প্রথম পেশ

করতে হয়। আরে, ধনপতির মতো মানুষও বেটির বিয়ে দিতে নাকি। শরৎকে ধরাধরি করেছে। তো বোঝ ব্যাপার। ঘাটের গদীতে গিয়ে টাকার কথা তুললেই ছোটেলালজীর ওই এক বাত—শরৎকো বোলো।

আজ আকাশের দশা দেখে বুকে তরাস লাগে। মুখ তোলা কঠিন, তবু মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে। মানুষের আকাশ দেখাটা একটা স্বভাব। বাজপড়া শিমুলের ডাগে দাঁড়কাকটা যা আওয়াজ দিচ্ছে, বোঝা যায় বছরটার গতিক ভালো না।

—এতোয়ারি!

—হুঁ।

—ভার খালি হলে এবাগে আর আসবনা ভাই।

—হুঁ।

—আবে, খালি হুঁ হুঁ কারতা! শোন, বাসে চাপব। চেপে রাধারঘাট হয়ে শহরে যাব।

এতোয়ারি ভারটা কাঁধ বদলে বলে—তো?

হাটুয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আবে শালা ভাতিজাকা বেটা! ছেনিমা দেখব—ছেনিমা!

এতোয়ারি খুকখুক করে হেসে ওঠে। কষ্টের মধ্যে হাসি। বিয়ের পর তিন রাতের রাতে মাস্তবের মেয়ে বলেছিল—তুমি ছেনিমা দেখেছ কখনও? নাঃ, দেখা হয়নি এতোয়ারির। ছেনিমা কেমন, তার ধারণাও নেই। শুনেছে, পটের ছবি। মানুষের মতো চলে—বলে, নাচে-গায়। কিন্তু তা দেখলেই নাকি মাথা বিগড়ে যায়। সে অস্বস্তি নিয়ে বলেছিল—তুমি দেখেছ নাকি? কব গে? কাঁহা? কবে কোথায় দেখেছ? স্বস্তির কথা ফুলকলিয়া দেখেনি দেখতে ইচ্ছে করে বুঝি? ফুলকলিয়া তখন অন্য কথায় চলে গেছে। এতোয়ারি বলেছে—ক্যা ফায়দা? এতকাল ধরে নিষাদবাগের বহুড়ীরা ছেনিমা দেখেনি বলে কী ক্ষতি হয়েছে?

—কী রে? যাবি না? দেখবি না?

এতোয়ারি এবার অবাক হয়ে বলে—তুই দেখেছিস্? নাচ?

—হাঁঃ!

—ঝুট।

—কাহে?

—দেখলে আমাকে না বলে পারতিস না।

হাটুয়া দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ।—বলিনি কেন জানিস ভাই এতোয়ারি? তুই যেমন

বহু-লাগড়া. কখন মুখ ফসকে বহুর কানে তুলে দিবি। আর বহু নাহানের ঘাটে গিয়ে বলবে। মামী শুনবে। মামা শুনবে। বলবে—তব তো হাটুয়া আনাজ বেচা পয়সা বেমালুম গাপ করে বরাবর। ভাই এতোয়ারি, আমি শালা চিনির বলদ, বুঝিস নে?

এতোয়ারি দেখতে পায়, হাটুয়ার নাকের ফুটো ফুলেছে। চোখে জল ঝিকমিক করছে।

এতোয়ারীর অবাক লাগে। তুনিয়ার অনেককিছু সে আদতে বোঝেনা। বুঝতে গিয়ে কুলকিনারা পায় না বলেই হাল ছেড়ে দেয়। নয়নসুখের ভাগ্নে এমন মদ্দযোয়ান ছেলেটার চোখে জল দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে, মামা-মামীর সঙ্গে তলায়-তলায় ভাগ্নের বনিবনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হের-ফের আছে। তাহলে তো অঞ্চলার ব্যাপারটা বলতে গিয়ে চেপে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। হাটুয়া নিজের মামাতো বোনের কোন অজানা চক্রান্ত নিয়ে হইচই পাকাবে বলে মনে হয় না। যাদের সঙ্গে মনের টান নেই, তারা গোল্লায় গেলে ওর কী?

তাই বলে এতোয়ারি ওকে কিছুতেই বলতে পারবেনা যে অঞ্চলার দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে। হাটুয়া কী ভাববে? হাজার হলেও মামাতো বোন। এতোয়ারি বলে— ছেনিমায় কেত্তা পয়সা লাগে রে?

হাটুয়ার ভিজে চোখ দেখতে-দেখতে শুকনো হয়েছে। পুরু ঠোঁট তুটোয় হাসির ভাঁজ ফুটেছে তক্ষুণি।—দশ-দশ আনা। তোর দশ, হামারভি দশ।

—দশ? এতোয়ারির চোখ তুটো ঠেলে বেরিয়ে গেছে শুনে। দ-ও-শ?

—হাঁ, এত্তা।

—তব্ আজ না। আজ ছোড় দে। এতোয়ারির মন খারাপ হয়ে গেছে ছেনিমার দরদাম শুনে, সেটা ওর গলার স্বরে বোঝাই যায়। ফের বলে—আজ ধনপতিয়াকা বেটির বিভা। বিকাল-বিকাল পঁহছতে হবে। না থাকলে মাথা গুনে জানতে পারবে শালা বুঢ়া। বুঝলি তো?

হাটুয়া গোঁ ধরে বলে—হামি আজ ছেনিমা দেখবই দেখব। ঠাকুরকা কিরিয়া। বাসভাড়া লাগবে পাঁচ আনা। ছেনিমা দশআনা। ব্যস, একঠো টাকার খেল! বলেই সে বড়ো-বড়ো দাঁত খুলে হেসে পথের মধ্যেই কোঁচড় থেকে একটা গেঁজে টেনে ধরে। এতোয়ারি দেখে বলে—বহৎ পয়সা রে! কাঁহা পাইস?

—হামি চুরি না কিসে। হাটুয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলে। একঠো-দোঠো কারকে রাখিসে। তুই যদি উধার লিস তো তাও দেবে। লিবি?

এতোয়ারি ভাবতে ভাবতে হাঁটে। পঞ্চায়েতের মেয়ের বিয়ের সময় আসরে থাক বা না থাক, কিছু যায়-আসে না। তার মতো মোয়ানের কথায় দাম কে দেবে যে মজলিসে কথা বলবে? কিন্তু খাবার সময় ঠিক চোখে পড়ে যাবে। সরস্বতী সকালে ঝগড়া-ঝাঁটি করে বহুকে ঘুম থেকে তুলে এনেছে। কাজেই বুড়ি যাবে না। কিন্তু ছোটী আর বহুকে তো যেতেই হবে। দশের ভোজকাজে একটু খাটাখাটুনিও করতে হবে বইকি। ওদের যদি জিগ্যেস করে, বলবে এতোয়ারি গাঁওয়ালে গেছে। এমন দিনে এতোয়ারি গাঁওয়ালে চলে গেল? গাঁয়ের কেউ যায়নি, মোড়লের বাড়ির ধুম বলে কথা। ও গেল? কথা একটা উঠবেই। তবে ফিরে গিয়ে ভোজে বসলে সব মাফ। হাটুয়ার কথাও উঠতে পারে। কিন্তু হাটুয়া তো বাড়ির মাথা নয়—মাথা তার মামা। কিন্তু এতোয়ারি যে নিজেই মাথা। তাকে তো দশের কাজে একবার যেতেই হবে। এতোয়ারি শঙ্খদহ ঢোকার মুখে বলে—ছেনিমা দেখে গাঁয়ে ফিরতে রাত লেগে যাবে নাকি রে?

হাটুয়া ঝটপট জবাব দেয়—মুখ আঁধারি হবে।

তার মানে সন্ধ আঁধার নেমেছে তখন, মুখ চেনা যাচ্ছে না এমন সময়। সবে তারাগুলো ফুটে উঠেছে। হাওয়া ঘুরেছে এবং গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা সেই হাওয়া ঠাণ্ডা দিচ্ছে। নিষাদবাগে দিনমান ভোগান্তির পর সেই একটা সুসময়। গাছ-গাছালির পাতা দুলে-দুলে ঘুমপাড়ানি গান জুড়েছে। তখনই কারও শুয়ে পড়ার সময় এবং খোলা উঠোনে তালাই পেতে আকাশের তারা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেল। সন্ধ্যা হতে না হতেই অনেক ঘরে লম্ফ নিবল। দু একটা চাপা কথা ফুটল কোথাও। গাব-গাছে প্যাঁচা ডাকল ক্রাও ক্রাঁও ক্র্যাঁও! দলছুট বগা-বগী গঙ্গার আকাশ পেরিয়ে যেতে-যেতে হেঁকে গেল—আঁক্ আঁক! বুড়ো-বুড়িরা কান পেতে আছে খানাখন্দে ব্যাঙের ডাক শুনতে পায় যদি! শুখায় দিনকালে এখন বৃষ্টির শুধু আশা।···

এতোয়ারি হিসেব করে। বিয়ের কাজ চুকতে সেই মুখ আঁধারি বেলা, তারপর বরযাত্রীরা পেটের বস্তা খুলে পাতে বসবে। খুব হইচই করবে। সুর্য শহরের কোন বাবুর গদী থেকে হ্যাসাগবাত্তি এনেছে নাকি। গতরাতে জ্বালেনি। নাকি কলকব্জা বিগড়ে ছিল। ছোটীর কাছে শোনা কথা। সেটা আজ জ্বলবে। ঢুলিরা ঢ্যাম কুড়াকুড় বাজনা বাজাবে। সানাই পোঁ পোঁ করে প্রচণ্ড চেঁচাবে। নিষাদবাগে আজ আর কেউ সাত সন্ধ্যায় ঢুলুনি নিয়ে তালাই খুঁজবেনা। বরযাত্রীদের হয়ে গেলে গাঁওয়ালাদের পাতে বসার পালা। আগে মরদরা, পরে ঔরত। ফুলকলিয়া আর ছোটী খেতে বসবে। হ্যাসাগবাত্তির উজ্জল আলোয় ননদ-ভাজের খাওয়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এতোয়ারি।

—যাব ভাই হাটুয়া। এতোয়ারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছেনিমাটা দেখব—তুই বলছিস যখন, আর কথা কিসের?…

জীবনে মাঝে মাঝে দু একটা দিন আসে, যখন এতোয়ারী ভুলেই যায় যে তার দুকাঁধে ভারবাহী জানোয়ারের মতো কালো দাগ আছে। রোদজ্বলা মাঠঘাট, কাঁধের ওজন, ক্ষেতের খাটুনি, বৃষ্টির হাপিত্যেশ—এইসব কষ্টের বোধগুলো একেবারে মুছে যায় মন থেকে। এরকম হয়েছিল সেই বেণুর মেয়ে মালতীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে মা যখন ফিরল, তখন। আর হয়েছিল বিয়ের রাতে ফুলকলিয়ার সঙ্গে 'মুখ-দেখানি'র সময়। এখন মাথার ওপর থেকে সূর্য একটুখানি ঢলেছে। তারপর দুটিতে ভারমুক্ত টাট্টুর মতো। বাস-রাস্তার ধারে ময়রাদার দোকানে বসে ছাতু খাচ্ছে। বাসে চেপে ছেনিমা দেখার খুশিতে দুটো মুখ ঝকমক করছে। কোথাও বুঝি চিরকালীন উৎসব আছে। এসব 'নাদান' মানুষের মুখে কদাচিৎ তার আলোর ছটা এসে লাগে। এতোয়ারির এই ধারণা।

টিউবেলের জলে পেতলের সরা আর হাতমুখ ধুয়ে-পাখলে এতোয়ারি বিড়ি কিনে আনে। হাটুয়া চোখ নাচিয়ে বলে—আবে বিড়ি খাচ্ছিস কেন? আয়, সিগ্রেট ফুঁকি!

এতোয়ারি দাঁড়িপাল্লার তলা থেকে গোটানো হাফশার্ট বের করে গায়ে দেয়। খুশিতে হাসে। হাঁ। পান ভি খাব। পরক্ষণে চাপাগলায় শুধোয়—হাঁরে হাটুয়া! ছেনিমাঘরে ভার লিয়ে ঢুকতে দেবে তো?

হাটুয়ার কাছে ঝামেলা বলতে কিছু নেই। দেখে লিস-কোথায় থুই। আরে ভাই, হাতের জোরে ভাত, মুখের জোরে কুটুম। তুই শুধু দেখে যা। চুপসে থাক।

চুপচাপ থেকেছে এতোয়ারি। দেখেছে বাসের কণ্ডাক্টার ছোকরাটার সঙ্গেও হাটুয়ার কত ভাব। ঘাটে গিয়ে নেমে ছোটেলালজীকে ভাল থাকার খবর পুছতে দেখে তাজ্জব হয়েছে। ছোটেলালজীর গদীতে ময়নাপাখি আছে। খাঁচার ধারে দাঁড়িয়ে হাটুয়া বলেছে—ক্যা রী? আচ্ছা তো? এতোয়ারি শুধু চুপচাপ হেসেছে। ছোটেলালজী বলেছেন—আজ তোরা গাঁও ছেড়েছিস যে? আজ ধনপতিয়ার বেটির বিয়ে না? তো হামিও যেত। যাচ্ছি না। কাম পড়েছে জবর। ধনপতি মুখিয়াকে বলিস, পরে গিয়ে বেটিজামাইকে দেখে আসব। বলিস রে হাটুয়া। ভুলিস না যেন।

হাটুয়া জোরে মাথা দোলায়। তারপর কাকে চেঁচিয়ে বলে—শম্ভুয়া! হেই শম্ভুয়া! আবে শুন শুন!

## । তিন ।

হাটুয়া অপ্রস্তুত। অন্ধকার ঘরে ছবির খেল দেখে এতোয়ারিটা গাধাকা মাফিক ডাক ছাড়ছে হিহিহি হাহা হা …ওর বিকট হাসি শুনে মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি মাঝে মাঝে জলের কলসী উবুড করে দিচ্ছে। আরে বুদ্ধু কাঁহেকা! ইয়ে তামাশা না ছে! হাটুয়া ওকে সামলাতে পারে না। চারপাশ থেকে বাবুরা চাপা গলায় শাসাচ্ছে তখন। খুব কাছেই কে বলে ওঠে—হাসতে হয়, বাইরে গিয়ে হাসুন না মশাই! এইতে হাটুয়া অস্বস্তিতে অস্থির। আলো জ্বললেই ধরা পড়ে যাবে চেয়ারের 'সিটে' কেমন জুটো বসে আছে। বলা যায় না, ঘাড ধরে বের করেও দিতে পারে। কেন পারে না? শেরের দলে কুত্তা ঘুষে বসে আছে! দশআনার টিকিট না পেয়ে চোদ্দআনা খরচ করে এই দুর্গতি। হাটুয়া আগে যদি জানত, গম্ভীর বিষণ্ণ শান্ত গাছকা মাফিক এই এতোয়ারি ছবির খেল দেখে এমন কাছাখোলা হয়ে পড়বে! হাটুয়া গুম হয়ে থাকে। এতোয়ারিকে ঠেসে ধরে। পাঁজরে খোঁচা দেয়। তবু সামলাতে পারে না। ছবির মানুষ যেই কথা বলে উঠে, অমনি এতোয়ারির কলসী উবুড় হয়ে যায়। হি হিহি হি হাহাহা হা। …

এ তামাশা না ছে—বহুৎ দুখোকা খেল ছে! হুঁশ কর ভাই এতোয়ারি। হাটুয়া কাকুতিমিনতি করে। কিরে দেয় কতরকম। আর এইসব ফিসফিস আওয়াজ অন্ধকারে শুনে আবার কেউ শাসায়। এতোয়ারি টের পেয়ে তাজ্জব বলে চুপ করে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আবার বিশাল হলঘর জুড়ে অন্ধকারে এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার মতো হি হি হি হি…হা হা হা হা এবং ছবির মেয়েটি বড হতে-হতে একেবারে তার গায়ের ওপর এসে পড়বে মনে হতেই এতোয়ারি চুপ করে যায়।

ওপরে মেয়েদের ঝাঁকে সামনে ঝুঁকে বসে ছিল ফুলকলিয়া। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার নরম মাখনের মতো শরীর। সে কিনা কলাবেড়িয়ার বড়ঘরের একহি বাত্তি। গতর খাটাতে হয়নি আর সব মেয়ের মতো, তাই এত নমনীয়তা, ফুলের কুঁড়ির মতো, শিমুল তুলাকা মাফিক। তরমুজের শাঁসের মতো কোমল আর লালচে আর রসাল তার মাংস। সেই ফুলকলিয়ার শরীর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠেছে। নির্মলার একটা হাত খামচে ধরে সে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে। আর হঠাৎ ওই হাসি, অন্ধকারে হি হি হি হি …হা হা হা হা…একেবারে দু'বার তিনবার, তারপর ফুলকলিয়া আঁতকে উঠেছে। হাসি বড় চেনা লাগে। ওই হাসির সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝাপটানিতে কী যেন গন্ধও অবিকল সে টের পায়।

অন্ধকারেই সে সোজা হয়ে বসে। কান খাড়া করে সতর্ক খরগোশের মতো সন্দেহে মাটির চাঙড় হয়ে অপেক্ষা করে।

তারপর তার মনে হয়, ভুল হতেও তো পারে। গোমড়ামুখো ছিসেবী কেজো চুপথাকা মানুষ কোন কারচুপিতে শহরের এই অন্ধকার হলঘরে থামোকা ঢুকে পড়বে? যদি বা ঢোকে, অমন হাসবে কেন? সত্যি বটে, সেদিন ঘরের চালে হনুমান দেখে সরস্বতীয়া যত হাত-পা ছুঁড়ছিল, তার বেটা তত হেসে উঠছিল। আর আরও একদিন বুধিয়ার মায়ের হাতের দড়ি ছিঁড়ে ধাড়ী ছাগলটা পালিয়ে গেল, বুধিয়ার মা যত বলে—এই বেটা এতোয়ারি, হামার বেটা, হামার জান, পাকাড় দে না—লোকটা কেন কে জানে হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল। তার মা তো বলেই—হামার বেটা পাথর না থে। আভি প'থর হয়ে গেল। কেন হবে না? বড়ঘরের বেটির দেমাগ দেখে পাথর না হয়ে উপায় আছে?

তো লোকটা হাসতে না জানে, এমন নয়। ফুলকলিয়ার মন ছবি থেকে সরতে সরতে নিষাদবাগে গিয়ে ঢোকে। শাস বুডি লম্ফ হাতে এতক্ষণ ঘর-বার করছে। ডাগদারের কাছে গেছে বহু—ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ওদিকে ধনপতিয়া মোড়লের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। উঠোনে কলের বাত্তি জলছে। কাল রাতে কেন কলের বাত্তিঠো জ্বালল না ওরা? কলাবেড়িয়ার মেয়ে কেমন নাচ জানে, আরও উজ্জ্বল হয়ে ঝলমলানি দিয়ে দেখিয়ে দিত। ঠিক ওই রকম নাচ। ছবির মেয়েটার মতো। ফুলকলিয়া আবার ফেরে নিষাদবাগ থেকে। ছবির দিকে তাকায়। আবার সেই হাসি শুনতে পায়। হি হি হি হি হা হা হা হা।...

সেই সময় হঠাৎ ছবি হারিয়ে যায়। হলঘরে আলো জ্বলে ওঠে। ফুলকলিয়া হাই তোলে। হাই তুলে নীচের দিকে তাকায়। তাকিয়েই আঁতকে ওঠে। ফিসফিস করে বলে—আরী! হাটুয়া!

নির্মলা ঘোরলাগা চোখে মুখ টিপে হাসে।—ভাগ রী! কাঁহা তেরা হাটুয়া?

ফুলকলিয়া উঠে দাঁড়ায়। নির্মলা তার হাত ধরে টানতে চেষ্টা করে। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুলকলিয়া পা বাড়ায়!

পাশের দরজার বাইরে নির্মলা তাকে ধরে ফেলে।—আ রী ফুলি! শুন্ শুন্। কী হয়েছে? কোথায় যাচ্ছিস এমন করে? হল কী তোর?

ফুলকলিয়া বড়-বড় চোখে তাকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে বলে—হাটুয়া ছে। উসকা সাথ ছোটীর দাদা।

—ভাগ্ ভাগ্!

—নেহী রী। বইঠে আছে। হাম দেখা। ...হাঁফাতে হাঁফাতে ফুলকলিয়া

বলে। তাকে ঝড়লাগা ঝোপঝাড়ের মতো আলুথালু দেখায়। কপালে, নাকের ডগায়, চিবুকে ঘামের ফোঁটা জমেছে। ভুতেপাওয়া মেয়ের মতো ফ্যাকফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে।

নির্মলা বুঝতে পারে না এত ভয় পাওয়ার কী আছে। এতোয়ারি যদি এসেই থাকে তো এসেছে। সে তো ভালই। নিজের মরদটাকে বশ মানিয়ে রাখতে পারবে না ফুলকালিয়ার মতো মেয়ে? সে তামাসা করে বলে—ঠিক আছে তবে। আমি গিয়ে তোর মরদকে ধরছি। দেখবি, উল্টে সে কেমন হকচকিয়ে যাবে। সরস্বতী বুড়িকে বলে দেব--এতোয়ারিদা ছেনিমা দেখতে এসেছে! ব্যাস! শুনে দেখবি মায়ের বেটা কেমন ঘাবড়ে যায়। রসগোল্লা খাইয়ে দেবে। আমার নাম নির্মলা!

ফুলকলিয়া এ কথাও শুনেও শোনে না। লম্বা বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকে। ওর পিছন-পিছন নির্মলা এগোয়। সিঁড়িতে গিয়ে গালমন্দ করে। আমারই ভুল হয়েছে তোকে আনা। তুই মুখেই শুধু বড় বড় কথা বলিস ফুলিয়া! তুই না কলাবেড়িয়ার বেটি! ছি ছি!

না, না। তোকে কিরে লাগে নির্মলাদি! আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে।···
···নীচের গলিতে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে ফুলকলিয়া। তার চোখে জলের ছোপ।··· নির্মলাদি, হামি আভি ঘর যাবে! তুমিও সাথ-সাথ চলো। হামি একা বহু-বহুড়ী মানুষ। রাস্তাঘাট চিনিনা। দোহাই বহিন! তোমার বেটার কিরিয়া লাগে—ঠাকুরবাবার কিরিয়া লাগে বহিন!

নির্মলা রেগে গিয়েছে। ভুরু কুঁচকে বলে—যাবার ইচ্ছে হলে তুমি চলে যাও বহিন। হামার এত্তা পয়সা নেই যে আধা দেখেই চলে যাব। পয়সা তো এমনি আসে না! তুমি বড়ঘরের বেটি, তোমার আসতে পারে।

পয়সার খোঁটা দিচ্ছে ফুলকলিয়াকে? সে তখুনি আঁচলের গিট খুলতে থাকে। অভিমানে তার বুক ফুলে ওঠে। এ যদি না মানুষজনের জায়গা হত, যদি না হত টাউন-শহর, এ যদি হত নিষাদবাগের গঙ্গার পাড়, শ্মশান, শিমুলতলার নিরিবিলি 'মাঠ সারার' জায়গা, এখন ফুলকলিয়া এক নদীর জল চোখ থেকে ঝরিয়ে তার মরা মায়ের নামে কাঁদত। হুঁ, পয়সার খোঁটার মতো দুখ থাকতে নেই সংসারে। আ রী নির্মলা, আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস! মনে মনে কেঁদে কেটে আবেগময়ী মেয়েটি নিঃশব্দে, শুধু চাহনিতে প্রকাশ করে: ও গে দালালের বউ! ঘোড়লের চিঠি বাবু লোকের পেছন-পেছন ঘোরে না কুত্তাকা মাফিক! এই লে তোর পয়সা।

বুদ্ধি করে একটা চাঁদির টাকা ভাগ্যিস এনেছিল। সাতটা চাঁদির টাকা আছে ফুলকলিয়ার। প্রথমে রেখেছিল ঘরের পেছনদিকের দেয়ালে একটা ফাটলে—তার

ওপর নিজের হাতে গোবর-চাপড়ি দিয়ে ঢেকেছিল। কিন্তু বলা যায় না, কখন শাস নিজে কিংবা ছোটাকে ঘুঁটে তুলতে পাঠায়। পরে এ কথা খেয়াল হলে সে কাঁচা গোবর মাখা টাকাগুলো সেই দেয়ালের উপরকার চালে একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে গুঁজেছে। আসার আগে আজ সেই টাকা বের করতে কতবার বুকে খিল ধরার দাখিল। ভাগিস ওদিকটায় বাড়ির মেয়েদের 'জল-সারা'র জায়গা। ওদিকে যাবার সময় কাউকে শুনিয়ে বলে যেতে হয়—জল সারতে যাচ্ছি গে। ব্যস। তাহলে আর কেউ যাবে না ততক্ষণ।

টাকাটা ঠকাস করে সামনে ফেলে ফুলকলিয়া পিছু ফেরে না। গলিপথটুকু বেরিয়েই সে যখন বড় রাস্তায় উঠেছে, নির্মলা হাসতে হাসতে তার কাঁধ ধরে ফেলে। —তুই এত্তা রাগ করবি জানলে আমি কি বাত করতুম রী! ঘাট মানছি বহিন। বাত শোন। হাঁ, গাটুয়া আর এতোয়ারি ছেনিমা দেখতে এসেছে, হামি জানি। তোকে বলিনি। হামি ওদের নীচের তলায় দেখতে পেয়ে ছিলুম। এতোয়ারিদা বেজায় হাসছিল—তাও ভি শুনেছিলুম। তো তুই ডর পাবি বলে বলিনি। ছোড় দে বহিন!

নির্মলা পা পাড়ায়। সেই টাকাটা ওর হাতে গুজে দেয়। ফুলকলিয়া নেয়। কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা থাকে রূপোর চাকতিটুকু। রাস্তায় ভিড় আছে। দুধারে অজস্র আলো জ্বলছে। ঝলমল করছে সাতরাজার ধনের মতো দোকানপাট। আসার সময় শহরের শুরু থেকে রিকশো চেপে এসেছিল। তখন ফুলকলিয়া বরাবরকার মতো সব গিলেছে। অভিভূত হয়েছে। কত কী জানতে চেয়েছে। ওই উঁচুতে এতবড় বাকসোর মতো ওটা কী বহিন? জলের টাং। অত উঁচু লম্বা পাঁচিল কিসের? জেহেল খানা। গারদ।...ময়দানে ওরা দৌড়চ্ছে কেন রী?... বল খেলছে।...ভহল?...নেহী রী! ব-অ-ল। ওই ছাখ, গোলমতো—লাথি মারছে! আসমানে উঠে যাচ্ছে... কুমড়াকা মাফিক রী! খিলখিল করে হেসেছে ফুলকলিয়া।

আর এখন সে কিছু দেখছেনা। তার চাহনিতে একটা ভয় পাওয়া ভাব। তার পা ফেলার মধ্যে গাঁওয়ালফেরা মেয়ের ক্লান্তি। নির্মলা বুঝতে পারেনা, এত ভয় কেন পেল ফুলকলিয়া। শাশুড়ী আজ সকালে পিট্টি দিয়েছিল—ছেনিমা দেখার কথা জানতে পারলে ভয়ের কারণ একটা স্বাভাবিক। কিন্তু শাশুড়ীর কানে তুলছেটা কে? গাটুয়া আর এতোয়ারি নীচের তলায় আছে। তারা টেরও পেতনা কিছু। তারা বেরিয়ে গেলে অনেকটা দেরী করে তারা বেরুত। তারপর গলির মুখে রাধাদার বাড়ি ঢুকত। কিছুক্ষণ গপসপ করত। রাধাদা নির্মলার দূর সম্পর্কের এক দাদা। কোন এক বাবুর আমবাগান দেখাশোনা করে। শহরের গায়ে লাগা

অনেক আম কাঁঠালের বাগান আছে। রাত না লাগলে আর রাধাদা বাড়ি না থাকলে আমবাগানেই থাকত—নির্মলা চলে যেত সেখানে এবং গাছপাকা আম নিয়ে বাড়ি ফিরত। ফুলকলিয়াও পেত বই কি। এ কি তোমার নিষাদবাগের খাট্টা আম? তরমুজের মতো লাল ভেতরটা—স্বাদে পানতুয়া। এইসব বলতে বলতে নির্মলা হাঁটে। ফুলকলিয়ার কান নেই।

বড় রাস্তায় যেতে-যেতে ডাইনে সরু গলিরাস্তা একটার পর একটা—সোজা গঙ্গার পাড়ে গিয়ে থেমেছে। নির্মলা একটা গলির কাছে হঠাৎ থামে। ফুলকলিয়ার হাত ধরে বলে—রাত 'শুন। রাত হয়ে গেছে। এমন করে ফিরব বলে তো আসিনি। তোর দাদার সঙ্গে বাবার কথা ছিল। আয়, দেখি সে আছে নাকি।

ফুলকলিয়া অস্ফুট স্বরে বলে—শরৎদা?

—হাঁ রী। তেরা শালকা ভাতিজা! নির্মলা হাসতে হাসতে বলে। কথাটা তাই ছিল। আমরা কিছু না জানিয়ে চলে গেলেও বেচারা ভাবনায় পড়বে না? অতখানি পথ বহু বহুড়ী যাবেই বা কেমন করে?

বিকেলের শোয়ের টিকিট না পেয়েই এতটা ঝামেলা হয়ে গেছে। এসেই দেখেছিল 'চৌদ ফুল।' ছবি শুরুও হয়ে গিয়েছিল। বেরতে দেরী হয়েছিল তো ফুলকলিয়ার জন্যেই। অগত্যা সন্ধ্যার শোয়ের টিকিট কাটতে হয়েছিল। টিকিট কেটে নির্মলা ততক্ষণ বাইরে ঘুরতে চেয়েছিল—ওর মরদের খাতিরে কত জায়গায় জানাশোনা। কিন্তু ফুলকলিয়াকে নড়ানো যায়নি। এসে থেকে সে বড্ড ঘাবড়ে রয়েছে। কলাবেড়িয়ার কারও চোখে পড়লে যে বিপদ। বাবার কানে তুলে দেবে। অগত্যা ওপরে মেয়েদের বসার জায়গায় গুটিসুটি বসে থাকতে হয়েছে। মুখ ঢেকে ঘোমটা টেনেছে। খুব জ্বালান জ্বালাচ্ছে ফুলকলিয়া।

নির্মলা যে নীচে গিয়ে চা খেয়ে আসবে, পান খাবে—তার যো ছিল না। ওকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে এতোয়ারির জংলী বউ। অবশ্যি ওপরে চা-ওলা এল। চোখ নাচিয়ে বলল—নির্মলাদি যে! শরৎদা কই? ভাল তো খবর?…

নির্মলার কত চেনা টাউনবাজারে! ফুলকলিয়া তাজ্জব বনে গেছে। তাই বলে চা খেতে রাজী নয় সে। ধুর ধুর? এত্তা গরমের মধ্যে ওই গরম জিনিস খায় মানুষে? নির্মলা তারিয়ে-তারিয়ে খেল বটে। ফুলকলিয়া ভয়ে ভয়ে ভেবেছে, বাবুবাড়ির মেয়েরা চা খাচ্ছে—নির্মলাও খাচ্ছে। কেউ এসে বলবেনা তো—এই মেয়ে! চা খাচ্ছে কেন? কেউ বলল না। আর সবচেয়ে তাজ্জব, নির্মলার চেহারা দিব্যি মিশে গেল বাবুবাড়ির বহু-বহুড়ীর মধ্যে! খুব প্রশংসার চোখে তাকিয়ে থেকেছে এতোয়ারির বউ। হ্যাঁ, তোকেও ভি মানিয়ে যাবে। তোর অমন গড়ন

স্বী ফুলিয়া! শুধু তোর হাবভাবে তুই ধরা পড়ে যাবি। অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিস কেন? আর তোর সারা গতরে রূপোর গয়না নিয়েই মুশকিল। ছাখ না, আমি কী পরেছি।

উঁহু, ও তুমি যতই বলো ফুলকলিয়া যা পরার পরে থাকবে। পা ফেলতে, নড়তে, উঠনে-বসতে এই যে মিঠে ঝুম ঝুম আওয়াজ, বড় মন কেমন করা আওয়াজ—এটা বলে বোঝানো যাবে না। যেন গানের সুর নিয়ে সারাক্ষণ চলাফেরা বেঁচে থাকা রাত কাটানো। দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠতেই কী মিঠে আওয়াজ জানিয়ে দেয় এ ঘরে এক যুবতী মেয়ে আছে। তাই বলে এতোয়ারিকে পুছতে যেও না, ওর কান নেই। আদ্ধেক রাতে হঠাৎ তো ওর ঘুম ভাঙেনা। ভাঙলেও পাশ ফিরে শোয়। পাথরকা মাফিক। ফুলকলিয়া তো ভাবতেই পারে না সে চলছে কথা বলছে বেঁচে আছে অথচ ওই মিঠে আওয়াজ নেই তার! তেমন শব্দহীন যখনই হবে, তখন—ও মা গো! হামি মরেই যাব—তেরা বেটাকা কিরিয়া। তাই এ হচ্ছে কিনা ফুলকলিয়ার থাকার ছন্দ—তার প্রাণেরই ধ্বনিপুঞ্জ। দোহাই ঠাকুরবাবা, তাকে শব্দহীন কোরোনা। ফুলকলিয়া থমকে দাঁড়ায়। কোথায় নিয়ে এল তাকে নির্মলা? কয়েকটা একতলা দালানের মধ্যিখানে খোলা চত্বর। সেখানে বিরাট তারাজু ঝুলছে—দুদিকে তিনটে করে আড়াআড়ি বাঁশ দাঁড় করানো। গুড়ের টিন। চারপাশে 'চাকিক বাত্তি' জ্বলছে। নিবাদবাগের ছেলেমেয়েরা বিজলী বাত্তিকে বলে 'চাকিক-বাত্ত।' কিন্তু এত খন্দের বস্তা, গুড়ের টিন দেখে ফুলকলিয়া অভিভূত। এ যে সাতরাজার ধন! তার বাবা মাস্তবরের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। পাঁচ বস্তা খন্দ উঠোনে ভরে লোকটা যখন শান্ত চোখে তাকায়, তখন তার বেটির মনে হয়েছে—ওহ্ এক রাজা; সেই রাজা এখানে স্রেফ প্রজা হয়ে গেল না?

এত্তা গৌ! নিজের অজানতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা। নির্মলা ফিসফিস করে বলে—সাহাবাবুর আড়ত। ওই দ্যাখ, ওই যে লোকটা বসে কলম চালাচ্ছে—ওই! তোর দাদার সঙ্গে খুব ভাব। আয় না, লজ্জা কিসের গো? আমাকে দেখে সাহাবাবু কত খাতির করে দেখবি!

ফুলকলিয়া গোঁ ধরে দাঁড়ায়। তারাজুতে খন্দের বস্তা ওজন হচ্ছে। কয়াল হাঁক দিচ্ছে—ও তুমি কিছুতেই বুঝবে না। ও একটা 'বোলি।' পেঁক···পেঁক! পেঁক—পেঁক! ন ঠেন ঠে···ন ঠেন ঠে—ঘেঁস—ঘেঁস! ছ্যাঃ—ছ্যাঃ! ব্যাপারী দালাল গাঁয়ের চাষাভূষোর ভিড়ে আড়ত গমগম করছে। খরার মাস। অনেকটা রাতঅব্দি ওজনদারি কেনাবেচা লেনদেন চলবে। গঙ্গার ধারে গরুমোষের গাড়ি রেখে এসেছে ওরা। ট্রাকও দাঁড়িয়ে আছে। সরু গলি দিয়ে বিশাল-বিশাল মুটেরা বস্তা ঘাড়ে

বয়ে আনছে—হাতে কাস্তের মতো বাঁকা সূচলো 'মাকু।' ঘাড়ের বস্তা আঁকড়ে ধরেছে মাকু বিঁধিয়ে। গলিতেও চিরিক-বাত্তি ঝুলিয়ে দিয়েছে সাহাবাবু। ওজন শেষ হলে দাম মিটিয়ে গাড়োয়ানরা চলে যাবে গাড়ির ওখানে। রান্নাবান্না করবে। খেয়েদেয়ে গাড়ি ছাড়বে। গাঁয়ে পৌঁছুতে সকাল হয়ে যাবে—কারও দুপুর।

নির্মলার দিকে চোখ পড়তেই কেউ চেঁচিয়ে ওঠে—শরৎ! ও শরৎ! তোমার গিন্নি এসেছে। গদী থেকে সাহাবাবু মুখ তোলেন। ঠোঁট দুটো লাল। পান চিবুতে চিবুতে হাসেন। তিনিও চেঁচিয়ে বলেন—শরৎ! কোথায় গেলে হে? শমন এসেছে। শমন। সাহাবাবু হাসেন। এস নির্মলা, চলে এস; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

নির্মলা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফুলকলিয়াকে নিয়ে চত্বরে ওঠে। ফুলকলিয়া আরও খানিকটা ঘোমটা টেনে দেয়। আড়তের ওজনদারি দরকষাকষি হট্টগোল চকিতে যেটুকু সময় থেমেছিল, তার মধ্যে ফুলকলিয়ার রূপোর গয়নায় মিঠে বাজনা! অলৌকিক সৌন্দর্য বয়ে গেল কয়েকমুহূর্ত। এইসব হাটবাজারী জীবনের খসখসে নীরস মাটি আর খন্দের মেঠো গন্ধ চাপা দিয়ে এল অলীক জেল্লাময় প্রবাহ। অমৃত ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়ে তক্ষুণি সরে গেল। তারপর কয়াল হেঁকে ওঠে আবার—নঠেন ঠে··· নঠেন ঠে! ঘেঁস - - - ঘেঁস। চ্ছা···চ্ছা চাক্কা। কালো-কালো পালোয়ানমুটে ভার কাঁধে নিয়ে কুঁজো হয়ে লাল চোখে তাকিয়ে ছিল। আবার মুণ্ডু কাত করে ভার টানে। তাদের পায়ের শব্দে মেদিনী কাঁপে। টালি বাবু গলির মুখে মোড়ায় বসে ছিল। তার হাতে টালিকাঠিগুলো গুনতে কি ভুল হল? সে সংশয়ে ভোগে।

—এটি কে নির্মলা? সাহাবাবু সস্নেহে বলেন। —বসো, বসো। বেঞ্চের দিকে আঙুল তোলেন। নির্মলা কিন্তু ওঁর তক্তপোষের গদীতেই বসে—সাহাবাবুর কাছেই।

ফুলকলিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে তাকে বেঞ্চ দেখিয়ে বলে—বৈঠ্ গে হুঁয়া।

সাহাবাবু বলেন—বসো, বসো। এই গদী নির্মলারই। বলে আবার হাঁকেন—ও শরৎ!

ফুলকলিয়া শরমে জড়সড় হয়ে বসে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ওজনদারি দেখে। ওই বিশাল তারাজু যে তার অচেনা নয়, নির্মলাকে বলবেখন। তার বাবার ক্ষেতের মাঝখানে ওই তারাজু পেতে বেলডাঙ্গার মহাজন আলু ওজন করে।

নির্মলা মুখ টিপে হেসে জানায়—আমাদের গাঁয়ে আছে এতোয়ারি, তার বউ। এতোয়ারিকে আপনি চিনতে পারবেন না বাবু। সে গাঁওয়াল করা মানুষ। টাউন বাজারে আসেই না।

ফুলকলিয়ার রাগ হয়। তার চেয়ে বললেই পারত, কলাবেড়িয়ার মাতব্বর

মোড়লের মেয়ে। মাস্তবর হররখত টাউন বাজার করে বেড়ায়। সে কি এই সাহাবাবুকে চেনেনা? খুব চেনে।

—শরৎ বুঝি বেরিয়েছে। এসে পড়বে' খন। সাহাবাবু কলমবাজী করেন আর বলেন। হুঁ, ভাল কথা। বলছিল যেন, তোমরা আসবে। ও মুকুন্দ! শরতের বউকে চা বিস্কুট এনে দে: দুজন আছে।

নির্মলাও লজ্জাহীন মুখে বলে—মুকুল! পান আনিস যেন।

পেন্টুলপরা কালো ধেড়ে এক ছোকরা, যার মাথায় বড় বড় চুল আর গায়ে ময়লা গেঞ্জি দাঁত বের করে।—বলতে হবে না নির্মলাদি। ওই দিদিও খাবেন তো পান?

—খাবে রে ছোঁড়া, খাবে। যা তো শিগগির! নির্মলা চোখ রাঙায়। সাহাবাবুর অত কাছে বসে দিব্যি আঙুল মটকাতে থাকে। তাই দেখে ফুলকলিয়া আরও তাজ্জব। আর নির্মলার তামাসা-মস্করা চলতে থাকে সমানে। কয়াল মুটে খাতাবাবু, এমন কি গাঁয়ের ব্যাপারীদের সঙ্গেও। কারো নাম ধরে ডাকে। তুই তোকারি করে। কাকেও খুড়ো, কাকেও শশুর বলে ডাকে। খবরাখবর শুধোয়। এদিকে ফুলকলিয়ার মাথার ঘোমটা অজানতে খসে যেতে থাকে। টের পেলেই সে আবার টেনে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব, নির্মলা অমন বাঙ্গালী বোলি বলতে পারে জেনে।

সাহাবাবু বলেন—সিনেমা দেখলেনা যে?

নির্মলা খিলখিল করে হাসে।—জিগ্যেস করুন না এতোয়ারির বউকে! হলে ঢুকে আদ্ধেক দেখে মেয়ের মাথা-খারাপ। পালিয়ে এল। পয়সাই বরবাদ।

—কেন? মাথাখারাপ হল কেন? সাহাবাবু খাতায় চোখ রেখেই বলেন।

ফুলকলিয়া এমনি তার মল-পাঁয় জোরপরা ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দেয় নির্মলার পায়ে। নির্মলা টের পেয়ে আরও হাসে। হাসতে হাসতে বলে—এই প্রথম। চোখে লাগল বুঝি!

—চোখে লাগল মানে?

—আমার মরণ! সাহাবাবু বোঝেননা—চোখে লাগল মানে। চোখে সইলনা গো, সইল না। চোখ জ্বলে গেল! নির্মলা আচমকা হাত বাড়িয়ে ফুলকলিয়ার পাঁজরে গুতো মারে। হাসতে হাসতেই।

বড্ড বেশি বেহায়াপনা করছে নির্মলা। ফুলকলিয়ার মনে সকাল থেকে যে বিদ্রোহের ভাবটুকু ছিল, উবে যেতে বসেছে। মেয়েদের এতখানি কি ভাল? নিষাদবাগে যাই করো সেখানে সবাই আপনজাত আপনজন। মাজা দুলিয়ে যতক্ষণ খুশি নাচো, গান করো—রঙ গুলে পিচকিরিতে ভরে মরদগুলোর কাপড় রাঙিয়ে

দাও—রসের কথা বলো। একই গাছে পাতার মতো সেই সব চঞ্চলতা। আর এ যে অন্য জায়গা, অন্য সব মানুষ।

সাহাবাবু খুক খুক করে হাসেন। লোকটাকে অবশ্য ভালই লাগছে ফুলকলিয়ার। নয়তো এক্ষুণি উঠে হনহন করে চলে যেত। রাগে গরগর করছে তার মন। আর কখনো আসবেনা নির্মলার সঙ্গে। গঙ্গাজল পাতাবে ভেবেছিল, তাও পাতাবে না।

এই অভিমানের সময় শরৎ এসে যায়। এসেই নির্মলার দিকে নয়, এতোয়ারির বউয়ের দিকে তাকিয়ে খুশি প্রকাশ করে। আরে ব্বাস! মেরা বহিন আ গেয়ি গে! ছেনিমা ক্যায়সা লাগা বহিন?

ফুলকলিয়ার কী হয়, সে ঘোমটা সরিয়ে স্বাভাবিক মুখে হাসে। শরৎ গাঁ সম্পর্কে ভাসুর। তার দিকে মুখ তোলা বারণ। কিন্তু এখন সে সেই নিষিদ্ধ গণ্ডী ডিঙিয়ে যায়। যেন নির্মলাকে বিশ্বাস করতে পারছিলনা—অচেনা ঠেকছিল। এখন শরৎদা তার বোলিতে কথা বলেছে, বহিন সম্ভাষণ করেছে, নাকি পলকে নিজেদের হারানো জায়গা খুঁজে পেল—এতেই এতোয়ারির বউ গলে যায়। বলে—দাদা, জলদি ঘর যানা। হাঁ—আভি। রাত হুয়ি বহৎ।

—বইঠো বহিন। জরুর যায়েগা। এক মিনিট।—বলে শরৎ সাহাবাবুর অন্য পাশে বসে। কী সব বলতে থাকে চাপা গলায়। ফুলকলিয়া বোঝে না। অনুমান করে হিসাবনিকাশের কথা চলছে।

সেই মুকুন্দ ছুটো চায়ের কাপ প্লেট আর একটা কেটলি হাতে এল এতক্ষণে। তার হাতে রাংতা কাগজের মোড়কে পানও আছে। নির্মলা কাপ কেটলি নিয়ে গদীর ওপর রাখে। চা ঢালে। পানের মোড়কটা ফুলকলিয়ার দিকে এগিয়ে মুকুন্দ বলে—ধরো ছোটদিদি।

ফুলকলিয়া কিন্তু হাত বাড়িয়ে নেয়। পান সে কদাচিৎ খায়। সে যখন ছোট, নাকি তার বাবার পানের বরজও ছিল। ঝামেলা বলে পরে আর পানচাষ করতনা মাস্তবর। শাশুড়ী কিন্তু পানের পোকা। কখনও মন হলে বউকে বলে—আ রী বহু, পান খাউগি? তব্ লে। ফুলকলিয়া পান হাতে নিয়ে নির্মলার দিকে তাকায়। নির্মলা কাপে চা ঢেলে প্লেটসুদ্ধ এগিয়ে দেয়। —ধরো গে।

এমন করে চা খায় মহাজন আর বাবুমশাইরা। ঘাটে খান ঘাটবাবু। আর মাঝে মাঝে ধনপতির ছেলে সূর্যের কাছে অফসর লোক আসে, তারা খায়। ধনপতির ঘরে এসব জিনিষ আছে। কিন্তু কলাবেড়িয়ার মাস্তবরের ছিলনা। মাস্তবরের বেটির অবশ্যি চা খেতেও ভাল লাগে না। এখন নির্মলা তার সামনে ধরেছে, সে দ্বিধায় ভোগে। তাই দেখে শরৎ বলে—লো গে বহিন। বাবু খাওয়াইস।

সাহাবাবু বলেন—হ্যাঁ, নাও। বলেই চেঁচিয়ে ওঠেন—ওরে মুকুন্দ হতভাগা! বললুম যে বিস্কুট আনবি।

মুকুন্দ মস্তো জিভ বের করে পেন্টলের পকেটে হাত ভরে। ঠোঙায় ভরা বিস্কুট দিয়ে যায়। শরৎ হেসে বলে—বাঁদর নির্ঘাৎ মেরে দিত!

বাঁদর শুনেই ফুলকলিয়া লজ্জা ভুলে এতক্ষণে খিলখিল করে হেসে ওঠে। মুকুন্দর চেহারার সঙ্গে বাঁদর বা হনুমানের মিল আছে—সেই হয়তো ওর হাসির কারণ। হাসির চোটে তার ঘোমটা সরে যায়। হাতের চা পড়ে যায় খানিকটা। নির্মলা পা সরিয়ে নিয়ে তেড়েমেড়ে বলে—এত হাসি এখুনি! শাশুড়ি জানতে পারলে ঠুকনি দেবে রে!

আর চিরিক-বাত্তির আলোয় রূপোর গয়নাপরা ফর্সা রঙের যুবতীটি কয়েকটি মুহূর্ত আবার ওজনদারি দর কষাকষি খন্দ ভূষিগুড়ের এবং ঘামের দুনিয়াকে পায়ের তলায় চেপে রাখে। আবার লোকজনের চোখে রঙের ঘোর লাগে। এতোয়ারির বউ হঠাৎ টের পায়, তার শরীর চেটে খাচ্ছে লম্বা-লম্বা জিভ। সে ঘোমটা টানে। গা ঢাকে। তারপর অসহায় চোকে তাকায় শরতের দিকে। শরৎ বলে—চা পিও বহিন। বিস্কুটভি খাও। বাবু দিইস—তেরা খাতির।

অগত্যা ফুলকলিয়া চায়ে চুমুক দেয়—কিন্তু একটু ঘুরে বসে। বিস্কুট কামড়ায়, ইঁদুরের শস্যকণা কুরে খাওয়ার মতো। মন্দ লাগে না চা। ক্ষিদেও পেয়েছে তো! সেই দুপুরে ঘাট থেকে ফিরে নির্মলার তদ্বিরে শাশুড়ী পাতে ভাত খুলেছে। রাগ দুঃখ ছিল, পেট খালি রেখে খেয়েছে। তাছাড়া খাবার সময় শাশুড়ীর বকবকানি শুনলে কোন বস্তুর পেটে ভাত ঢুকতে চায়? কি না, ধনপতিয়ার বেটার গায়ে ধাক্কা লেগেছে। লেগেছে তো কী হয়েছে?

নির্মলা বলেছে—চোখে সাবুনের ফেনা ছিল। তাই দেখতে পায়নি গো! ইচ্ছে করে কি গায়ে গা লাগাতে যায় কেউ, আর ও কিনা বড়ঘরের বেটি। মাঝেমাঝে দুএকখানা সাবুন ওকে দিও কাকী! এখন পেটেকোলে নেই—এখনই তো গা মাজবার সুসময়। বুড়ি তখন চুপ। পাল্টা কিছু বললে নির্মলা ওকে টাকা ধার দেবেনা যে!

চা আর বিস্কুট. আর এই কাপ-প্লেটের মধ্যে আবছা এক দুনিয়ার স্বাদ পায় ফুলকলিয়া। সে পবিত্র কিছু রাখার মতো সাবধানে নীচে কাপ-প্লেটটা রাখে। নির্মলার যেন ওঠবার নাম নেই। সে চোখের ইশারা করে বলে—উঠ গো।

শরৎ হাতের ঘড়ি দেখে বলে—বাপ রে! বাবু চলি। কাল সকাল নটায়, তাহলে।

সাহাবাবু হাত নড়েন। নির্মলা ওঠে। ফুলকলিয়াও। সাহাবাবু বলেন—নির্মলা, আবার এসো তাহলে। তুমিও এসো।

ফুলকলিয়া মাথা দোলায়। কেন আসবে এখানে, সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার মনে হয়, নির্মলার যে এত সাহস, গাঁয়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা, কাকেও গ্রাহ্য না করা—সব কিছুর ঘাঁটি যেন এখানেই। সে কি নির্মলা হতে পারবে? পারলেও তা চাইবে না। মেয়েদের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গদী থেকে নেমে গিয়ে পানটা মুখে ভরে সে। মুহূর্তে মিঠে ঠাণ্ডা স্বাদে সে আপ্লুত।···

শরৎ সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে হাঁটে। সে আগে, পিছনে ফুলকলিয়া আর নির্মলা। নির্মলা ছেনিমার ব্যাপারটা বলতে বলতে চলে। শরৎ হাসে আর বলে—এতোয়ারি ছেলেটাকে হাটুয়া মজিয়েছে। তা পুরুষ মানুষ একটু-আধটু ফুর্তি না করলেও চলে না।

জেলখানা ছাড়িয়ে বাঁধে ওঠে ওরা। আর আলো নেই। বাঁধের ডানদিকে ঝোপঝাড়—তারপর গঙ্গা। বাঁদিকে খোলামেলা ক্ষেত, কখনও বাগান। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। কখনও ঘন্টি বাজিয়ে সাইকেল চলে যায়। ফুলকলিয়া চুপ। সে অন্ধকারেই জিভ বের করে লুকিয়ে রঙ দেখছে। শরৎ বলে—মুখিয়াকা ঘর ভোজ খাতে হামি না যাবে গে বহু, সমঝা? তু যাকে বলিস, বিমারী ছে।

নির্মলা বলে—হামি ভি না যাবে! ধনপতিয়ার বেটির গায়ে হলুদের দিনে আমি গেলুম তো মোল্লান কথাই বলল না।

বাঁদিকে বাঁশবন। ডাইনে বাঁধের গা ঘেঁসে বড় একটা গাছ। তার তলায় আগুন জুগজুগ করছে। কেউ বিড়ি সিগারেট টানছে। শরৎ একটু দূর থেকেই বলে—কে?

—শরৎদাদা? হামি হাটুয়া। এতোয়ারি ভি।

—মরণ নেই ছে তেরা বে!

ফুলকলিয়া থমকে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলা তাকে টানে। চাপা গলায় বলে—ডর কাহে গে? ডাগদার বাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম তোকে। আয়।

কাছে গিয়ে শরৎ বলে—আবে এতোয়ারি! তোর বহুর বিমারি হবে আর আমাদের মাগমরদের ঘাড়ে ডাক্তার দেখাবার বোঝা চাপবে? বড় ঘরে বিয়ে করছিস। একটু লক্ষ্য রাখিস। এখন এই নে—তোর বহু।···শরৎ হো হো করে হাসে।

এতোয়ারির জবাব নেই। কিন্তু ফুলকলিয়া আশ্বস্ত হয়।

## ॥ চার ॥

শুধু আশ্বস্ত হয় নি—যেন এই প্রথম ফুলকলিয়া তার পাশরকা মাফিক মরদটার জন্যে বুকের তলায় কী টান টের পেয়েছিল। ছেনিমাঘর, অচিনঅজান লোকজন আর হল্লাজেল্লা—আর ওই সাহাবাবুর আড়তদারি, হোঁৎকামোটা পালোয়ান মুটেগুলো—যাদের হাতে বড়শির মতো আজব সূচলো অস্তর, আর যাদের চোখে ছিল লকলকে জিভ—তাদের মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল কিনা। তার চেয়ে এই লোকটা তার কত আপন। বাঁধের সাঁইবাবলার ঝাড়ে যেমন সোমলতার ঝালর, তেমনি হলুদ রঙের বাহার হয়ে এই মরদটার গায়ে তাকে ঝুলে থাকতে দিয়েছে না ঠাকুরবাবা? শহর থেকে ফেরার পথে সে রাতে ফুলকলিয়ার মন ছিল উথালপাথাল। ইচ্ছে করছিল, সরস্বতী বুড়িয়ার বেটাকে অন্ধকারে ছুঁয়ে থেকে হাঁটে। পাশে যেন সতীন ওই শরৎদালালের বউ। তার তো কথায় কথায় মস্করা। শরৎ যেন পুরুষ মানুষই নয়, আর হাটুয়াটাও ঠাকুরবাবার থানের মানুতে পাঁঠা—ধোঁত ধোঁত করে এগোচ্ছিল। মাঝে মাঝে নির্মলার গুঁতো খেয়ে কঁক করে ককিয়ে উঠছিল। আর সেই উথাল পাথাল আবেগে আরও ঝড় তুলে নির্মলা বলল কি না, ও এতোয়ারিদা! তোমার বহুর পেটে কাচ্চাবাচ্চা না এলে আমার ছাড়াছাড়ি নেই! কী লজ্জা কী শরম ফুলকলিয়ার! অন্ধকারে ঝাঁকে ঝাঁকে বকুলতলায় ফুল ছড়াছড়ি তখন। তখন আকাশে তারারা খুশি হয়ে হেসেছে। আর নিষাদবাগের থানের পাশে শিমুল-গাছের মাথা থেকে ভারিভুরি আশীর্বাদ করে বলছিল, তোর ক্ষেতে ফলুক মণ-মণ শকরকন্দ! তোর বাহানে (মাচায়) ঝুলুক থরেবিথরে হরেক ফল। তোর ঘরে গাইগরু হোক দুগ্ধবতী। গঙ্গামাইজীর কিরপায় তোর জীবনের দুধারে জাগুক উর্বরতা। কোলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দহের ঘাটে তুই কবে নাইতে যাবি গো ফুলকলিয়া!

তো এতোয়ারির যেন হুঁশ ছিল না সে রাতে। নির্মলার কথা শুনে শরম পাচ্ছিল? ফুলকলিয়া চাইছিল, তার মরদটা কিছু বলুক। মুখের পাল্টা মুখ করুক। বলুক—না গো নির্মলাদি, হামরা তোদের মতো বাঁজা-বাঁজিন নই। অথচ এতোয়ারি চুপ। কেন অত চুপ ছিল সে? সে রাতে ধনপতির বাড়ি থাওয়া সেরে এসে উঠোনেই শুল। কেন শুল অমন একা একা? দাওয়ায় সারারাত ননদ ছোটীর পাশে শুয়ে ফুলকলিয়ার দুচোখে নিঁদ ছিল না। কী সমঝাল বুড়িয়ার বেটা? কেন আজ তাকে নিয়ে শুলনা? ভাবতে-ভাবতে ফুলকলিয়ার চোখে জল এল। ফুলকলিয়া

চুপিচুপি কেঁদেছিল। ঠাকুরবাবা! তুমি সাক্ষী থাকো! সাক্ষী থাকো গে ভারিভুরি ঠাকরানীরা! আমি কোন গলতি করিনি। আমার মরদ আমাকে বেফয়দা এত্তা দুখ্ দিল! আর শেষ রাতে ফুলকলিয়া স্বপ্ন দেখল। দেখল বাঁধের ওপর গাবগাছ তলায় ধনপতি সরকারের ছেলে সুরযপতি সরকার খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।…

সুরযপতি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গামাইজীর কাঁধ বরাবর চলেছে এক নীচু বাঁধ। সেই বাঁধে রোজ সকাল বেলা সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে নিমডাল। পাতাগুলো আস্তে আস্তে ছেঁড়ে। তারপর ডালটা কামড়ে তাকায় পূবে। পূবে সকালের রোদজ্বলা মাঠ। সেই মাঠে রুখা শুখা পাট আর আখের চারা, আউষ ধানের আঁকুর আর ফুলবতী তিল একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করে। ফের সুরযপতি তাকায় দক্ষিণে। বাঁধ বরাবর নজর রাখে। এঁকেবেঁকে কতদূর চলেছে আর চলেছে এই বাঁধ। করলহাটি ছাড়িয়ে সুজাপুর চকবাহাদুরপুর মহলা চন্দ্রপুর গোঁসাইতলা পেরিয়ে-অচিন অজান মুল্লুকে। সুরযপতি কী দেখে? দেখে ধরম-পথ। তাঁর বাবা ধনপতি বারোয়ারি বটতলায় হুঁকো খেতে খেতে বলে, ওই হল গিয়ে ধরমপথ—চলে গেছে ঠাকুরবাবার দেশে। ধরমপথের কিনারায় এই পঞ্চায়েততলা। ধনপতি বলে, দশের কাছারি। তো মুখিয়ার বেটা কি উদাস চোখে তাকিয়ে ধরমপথে চলে যাবার কথা ভাবে? ওর মুখে যেন সেইরকম চাপা ভাব। ফুলকলিয়া হলফ করে বলতে পারে। কেন পারবে না? 'অমন পুরাভরা যোয়ান বয়সে কেউ কি বিভা না করে থাকতে পারে? ও তো হাটুয়া নয় যে টাকার জন্যে বিয়ে হয় নি। ও মুখিয়া গাঁওপতির বেটা। লিখাপড়হা শিখেছে। দশের কাছারিতে হরবখত তো ধনপতির মুখে ওই এক বাত—সুরযুয়া 'মেট্রিরি' পাস দিয়েছে। 'মেটরি'টা কী, কে বলে দেবে কলাবেড়িয়ার মেয়েকে? কলাবেড়িয়া বড় গাঁও বটে। সেখানে তো ও জিনিস কেউ বোঝেনা। আর সুরযপতিয়ার বিয়ে না হবার কারণ কি ওটাই? সে নাকি বলেছে, গাঁয়ে উল্কিদাগা ঔরতকে সে বিভা করবে না। এত বড় তাজ্জবের কথা। তাদের জাতে উল্কিছাড়া মেয়ে কি থাকে নাকি? ভারি-ভুরির পুজার সময় মাটির নতুন সরায় কলাই গাছ নিয়ে গিয়ে বসলেই তো দুই বাহুতে উল্কি দেগে দেবে ঠ্যাং-কাটা ল্যাংড়া রঘুয়া। ওই তোমার চিহ্ন। পরকালে তোমায় দেখলেই ঠাকুরবাবা চিনে নেবেন, আর যমদূতদের হাত থেকে তোমার ইজ্জত বাঁচাবেন। ফুলকলিয়ার ফর্সা দুই বাহুতে কব্জি অব্দি উল্কির কত নকশা। নাহান করতে করতে দুই বাহু ছড়িয়ে সে গভীর সুখে দেখে। আর সুরযপতির কিনা উল্কি ছাড়া মেয়ের দিকে পসন্দ! আজীব বাত রী ছোটি! উসকা মাথা বিগাড় গেয়া রী—হাঁ!

ছোটীও শুনে বলে, হাঁ বৌ বউদি। মহলার দশরথের বেটির সঙ্গে সুরযুয়ার বিভার কথা তুলেছিল মোড়ল। সব পছন্দ হল ওর, লিখাপড়হা ভি জানে—খালি পছন্দ হলনা উল্কির দাগ। সাচ বাত। পুছো না মাকে। না, শাসকে তাই বলে পুছতে যাবে না বহু।

এখন অবশ্য ছোটীরও উল্কি নেই। ঋতুমতী হলেই তাকে ভারি-ভুরির পুজো দিয়ে উল্কি দেগে নিতে হবে। নতুন কোরা সাড়ি পরবে ছোটী। বাচ্চা মেয়েরা গান গাইবে। সে এক দিনের মত দিন! কুমারী মেয়ের বিয়ের পিঁড়িতে বসার সময় হয়ে এল কি না। ভারি-ভুরি অদৃশ্য আমকাঠের পিঁড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে শিমুল গাছের ডগা-থেকে। দাঁড়কাক ডাকলেই তা টের পাওয়া যাবে।···

তো কী ভাবতে কী ভেবেছিল ফুলকলিয়া স্বপ্ন ভেঙে! কেন এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে? নাহানে গিয়ে চোখ সাবুনের ফেনায় অন্ধা হয়ে গিয়াছিল, তাই না ওর গায়ে গিয়ে একটু ধাক্কা লেগেছিল! ছি ছি, শরমের কথা। বাকি রাত আর ঘুম আসেনি। উঠোনে এতোয়ারির মাথা বালিশ থেকে সরেছে। বালিশটা গেছে মাটিতে। একটুখানি বাঁকা মুখে ফুলকলিয়া চলে যায় ঘরের পিছনে 'জল সারায়' জায়গায়। আর, পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা ঘুপটি জায়গাটায় তখনও অন্ধকার। হঠাৎ মনে হয় কোন মরদ তাকে দেখছে। অস্বস্তি নিয়ে ঝটপট কাজটুকু সেরে চলে আসে সে। ফের শোয়। তখনও পোঁহাতকাল আসে নি। বারোয়ারি বটের মাথায় ঝুঝকি তারা জলজল করছে। একবার কাক-কোকিল ডেকে উঠেই যেন ভুল টের পেয়ে চুপ করে যায়। নিষাদবাগে আবার একটা দিন আসছে। হঠাৎ ফুলকলিয়ার মনে হয়েছিল এ দিনটি অন্যদিনের চেয়ে অনেক আলাদা। এর এক হাতে আছে সুখ অন্য হাতে দুঃখ। সুখের কথা ভেবে ফুলকলিয়া চোখ বোজে, দুখের কথা ভেবে তখনই চোখ খোলে। বুড়িয়ার বেটাকে সে ভালবাসায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল।

হুঁ, একটা কিছু হয়েছে এতোয়ারির। ভোর বেলা আজকাল নয়নসুখের ভাগ্নে হাটুয়া এসে তাকে নিঁদ থেকে ওঠায়। কত রকম ফুসুর-ফাসুর গুপুর-গাপুর চুপা বাত চলে দু'জনে। আর অবাক কাণ্ড, এতোয়ারি ফিকফিক করে হাসে। এতোয়ারি আয়নায় মুখ দেখে। দাঁত খোঁটে। চুলে একটু বেশি তেল দেয়। সিঁথা করে চুল আঁচড়ায়। আর বোনকে ডেকে বলে, ছোটীগে! হামার জামাটা জেরা সাফ করে দিবি, বহিন? ছোটী আড়চোখে বউদিদিকে দেখিয়ে চাপা হাসে। ওর তো ওই। কিসে হাসতে হবে, না-হবে সে তার নিজের খেয়াল। শেষঅব্দি ঘাটে গিয়ে কাচতে হবে বহুদিদিকেই। বহুদিদি দু-দুবার ছুঁড়ে দূরের জলে ফেলে দেবে। আর ছোটী

আর্তনাদ করে ঝাঁপ দেবে। তারপর শাসিয়ে বলবে, থাম রী থাম্। দাদা আসুক। এবং পাছে মাকে দেখতে পেলেই—মাগে! তেরা বহু তেরা বেটার পিরান ফেক্ দেইলা গে।...

ধনপতি মুখিয়ার বেটির বিয়ের ক'দিন পরে সন্ধ্যাবেলা এক ঝামেলা হয়ে গেল। বারোয়ারি তলায় পঞ্চায়েত বসেছিল আচানক। ব্যাপারটা কী? বুকে ধুকুধুকু নিয়ে ফুলকলিয়া বারকতক ঘরবার করে শেষে ছোটীকে নিয়ে 'মাঠ সারবার' ছলে বাঁধের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটী টানে বারবার। তবু নড়ার নাম নেই। মন চঞ্চল। মামলাটা কিসের না শোনা অব্দি সোয়াস্তি নেই। যেই না শরৎ দালালের বউ নির্মলার নাম ওঠা, থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ফুলকলিয়া। উরু থেকে পায়ের তলাঅব্দি অবশ। ছোটী টানে, পেটে ব্যথা বেজেছে—হুঁশ নেই বহুদিদির। তারপর সে ফিক করে হেসে উঠেছিল—ও রী! যোমনা কানীর মামলা।

তাহলেও পঞ্চায়েত বসা মানেই অস্বস্তির কথা। একচোখে অন্ধা যমুনাবুড়ি শরতের সৎ মা। সৎবেটার কাছে সে থাকে না। থাকে যার বাড়িতে তার নামই উজ্জিদার রঘুয়া। মজার কথা, তার আবার একটা ঠ্যাঙই নেই। সে মন্তর-তন্তর জানে। কবরেজী করে। গরু-মোষেরও বিমারী সারায়। আর নিষাদবাগের বহুবেটিদের তো একসময় সকাল-সন্ধ্যে ভুতে পেত। আজকাল কম পায়। রঘু ল্যাংড়া সেইসব ভূত ভাগায়। দাঁত কিড়মিড় করে হেন্তাল কাঠের অষ্টবক্র লাঠিটার ডগা দিয়ে মাটিতে দাগ টেনে ফুঁ দিয়ে বলে—ছুঃ! যাঃ! ভাগ! গঙ্গা পার হয়ে পালা। ফের যদি গঙ্গার এপারে আসিস শিশিতে ভরে নদ্দিমে ফেক দেগা। যমুনা তার পিসি হয়েই ঝামেলা বেড়েছে বরাবর। ওর জন্যেই নাকি রঘুয়ার বউ ভেগে গেছে। উঠতে বসতে পিসিকে একশো গালমন্দ শাসানি দুবেলা চালিয়ে যাবে—অথচ শেষমেশ শরতের বাড়ি থেকে কোনদিন চাল-ডালটা না এলে তক্ষুণি মোড়লের বাড়ি সে হাজির হয়ে একথা ওকথা বলার পর মামলা তুলবে। গাঁয়ে রঘুয়ার দাম আছে। গরীবগুরবো লোক বেশির ভাগই। টাউনে গিয়ে ডাক্তারের ওষুধ খাবার পয়সা সবার নেই। যাদের আছে, তারাও হিসেব করে চলে। এককাঠা কলাই বা চাল দিয়ে খুচ-খাচ বিমারী যদি সারানো যায়, কেন অমূল্য সময় নষ্ট করে টাউনে বেশি পয়সা খরচ করতে যাওয়া? তার ওপর জানোয়ারের বিমারী আছে। এবং সবচেয়ে যা আতঙ্কের, তা হল কি না গাছগাছড়া লতাপাতার বিমারী। গাছলতা ফুল-ফল মূলমাকড় যাদের বেঁচেবর্তে

থাকায় একমাত্র উপায়, তাদের কাছে ওই ল্যাংড়া মানুষটার দাম কত, বাইরের কেউ বুঝবে না। একমাচান চিকন সবুজ লাউ লতার প্রাণচঞ্চল লকলকে এগিয়ে যাওয়া আচানক কোন অদৃশ্য ভয়ঙ্করের হুমকিতে থেমে কুঁকড়ে যায়—কোন চাবুকের ঘা লাগে নরম পাতাগুলোর বুকে—কালো দাগ পড়ে যায়, সবই জানে রঘুয়া। জলপড়া ছিটিয়ে দিলেই আবার বন্ধ প্রাণধারা ভরা গঙ্গার মতো ছলছল বয়ে যেতে থাকে। বেগুনক্ষেতে যে মড়ার মাথাগুলো বাঁশের ডগায় আটকানো, তা রঘুয়া ছাড়া কার সাধ্যি যোগাড় করে? যদি বা কেউ অতিসাহসী গঙ্গার আনাচ-কানাচ খুঁজে কুড়িয়ে-কাড়িয়ে আনল, সেই রাত থেকেই তার চালের খচমচানি শুরু হবে। সন্ধ্যে বেলা তার বাড়ির বহু-বহুড়ী ঘাটমে গেলেই মুণ্ডুর খোদ মালিক পিছু ধরবে। জীবনে বাঁচতে হলে এত হরেকরকম দিগদারী আর ঝামেলা আছে। নিষাদবাগে রঘুয়া না থাকলে কী হত, ভাবতে ওই মুখিয়ার মতো লোকেরও বুক কাঁপে। অতএব তার ডাকে পঞ্চায়েত বসাতেই হয়। ধনপতি সরকারের লোক হয়ে নয়নসুখ জোরে হাঁক মেরে আসে—সরকারজী বোলাইছে-এ-এ বটতলামে-এ-এ! সন্ধ্যার খাওয়া-দাওয়া সেরে বিড়ি বা হুঁকো টানতে টানতে বাড়ির কর্তারা গিয়ে জোটে। নানারকম বাত চলতে থাকে। বছরের গতিক, টাউনের হালচাল, রাধার ঘাটের চৌবেলালজীর খবর। তার সঙ্গে প্রচুর রসিকতা। আদালত তামাসা দিয়েই শুরু হয়। হাসিতে তোলপাড় হয় সন্ধ্যারাতের বটতলা। দু'একটা লণ্ঠন বা হেরিকেনও জ্বলে। তবে বারোয়ারি হেরিকেন হাতে সরকারজী এসে পৌঁছুলেই যে যার আলোর দম কমিয়ে দেয়। ভরত—যার ক্ষেতির পরিমাণ মুখিয়ার নীচে, সে তো হেরিকেনটা তুলে ফুঁ দিয়ে বুতিয়েই ফেলে। বড্ড বখিল লোকটা। তারপর কিছুক্ষণ মুখিয়াজীর তামাসা। মাঝে মাঝে সেও কিন্তু অপ্রস্তুত হয়। আজকালকার যোয়ানরা বড্ড বেয়াড়া। ধনপতি টাউনের কথা তুলে নিজের অভিজ্ঞতার দৈর্ঘ্য ঘোষণা করে। গঙ্গামাইজীর কাঁধ বরাবর উত্তরে গিয়ে জঙ্গীপুর এবং দক্ষিণে গিয়ে কাটোয়া—এর মধ্যে তার অচিন-অজান কিছু নেই। তো হাটুয়া থাকলেই প্রশ্ন করবে—সরকারজী! কাটোয়া গঙ্গার পুরবপাড় নাকি পচ্ছিমপাড়? মুখিয়াজী কিছু না ভেবেই বলবে—পুরব পাড়। অমনি হাটুয়ারা হাসাহাসি করবে। ধনপতি কপট রাগে ধমকায়, হাসতা কাহে গে! হাসবে না? এত্তা ছোটা বয়সে সরকারজী কাটোয়া টাউনে গিয়ে থাকবে, তাই ভুল হয়েছে। উও তো পচ্ছিমপাড়! অগত্যা নয়নসুখ ভাগ্নেকে ধমকে বলে, থাম গে! টাউন হটতে-হটতে আজকাল পচ্ছিমপাড়ে চলে গিয়েছে। আগে পুরবপাড়েই ছিল। হাটুয়া ফিস ফিস করে বলে, মামা বিলকুট ঝুট বাত বলছে।

আর এর ফলেই বটতলায় গাম্ভীর্য এসে যায়। রঘুয়া মুখিয়াজীর সামনে তার আস্ত পাটা ছড়িয়ে বসে খৈনী ডলছে। তার নিজের বুদ্ধিতে তৈরি করা একটা ক্রাচ পাশে পড়ে আছে। । সে ফুঁ দিয়ে হাতের তালু থেকে খৈনী তুলে মুখিয়াকে এগিয়ে দিয়ে বলে, হাঁ সরকারজী। অর্থাৎ খৈনী নিয়ে মামলা তোল। ধনপতি খৈনী গালে পুরে হাঁক দেয়—হাঁ। যোমনাদি! বলো বহিন।...

কথায়-কথায় শেষ অব্দি শরতের টাউনবাজ বউয়ের কথা এসে পড়ে। বুড়ির মতে, শরৎ বড় ভাল। শরৎ বেটা চালটা ডালটা আনাজ-পাতিটা ঠিকই পাঠাতে বলে। ওর বহু না পাঠিয়ে মরদকে ঝুটমুট জানায়, হাঁ—ভেজেছি। তো আজ দুদিন হামি একজেরাত্তি দানাপানি পাইনি। রঘুয়া ল্যাংড়া মানুষ। কেন তার ঘরের দানায় ভাগ বসাব বলুক গাঁওলারা? গত মাসে শরৎ একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছিল। সেটা শেয়ালে খেয়ে ফেলল। তো বেটা শরৎ বলল, মাগে! সবুর কর। ফের তোকে আরেকটা ছাগলের বাচ্চা দেব। কেন এলনা সেই ছাগলের বাচ্চাটা? নিশ্চয় ওই বহু-মাগী ঝুটমুট বুঝিয়ে অন্য কাউকে পালতে দিয়েছে। শরতের কথা নড়চড় তো হবার নয়।

তাহলে আসামী শরতের বউ নির্মলাই! শরতকে এখন কোথায় পাবে? সে টাউনে ঘুরছে। ফিরতে অনেক রাত হবে। বেরোবেও একেবারে 'ঘোরানি' থাকতে, তখনও ঝুঝকো তারা আকাশে জলজল করবে। মুখিয়াজী একবার পুছে নিয়েছে, নির্মলা এখানে আছে কিনা। না থাকলে খবর দিয়ে এস নয়নসুখ! আর নয়নসুখ লণ্ঠনের দম তুলে লাঠি হাতে চলে যেতেই নির্মলার নামে গুচ্ছের নালিশ উঠতে থাকল। কার মুখে হাত দেবে সরকারজী?...

ফুলকলিয়া ঠিক এই সময় এসে পড়েছিল। নির্মলা গাঁয়ের বহুবেটিকে আর সাচ্চা থাকতে দেবেনা। সবাইকে টাউনবাজ না করে ও ছাড়বেই না। সাবুন মাখার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ইদানীং, সে তো ওরই কারচুপিতে। ভজুয়ার বউ নাকি সোনার গয়না ছাড়া পরবেই না বলেছে। তাই ভজুয়া—না-মরদ কমজোর বোবা ছোকরা নাকি টাউনে গিয়ে রূপোর নিকারি পঁহুচী মল-বাজু বিলকুল বেচে সোনা কেনার মতলব করেছে। আরে বুদ্ধু কোথাকার! একটুকুন সোনা বহুৎ বড়েয়া চীজ। সোনা ঘরে থাকলে সে তো রাজা। কিন্তু তাই বলে বউ যা বায়না ধরবে, তাই করতে হবে?

আর কী করেছে নির্মলা—না, লুকিয়ে বহুবহুড়ীদের অনেককে ডাক্তার দেখাবার নাম করে ছেনিমা দেখিয়ে এনেছে। হা ঠাকুরবাবা! এতকাল ধরে নিষাদবাগ বলতে গেলে টাউনের গা ঘেঁষে বসে আছে—টাউনে আসা যাওয়া হরবখত তো

চলে আসছে, তবু নিষাদবাগের লোক টাউনবাজী শেখেনি। শিখতে চায়নি। মাথাগুনতি পুছে দেখ, কজন টাউনে গিয়ে ছেনিমা দেখেছে! কথাটা হচ্ছে, ছেনিমা দেখাটা কিছু দোষের নয়—অন্তত পুরুষ মানুষের কাছে, কিন্তু বেফায়দা পয়সা খরচ করার কী মানে হয়, হিসেব করে বলো। ছুনিয়ায় কত ভাল-ভাল চীজ আছে, তা না পেলেও তো মানুষের চলে যায়। নিষাদবাগের মানুষ ছুনিয়ায় অত বেশী কিছু চায় নি কোনদিন। মেঘ ঠিক-ঠিক সময়ে বর্ষাক, ব্যস! পরণে নেহাৎ শরম ঢাকার জন্যে একটু কাপড়-চোপড়, বিয়ে করার জন্যে গয়নাগাঁটি, আর সারাবছর তিনবেলা পেটের রুজি। আর কী চাই মানুষের? ক্ষেতি আর গাঁওয়াল-ঘোরার জন্যে তারা জন্ম নিয়েছে। তার বাইরে পা বাড়িয়ে কিসের সুখ পাবে?

কিচ্ছু না—কিচ্ছু না! গাঁওলা বুড়োরা একসঙ্গে সায় দেয়। গায়ে ঘাম জমবে, ধুলোকাদা লাগবে—তার জন্যে গাঁয়েই আছে গঙ্গা। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাও। খেয়েদেয়ে আরামসে নিঁদ যাও।…

হাটুয়া এতোয়ারিকে চিমটি কেটেছে। তুজনই একটু উদ্বিগ্ন। নির্মলার নামে তখন নালিশ উঠেছে পুরোদমে। গাঁকে খারাপ করবে শরতের বউ। বউঝিদের মাথা বিগড়ে দেবে! উঁহু—দেবে নয়, দিয়েছেও। নয়নসুখের বিধবা বেটি অঞ্জলাকে ফুঁস দিয়েছে। টাউনে কার সঙ্গে নাকি দুসারা বিভার যোগাড় করেছে গোপনে। লোকটা কে, তাও অনুমান করে ফেলল ছুএকজন। রামভগত তামাকওলা ছাড়া আর কেউ নয়। হাঁ, রামভগতই বটে। তামাক আর খৈনী বেচতে মাঝে মাঝে গাঁওয়ালে যায়। শরৎ বাড়ি না থাকলেও ঢোকে সে। দাওয়ায় বসে চাও-ভি পিয়ে। হাসাহাসি ভি করে শরতের বউয়ের সঙ্গে। আরে ছো ছো! রামভগত ভিনজাত। অচিন আদমী। ওই যে ঘাটে আছে অত টাকাওলা চৌবেলালজী। সেও যদি বলে, নিষাদবাগের বেটি বিভা করব—জান গেলেও কোন বাপ বেটি দেবে ওকে? চৌবেলালজীর টাকার অভাবে গাঁ শ্মশান হয়ে যাক, তবু না।

ফুলকলিয়া শিউরে উঠেছিল। অঞ্জলা অন্ধকার পাটকাঠির মাচানের দিকে মেয়েদের ভিড়ে কেঁদে উঠেছে। কে শোনে এমন কান্নাকটি! শতমুখে শত কথা বেরুচ্ছে। আর এতোয়ারি!

এতোয়ারি চমকে উঠে মুখ তুলেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ওদিকে ফুলকলিয়ার মুখ সাদা। চোখ বড়ো হয়ে গেছে। কে এমন করে আচানক ডাকল এতোয়ারিকে—যেন স্বয়ং ঠাকুরবাবাই। ভরতের গোঁফটাই দেখতে থাকে মাগ-মরদে, এখানে এতোয়ারি ওখানে বাঁধের কোলে অন্ধকারে ছোটা আর ফুলকলিয়া। ভরত

ভরাট গলায় ভর্ৎসনা করে বলে—আর এতোয়ারি! বাত শুন একঠো। খবর্দার বেটা! বহুকে শরতের টাউনবাজ বহুটার সঙ্গে মেলামেশা করতে দিবিনে।

অনেক কষ্টে এতোয়ারি শেষে হাসল। তারপর কোন রকমে বলে, কাহে গে কাকা?

ভরত আরও গম্ভীর হয়ে হুঁকো থেকে কলকে নামায়। খুঁচিয়ে আগুন পরখ করে বলে, বলছি। ব্যস। আর বাত পুছিস নে। যদি ইচ্ছে হয়, মানবি। ইচ্ছে না হয় মানবিনে। তুই নিজের ঘোড়ার পিঠে থাজ কেটে সওয়ার হবি যদি, তো কার বলার কী আছে। ব্যস!

আর হাজার প্রশ্নেও ভরতের জবাব পাওয়া যাবেনা, সবাই জানে। অগত্যা এতোয়ারি হাটুয়ার দিকে তাকায়। হাটুয়া চোখ টেপে। ঠোঁটের কোণায় হাসি।

ফুলকলিয়ার তখন বাঘিনীর মতো গর্জে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করছিল না? করছিল তো। সে কি না বড় গাঁও কলাবেড়িয়ার বড় ঘরের বেটি। তার নামও উঠল বটতলায়? ফুলকলিয়ার ইচ্ছে করছিল না ভরতের গাছের বাকলের মাফিক কোঁচকানো চামড়া নখে ফালাফালা করে ফেলে? ওর গোঁফ ওপড়ায়, টাকের বাকি সাদা চুলগুলো ছিঁড়ে পায়ের তলায় ঘষটে দেয়? ইচ্ছে করছিলই তো। কিন্তু সে যে এ গাঁয়ের বহুড়ী। নামী লোকের বেটি। আর শাসবুড়িকে সে রাক্ষুসীর মতো ভয় পায়। এই ব্যর্থতা তার অন্ধকার চোখ জলে ভরে দিচ্ছিল। মা গে! কোথায় চলে এলায় গে, কোন আজব মানুষের দেশে!

সেই সময় নয়নসুখ ফিরে আসে। জানায়, শরতের বউ বলেছে—মেয়ে হয়ে বটতলার ডাকে বাড়ি থেকে একা-একা কেউ যায় নাকি? মরদ আসুক। তখন সে তাকে নিয়ে আসবে।

হ্যাঁ, এর বিপক্ষে কিছু বলার নেই। ধনপতির আবার ওই এক দোষ। গাঁয়ের সব বউঝি ওর সঙ্গে বাবা-মেসো-খুড়ো পাতিয়ে বসে আছে। বটতলা ছাড়লেই তখন অতি সাদাসিদে গোবেচারা মানুষ। পথেঘাটে মেয়েরা ওকে নিয়ে হাসিতামাসা করতে ছাড়ে না। আসলে লোকটা দরকারমতো কড়া নয়। সেদিক থেকে ওর বাবা রঘুপতি সরকার ছিল যোগ্য মোড়ল মুখিয়া মানুষ। ভরাট গলা আর তেমনি চাহনি। ভরভয় পেত লোকে। তার ছেলে ধনপতি একেবারে উল্টো মানুষ। এই দেখ না, নির্মলার বিরুদ্ধে আর যেন বলার কথাই পাচ্ছে না।

একথা সেকথা এসে গেল। কিন্তু আর নির্মলা নয়। আকাশের গতিক নিয়ে ভয়-ভাবনার কথা। আর কয়েকটা দিন শুখা গেলে নির্ঘাৎ আকাল পড়বে মুল্লুকে। অমঙ্গলের লক্ষণ কে কী ঝটপট দেখেছে জানাতে থাকে। রঘুয়া ওস্তাদ মানুষ। সে

খুবই গম্ভীর হয়ে যায়। কানী যমুনাবুড়ি একচোখে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার গলার কাছটা গিধনীর মতো ধকধক করে কাঁপে। তারপর রঘুয়া ঘোষণা করে—সমঝে নাও সমঝওয়ালারা, কেন ঠাকুরবাবার কিরপা হচ্ছেনা। টাউনবাজীর কথা ছেড়ে দাও। এই যে বললে ছেনিমা—উওভি ছেড়ে দাও।

তব? ধনপতিই প্রশ্ন করার অধিকারী। সে পুছ করে—তব ক্যা?

পিছে বলব জী। রঘুয়া বলে। আভি পিসির মামলার ফয়সালা হোক।

স্তব্ধ গম্ভীর বটতলা। হাবভাব দেখে এবং পেটের ব্যথাটা বাড়ায় ছোটী বহুদিদিকে ছেড়ে চলে যায় অকুতোভয়ে বাঁধের ওপাশে কোথাও। ফুলকলিয়া থির—পা আটকে গেছে। চোখ অনেকটা শুকনো হয়েছে। আর হঠাৎ সেই ভাবনাভরা স্তব্ধতা ভেঙে একটু তফাৎ থেকে নির্মলার রুষ্ট গলার ঝাঁঝ ছড়িয়ে আসে। হনহন করে পুরুষের সীমানায় ঢুকে কানী সৎ-শাশুড়ীর দিকে আঙুল তুলে বলে, এই বুঢ়িয়া! সাচ কথা বল। খবর্দার! এক তিল ঝুট বললে তোকে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দেব! আজ সকালবেলা হরিয়াকে চাল মসুরকলাই দুটো পাকা কলা একটা আম পাঠাইনি?

রঘুয়া ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। বুড়ি কুচ্ছিত একটা গাল দিয়ে ওঠে। ধনপতি একবার ধমক দেয়। নির্মলার গলা চড়তে থাকে। গাঁওবালারা ফ্যালক্যাল করে তাকায় শুধু। শরৎ দালালের সঙ্গে কারও না কারও অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছেই। কারও কাল-পরশু, কারও আজ রাতেই। ভেতরে-ভেতরে তার টাউন থেকে ফেরার পথ চেয়ে কেউ উদ্বিগ্ন। বুড়ি জবাবে শুধু অস্পষ্ট গাল দিতে থাকে। ধনপতি বা ভরতের শাস্ত ধমকে কাজ হয় না। নির্মলা তো নিষাদবাগের কাকেও পরোয়া করে না।

সঙ্গে সঙ্গে ফুলকলিয়া চাপা খুশিতে ফেটে পড়েছে। নির্মলার ওপর আবছা বিরক্তি যা কিছু জমেছিল মনের কোণায়—সব সাফ হয়ে গেছে। আসলে এজন্যেই তো ওকে ফুলকলিয়ার বরাবর এত পসন্দ। নিষাদবাগে বউ হয়ে আসার পর এই একটা মেয়েকেই তার নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে, তার কারণটা হল এই। সাফ সাফ বাত করতে আর মরদ-মাগীগুলোকে ঠাণ্ডা করতে নির্মলার জুড়ি নেই। এবছর ভারি-ভুরির পুজোর দিন ওর সঙ্গে গঙ্গাজল পাতাবেই পাতাবে।

ফুলকলিয়া আরও সন্তুষ্ট হয়, কানী বুড়িটাকে তার শাস কল্পনা করতেই। কবে সরস্বতীয়ার মুখের ওপর নির্মলা অমন আঙুল তুলে হাঁকডাক ছাড়বে? কবে তার বেটা এতোয়ারির নাকের ডগা থামচে দিয়ে নির্মলা বলবে, ওগে বলদা, নি-মরদ, বুড়বাক অন্ধার অন্ধা ভোঁসড়িরাম?

রঘুয়া ল্যাংড়া তখন চোখ পিটপিট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে। আ রী শুন, শুন্! মেরা বাতাঠো তো শুন ভাই! চেল্লানিতে ফায়দাটা কী? ইজ্জতওয়ালীর ইজ্জত তো নিজের কাছে। শুন রী!

নির্মলা ওর দিকে রুষ্ট চোখে তাকায়। ধনপতিও ফাঁক পেয়ে বলে, বেটি! দশের আদালতে নিষাদবাগের কোন মেয়ে আজ অব্দি এমন বোলচাল করে নি। তো করলহাটির মেয়েরা যেন বাপের গাঁয়ের ইজ্জত ডোবায় না।

ধনপতি মোড়ল একটু হাসেও - তামাসা করে বলল কিনা। তখন নির্মলাও ঠোঁটের কোণায় যেন একটু হাসে। তৃপ্তির হাসি ছাড়া আর কী! আর রঘুয়া হেসে বলে—ছাগল রী বহু, ছাগল! পিসি ছাগলের জন্যে মরার ফুরসৎ পাচ্ছে না, বুঝলিনে?

—হাঁ, ছাগল। ভরত মনে পড়িয়ে দেয় এতক্ষণে। শরৎ সৎ-মাকে আরেকটা ছাগল দেবে বলেছিল না? বটতলায় হাসির ধুম পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। পাটকাটির মাচানের দিক থেকে মেয়েরাও খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

নির্মলা রঘুয়াকে লক্ষ্য করে বলে, পিসিকে বলে দাও। ওর বেটারও এখন মরার ফুরসৎ নেই। ফুরসৎ হলেই ছাগল বেঁধে দিয়ে আসবে। তারপর সে হনহন করে আলো থেকে সরতে সরতে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়। বটতলার আদালত তার চলে যাওয়া দেখতে থাকে। লাল রঙের তাঁতের শাড়ি, তাতে কালো ডোরা— অন্ধকারে গিয়েও জল-জল করতে থাকে। টাউনবাজ মেয়েটার এভাবে চলে যাওয়ার মধ্যে বাঘিনীর আদল আছে যেন। ভরত হাই তুলে বলতে থাকে, জমানা বদলে গেল। আর কী! এই নিষাদবাগের মেয়েরা কেউ ঘরবন্দী ঔরতও না, বোবাও না। দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল। মুল্লুকে-মুল্লুকে হাটবাজারগঞ্জে টাউনে তারা না ঘোরে এমন নয়। ভিনজাতের মরদের সঙ্গে দরাদরি করে আনাজপাতি বেচে। নিষাদবাগের কেন, তল্লাটে তাঁদের মেয়েদের মুখরা বলে বদনামও আছে। কেউ এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েনা। ফাঁকি দিয়ে কম পয়সা দিয়ে ভেগে গেলে মেয়ে তার গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে পাকড়াতে পারে। বাবুভদ্দরকেও ভি ছাড়েনা। তো কথা হচ্ছে, সে এক রকম টাউনবাজী। লেকিন শরতের বহু? ও তো গাঁওয়াল হাটবাজার ঘোরে না আনাজপাতি নিয়ে—ওর অন্য রকম টাউনবাজী।...

ভরত কথা শুরু করলে সে এক রামায়ণ। কিন্তু তার মতো ব্যাখ্যাকার আর কেউ নেই নিষাদবাগে। চুলচেরা হিসেবনিকেশ করে সব ব্যাপারের তলাঅব্দি দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে। বটতলা গোড়ার কথার খেই ফিরে পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

আবার নির্মলার নামে একশো নালিশ-শুরু। কেউ কেউ উঠেও যায় হায় তুলতে-তুলতে। মেয়েরাও অনেকে ওঠে। কার বাচ্চা কাঁদে। কে ডাকে। ধনপতি সরকার নয়নসুখকে কলকে সাজাতে ফরমাস করে। আর ভাঙা-হাটের হাওয়া উঠতেই ফুলকলিয়া বাঁধে গিয়ে ডেকেছে ছোটীকে। কোথায় গেল ছোকরীটা? বার দুই ছোটী গে বলে ডেকে সে সাড়া পাবার আশা করে। ছোটী কখন রাগ করে ভেগেছে বুঝি। আরও কয়েক পা এগোতেই কী একটা আওয়াজ শোনে ফুলকলিয়া। ঝনঝন খনখন আওয়াজটা যে 'টিপগাড়ি' অর্থাৎ সাইকেলের তাতে ভুল নেই। বাঁধের ওপর রাস্তাটা মোটে হাত দুই বা তারও কম চওড়া। দুধারে ঝোপঝাড় আকন্দ সাইবাঁবলা কেয়া পিটুলি আর কত রকম ছোট বড় গাছ—হিজল ভাডুলে জাম ছাতিম গাব। আকাশ ভরা ডগমগে তারা। ফুলকলিয়ার চোখে বটতলার আলোর ধাঁধা তখনও ঘোচেনি এবং আচানক যেন বুকের ওপর ক্রি রি রি রি রি রিং - - -

আই মা রী! চাপা আর্তনাদ করে ফুলকলিয়া লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু অন্ধকার রাতের বেহুদা অন্ধা টিপগাড়ি তার ওপর এসে পড়েছে। বাঁধের গায়ে ঝোপের ধারে ফুলকলিয়া বেটাল হয়ে গড়িয়ে গেছে। তাতেও বাঁচোয়া নেই। সাইকেলের চাকা আর লোকটাও তাকে চেপে দিয়েছে।

হঠকারী টিপগাড়িওয়ালা বেহায়া। আবছা খুক খুক করে হাসতে হাসতে কীভাবে তার টিপগাড়ি সামলাল, ফুলকলিয়া টের পেল না। তাকে বেজেছে। টিপগাড়ির চাপে নয়, লোকটার একটা পা পড়েছিল উরুতে। ফুলকলিয়া ধুড়মুড় করে উঠে ফুঁসে বলে—কৌন গে? অন্ধা না কানা?

—টর্চকা বেট্রি বিগড়ে গিয়েছে রী! চোট বেজেছে নাকি? মাফ্ দিস ভাই!

সঙ্গে সঙ্গে ফুলকলিয়া চমকে ওঠে। উরু দুটো থরথর করে কাঁপে। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ে। সুরথপতিয়া! ধনপতি সরকারের বেটা। ছি ছি, কী শরমের বাত! ফুলকলিয়া ঝটপট ঘুরে দাঁড়ায়। অন্ধকার—সেও যথেষ্ট নয়, ঘোমটা টেনে দেয়।

—কৌন রী তুম?

মনে মনে ফুলকলিয়া তবু ফুঁসতে ছাড়ে না। আমি কে তাতে মুখিয়ার বেটার কী দরকার? সেদিন না হয় চোখে সাবুনের ফেনা ছিল বলে আমি তোমার গায়ে পড়েছিলাম। আজ তুমি এসে হামার গায়ে পড়লে। এ যেন শোধের কারবার।

বাত বোলা নেই কাহে রী?

—মোড়লের বেটার অত দিগদারি কেন? ফুলকলিয়া ফুঁসে ওঠে, কাহে? কেন কথা বলব?

সূর্য হাসল।…এতোয়ারিদার বহু। হাঁ। মাফ দিস ভাই।…সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সে ফের বলে যায়। তো খালি তোমার সঙ্গেই কেন ধাক্কা লাগছে রী বহু?

ফুলকলিয়ার বুক দুলে ওঠে আচানক এই বাতে। তার কী হয়ে যায় যেন, একশো রকম কথা আর তোলপাড়—অভিভূত। ঘোমটা সরিয়ে অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কেউ নেই আর। স্বপ্নটা মনে পড়ে যায়। একটু পরে ভাঙা গলায় সে অকারণ ডাকে—ছোটা! তু কাহা রী? নিজের স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগে।

## ॥ পাঁচ ॥

চৌবেলাল ঘাটোয়ারির গন্ধ তুমি অনেক দূর থেকেই পাবে।—নয়নসুখ এই বলে মুখ উঁচু করে যেন গন্ধ শোঁকে। আর তাই দেখে ধনপতি মুখিয়ার মতো গুরুগম্ভীর মানুষও তামাসায় মেতে যান।

—আবে নয়নসুখ! গন্ধটা কেমন পাচ্ছিস? মিঠা, নাকি বদ? বরষাতে আসছে, নাকি পিতে?

নয়নসুখ খিকখিক করে হাসে।—নিষাদবাগের কুত্তা চিল্লাচ্ছে জী! শুনো না! ওই!

সত্যি কথা। চৌবেলালজী এলেই কুকুরগুলো প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তো চৌবেলালজী না ভালুকওলা মাদারী ঢুকছে গাঁয়ে, সেটা বুঝতে আচমকা কোন কুকুরের ঘ্যাঁও করে ককিয়ে ওঠা যথেষ্ট। মাদারী এলে কেউ কুকুর থামাতে ঢিল বা পাবড়া ছোঁড়ে না। জানোয়ার দেখে জানোয়ার চেঁচাচ্ছে, চেঁচাক। তাই তো নিয়ম। লেকিন চৌবেলালজী মানী আদমী। বলেন—কী মুখিয়াজী, গাঁওবালা কুত্তা পুষেছে অনেক?

ধনপতি কথাটা বুঝতে পেরে বলে—আপনি বছরে দো-এক দফা আসেন কি না। অজানা লোক দেখলেই কুত্তা চেঁচায়। হরঘড়ি আসুন, তাকিয়েও দেখবে না।

চৌবেলালজী তাই বলে মুখিয়ার বাড়ি বসবেন না। ঘাটঘাটে ঘুরবেন।

দাদনখাওয়া পাট আর আউষের চারা খুঁটিয়ে দেখবেন। এবার বড্ডবেশি শুখা পড়েছে। টাকা উসুল হবে কি না সমস্যা। খবর পেয়ে তো বটেই, আকাশের গতিক দেখে আসতে হয়েছে।

তবে মানুষটি বড় ভাল। মুখে মিঠে বুলি। আর, তাঁর আসাতে গাঁসুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত। দুধের বাচ্চাও মায়ের স্তন থেকে মুখ তুলে ঘাটোয়ারিবাবুকে দেখতে থাকে। ছাগল

চয়ানী আধন্যাংটো ছোকরিটাও প্যাট প্যাট করে তাকায়। বুধিনী আর সুধিনী দুই যমজ বোন বহুরী—বোবাকালা মেয়ে। গাঁয়ের শেষে ঘর তাদের। বহুরী ভাষায় তারিফ করে বাবুজীর। বাচ্চাওয়ালি তাঁর বাচ্চাকে ফিসফিস করে শেখায়—বোলো, চৌবেজী! তুম আচ্ছা তো! ভালো তো চৌবেজী? পাখির স্বরে নরম আওয়াজ শুনে চৌবেজী এসে তার গাল টিপে আদর করে।—এ সরবতিয়া! তেরা বাচ্চা বহুৎ দুবলা কাহে গে? জ্বরজ্বালা হচ্ছে নাকি?

সরবতিয়া ঘোমটা আরও টেনে দেয়। তার মাতৃহৃদয় হু-হু করে গলে যায়। —নেহী বাবুজী! খারাপ হাওয়া লেগেছে। অনেক দেখাচ্ছি, সারছে না। হামার নিদ আর আসে না বাবুজী!

তো কার কথার জবাব দেবে চৌবেজী? ভিড়ে একশো কথা চারদিক থেকে ঘিরেছে তাঁকে। তবে হঠাৎ বড়া আদমীর মেজাজ বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।—এ নমু! তেরা মরদ কাঁহা গে?

—জী চৌবেজী, পৌহাতকালে গাঁওয়ালে গিয়েছে।

—ঝুট বলছিস কেন গে?

—আপনার কিরিয়া বাবুজী…

—এ মেরা ভাতিজাকা বেটা! এ রামলাল! ভেগে যাচ্ছিস কোথায়? শোন।

রামলাল আজ গাঁওয়ালে যায় নি। রাস্তার ধারে গভীর নয়ানজুলি—তার ওপারে ঝোপঝাড়। ছোট গাছপালা। আঁকসি দিয়ে শুকনো ডাল ভাঙতে-ভাঙতে চৌবেজীকে দেখেই হাঁটু ভাজ করেছিল। নজরে পড়ে গেছে। স্রেফ মুখের কথায় তিনটে টাকা ধার পেয়েছিল গতমাসে। আর টাউনেও যায় না—ঘাটের দিকে তো নয়ই।

এইসব আদর আর বকুনি, কখনও শাসানি দিতে-দিতে গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় কদম গাছের তলায় দাঁড়ায় চৌবেজী। ধনপতি গতিক বুঝে আকাশের কথা তোলে। চৌবেজী গোঁফে তা দিতে দিতে আকাশ দেখে। প্লেন যাচ্ছে ঈশান কোণে। ভাগীরথীর ওপর চিল উড়ছে। —হাঁ। একফোঁটা বরষানো উচিত ছিল। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

—তাতো হবেই! দার্শনিক নয়নসুখ বলে। বড়বেশি লোভ হয়েছিল যে! তোমরা শাকসবজি ফলমূলটা নিয়ে থাকবে। ভারি- ভুরির সেবা করবে।..বড় চাষে হাত বাড়াতে গিয়েছ--বোঝ ঠ্যালা।

গাঁওলারা এর জবাব খুঁজে পায় না। বরং মাঠের ম্রিয়মান ছবি এঁকে চৌবেজীর সামনে ধরে। প্রভুরাম বাবুলাল দয়ারামরা যথাসাধ্য বোঝায়। চৌবেজী গুম হয়ে

থাকে। তারপর বলে—তোমাদের কী? আমিই রাস্তায় বসব। এবং একটু পরে—যা রে নয়নসুখ! তোর ভাগ্যে কোথায়? হাটুয়া?

—গাঁওয়ালমে চৌবেজী। নয়নসুখ উদ্বিগ্ন মুখে তাকায়। টাকাকড়ি ধার করেছে নিশ্চয়। পরক্ষণে মুখ ফুটে কোনরকমে শুধোয়——কাহে জী?

হাসে চৌবেলাল।—এমনি। বড় ভাল ছোকরা। কাজের ছেলে আছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে ওকে।

এমনি নয়নসুখ হাতের তালু চিৎ করে একমুখ হেসে বলে—তব্ লিয়ে লিন।

—হুঁ! ওটা কে? সামনে হিজলতলায় মেয়েদের মধ্যে কাকে দেখছে চৌবেজী।

—বুধিনী।

—উঁহু!

—তব্ সুধিনী।

—আরে না। চৌবেজী তারপরই চিনতে পারেন।—এ বুঢ়িয়া! এ সরস্বতীয়া পিসি!

এতোয়ারির মা খুশিতে আকুল হয়েই সামনে এল। খবর পেয়ে মাসকলাই পিষতে পিষতে উঠে এসেছে। হাটুয়াকে পছন্দ চৌবেজীর আর তার বন্ধু এতোয়ারিকে পছন্দ হতেই বা কী দেরী। অমন সুন্দর ছেলেটা হাল্লাক হচ্ছে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে। এই খরার দিন—তার ওপর জুটেছে এক নচ্ছার বউ। জোয়ান মরদকে ফেলে ফেলে ননদের গলা ধরে শুয়ে থাকছে অন্য বিছানায়। ছেলেটার মনে কী হচ্ছে সে এক জানে ঠাকুরবাবা আর তার গর্ভধারিনী মা।—আচ্ছা হায় তো ভাতিজা? সব ভাল তো? দেশে যাওনি? বহু-কাচ্চা-বাচ্চা ভাল তো?

চৌবেজী বলে—এতোয়ারিকে পাঠিয়ে দিও একবার। কথা আছে।

—হাঁ হাঁ। জরুর যাবে। কেন যাবে না? বলে দ্রুত বুড়ি হাতের মাষকলাইয়ের আটা সাফ করে।

—আর পিসি, আমার দিনকাল সুবিধে যাচ্ছেনা গে! এতোয়ারির বিয়ের সময় বাড়তি ত্রিশঠো রূপেয়া দিয়ে বলেছিলুম, ভাদ্রমাসে আউষ উঠলে শোধ দেবে। তাই না গে?

—হাঁ ভাতিজা। সরস্বতী বুড়ির ভাঙা দাঁতের মধ্যে জিভ নড়বড় করে।

—তো এতোয়ারি আজকাল ভালই কামাচ্ছে শুনি! চৌবেজী ঠোঁটের কোণায় হাসে। হাটুয়ার কাছে শুনেছি তো। দুজনে তো হররোজ ছেনিমা দেখছে। টাউনে ঘুরছে। বোলো পিসি! পয়সা না হলে এত্তা রঙবাজী করে না কেউ। করে?

বুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শুধু। জিভটা সমানে নড়বড় করে। কানের বড়বড় রূপোর আংটার গুচ্ছ রোদে ঝিলমিল করে।

—ভেজে দিও বেটাকে। চৌবেজী তাকে শেষ কথা বলে ওঠে।

সরস্বতীর তামাটে কোঁচকানো মুখ। সে এখন বাজপোড়া গাছের গুঁড়ির মতো স্থির। হাঁ,—সে রাতে বারোয়ারিতলায় একটুখানি কথা উঠেছিল বটে। লোকের মুখে আভাষ পেয়েছিল সে। তো বেটাকে কিছু পুছে নি। বরং মনে হয়েছিল, বেশ করেছে এতোয়ারি। ঠিকই করেছে। মরদযোয়ান একটু রঙবাজী করবেনা কেন? এতোয়ারি—সাত চড়ে রা নেই, পেড়কা মাফিক পাথ্থর কা টুকরো এতোয়ারি টাউনবাজ হোক। ফুর্তি করুক। গাঁওবালারা মুখে যাই বলুক, মনে মনে কে না খুশি হবে নিজের-নিজের ছেলেপুলেদের বাবুগিরি দেখে? আর এই এতোয়ারি যদ্দিন থেকে কলাবেড়িয়ার মেয়ের পাশে শুয়েছে, তদ্দিন থেকে শুকিয়ে কালি হচ্ছে না? ডাহিন! ডাইনি মেয়ে! শুষে খাচ্ছে মরদের লোহু। সরস্বতী যদি তার তার বেটার আত্মায় ঢোকার সুযোগ পেত, দেখিয়ে দিত কেমন করে বহুর ডাহিন-পনা খতম করতে হয়। খুব অশ্লীল কথাবার্তা মাথায় এসেছিল বুড়ির। তো বলে কী লাভ? আগের মতো ঝগড়া করার তাকতও নেই। দুচারবার চেঁচালেই বুক ধড়ফড় করে। হাঁপায়। মনে গোপন ইচ্ছে পোষে—পর পর দুবছর যদি আকাশ ভাল বর্ষায়, তো আবার বিয়ে দেবে এতোয়ারির। কলাবেড়িয়ার মঙ্গলের তিন-তিনটে বউ। মঙ্গলও গাঁওয়াল করে খায়। তিন বহু তিনদিকে বেচতে যায়, মঙ্গল যায় বাকি দিকটায়। সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যিখানে চারজনে দেখা সাক্ষাত। কথা বলতে-বলতে গাঁয়ে ঢোকে। সরস্বতী নিজের চোখেই দেখেছে। সতীনে-সতীনে কত ভাব! মঙ্গল খাঁটি মরদ বলেই এমনটা হয়েছে।...

সরস্বতী হিজল গাছের তলায় একা হয়ে গেছে কখন। চৌবেজী চলছে ধনপতির বাড়ি পেরিয়ে। সঙ্গের ভিড়টা কমেছে। মাঠের দিকে পা বাড়ালেই এখন ফ্যাসাদ। ফসলের দশা দেখে চৌবেজীর খুন টগবগ করে ফুটবে—যেন দাদনখোর চাষাংই যত দোষ। আসমান কানা হয়ে গেল তারই পাপে। এই রকম বিদঘুটে নালিশ তুলে চৌবেজী হাতের ছড়ি এদিক ওদিক নাড়বে। চেল্লাচিল্লি করবে। অতএব একা একা দেখতে যাক। ফিরে যখন গাঁয়ে ঢুকবে, তখন গাঁওবালারা কে কোথায় জরুরী কাজে কেটে পড়েছে। মেয়েরা গেছে গঙ্গার ঘাটে! চৌবেজীর সঙ্গে বচসা করার জন্যে গাঁয়ের কুত্তাগুলো রইল —ব্যস!

বাঁধের নীচে দুধারে আমালগোটার ঝোপ। তার মধ্যে দিন দুপুরে অলীক

চাঁদের মতো ঝলমলাচ্ছে পেতলের ঘড়া। চৌবেজী ঘাড় ঘুরিয়ে হেসেছে।
—কৌন রী? নির্মলা?

—হাঁ হাঁ! কানা হয়ে গেল না তো বুঢঢাকা বেটা?

—হয়েছে! হাঁ রী নির্মলা, তোর বর কোথায় গেল?

নির্মলা ভাঁড়ুলে গাছের তলায় এসে কাঁথ থেকে ঘড়া নামায়। চৌবেজীর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে বাঁকা হেসে বলে—বরকে তো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ ঘাটোয়ারি বাবু। কাল থেকে বাড়িই এল না। কে জানে দুসরা বহু জুটিয়ে দিয়েছ নাকি!

—বলিস কী রী! ···চৌবেজী পানজাবির পকেট থকে খৈনীর কৌটো বের করে।—সাহাবাবু থাকতে আমার পছন্দ করা বহু নেবে কেন শরৎ? আজকাল সাহাবাবু ওর মুরুব্বি।

নির্মলা জোরে মাথা দোলায়।

—মুরুব্বি ওর সবাই। টাউনসুদ্ধ।

তামাসা ছেড়ে চৌবেজী বলে—শরৎ থাকবে বলেছিল। তাই এলুম। এখ অব্দি ওর চাঁদমুখ দেখতে পাচ্ছিনে। ঝামেলায় পড়ে গেলুম না?

—কিসের ঝামেলায় গে?

—দাদনী ভুঁইগুলো দেখব, তো আমার কি আর অত মনে আছে? সব ব্যাটা একে-একে কাজের ছলে ভেগে গেল। এখন ভুঁই চেনাবে কে?

নির্মলা মুখ টিপে হাসে।—থামো, থামো। ন্যাকামি কোরোনো নির্মলার সামনে ভুঁই দেখে টাকা দিয়েছ, আর ভুঁই চেনোনা? সব তোমার মুখস্থ ঘাটোয়ারি বাবু!

খৈনি ডলতে-ডলতে ঘাটোয়ারিবাবু চাপা হাসে। হাঁ, শরতের বউ একেবারে মিথ্যে বলেনি। নিষাদবাগের মাঠঘাট—এমনকি সব গাছপালা অব্দি মনের মধ্যে স্পষ্ট গাঁথা আছে চৌবেলালের। কোন ভুঁইয়ের ধারে কোন ঝোপঝাড় কাটা গেলে দূর থেকে দেখেই বলতে পারে—ওখানে একটা সাঁইবাবলার ঝাড় ছিল না? ঠিকই বলেছে শরতের বউ। তবে শরতের হাজির থাকা দরকার ছিল। সে কিনা সুপারিশদার গাঁয়ের।

—নিষাদবাগের হাঁড়ির খবর তোমার জানা গে!

গলা ছেড়ে হাসে চৌবেলাল।—আচ্ছা নির্মলা! বল্‌তো আকাশ কবে বর্ষাবে?

—আমি কি গণক গে? যাও না রঘুয়া ল্যাংড়ার কাছে!

—নির্মলা!

হঠাৎ গলার স্বর শুনে একটু চমকায় নির্মলা। শুধু বলে—উ?

—এতোয়ারির ব্যাপার কী বলতো রী!

—এতোয়ারির ? কী ব্যাপার ? কী করেছে এতোয়ারি ?

—এত্তা ঝড় কাহে রী ? গাছের মতো ঝাঁকুনি খাচ্ছিস কেন ? এতোয়ারি তোর ভালবাসার লোক নাকি ?

নির্মলা রেগে যায়। —তামাসা ছাড়ো জী ! এই সাতসকালে তামাসা ভাল লাগেনা। এতোয়ারি কী করল, তাই বলো। আমার কাজ পড়ে আছে ঘরে।

তাকে জলভরা ঘড়ার দিকে ঝুঁকতে দেখে চৌবেজী বলে—পরশু সন্ধ্যাবেলা আমি টাউনে গিয়েছিলাম। বাগান পাড়ার গলির মধ্যে দেখি ওই হাটুয়া আর এতোয়ারি কুকুরের মতো ঘুর ঘুর করছে। তো আমাকে দেখেই ঝপপট কেটে পড়ল। কাল বিকেলে ঘাটে দেখলুম দুই ব্যাটাকে। ডাকলুম। যেন শুনতেই পেলনা। ভেগে গেল।… …একটু থেমে চাপা গলায় চৌবেজী ফের বলেন—এতোয়ারির বউটা তো দেখতে শুনতে ভালই। কলাবেড়িয়ার মাঝবরের মেয়ে। বিয়ের সময়কার বাড়তি তিরিশ টাকা ধার এখনও শোধ করেনি এতোয়ারি। তাজ্জব রী নির্মলা !

নির্মলা হাঁ করে শুনছিল। হঠাৎ ঘড়াটা তুলে নিয়ে বলে—কে কোথায় কী করেছে-কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জবাব আমি জানি নাকি ? পুছো তো ওদেরই পুছো। জবাব পেয়ে যাবে খোদ। হুঁঃ, বাগানপাড়ায় লোকে কেন যায় তা নিজে বোঝনা ? আমাকে পুছ করছ !

নির্মলা আর ঘুরেও দেখে না চৌবেজীকে। হন হন করে চলে যায় গাঁয়ের দিকে। ভিজে কাপড়ের আওয়াজ কতক্ষণ শোনা যায়। চৌবেজী ভাড়ুলেতলায় দাঁড়িয়ে খৈনি ডলতে ডলতে মনে মনে হাসেন। নিষাদবাগ দেখতে-দেখতে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিনেদিনে। গাঁওবালাদের অনেককেই ল্যাংটো থেকে কাপড় পরতে দেখেছেন। বিয়েশাদী কখন হচ্ছে কার, তাও খবর রেখেছেন। চৌবেলাল ঘাটোয়ারির টাকা না পেলে ঘরে বহু-বহুড়ি আসবে না—আবার ভিন গাঁয়েও যাবে না নিষাদবাগের ছোকরি। কনেপণ আছে বলে কনের বাবা কি স্রেফ হাতপা গুটিয়ে বসে থাকবে ? তারও তো কর্তব্য আছে, মান-ইজ্জত আছে। নৈলে জামাইগাঁয়ের খোঁটা খাবে সারাজীবন। অতএব চৌবেজীর ঘাটের গদীতে গিয়ে পোষা ময়নার বুলি শুনতে-শুনতে তাজ্জব হওয়ার ছলে কথাটা পাড়তেই হয়।

আবার ছেলেপুলে হলেও চৌবেজীর কিরপা আনতে ছোটো। ভারি-ভুরির পুঁজোয় পুরুত খরচা আছে, নতুন কাপড় চোপড় কেনা আছে। মুখিয়ার তহবিলে সিকি আধুলিটা চাঁদা আছে। তবে এরা বরাবর বড় সরল মানুষ ছিল। চৌবেজীর পরিবার থাকলে সারা বছর আনাজপাতি বিনিপয়সায় ভেট পাওয়া যেত। একা

মাহুষ। ভেট গেলে হাতে তুলে না নিয়ে পার নেই। খাতক মানুষ সব। সম্পর্ক বহুকালের। না নিলে মনে দুখ বাজবে। ভয় পাবে। এই রে! বুঝি মহাজন বিগড়ে বসে আছে তার ওপর। তাই কলাটা মূলোটা একটু আধটু রাখতে হয়। ঘাটের মাঝিদের বিলিয়ে দিতে হয় বাড়তি আনাজ ও ফলমূল। এ রেওয়াজ অনেকদিনের। কিন্তু দিনে দিনে সবকিছু বদলে যাচ্ছে যে! নিষাদবাগে প্রতিদ্বন্দ্বী ঢোকার একটা ভয় ইদানীং হয়েছে চৌবেজীর। এতদিনে হয়েছে। সে ওই শরৎ আর ধনপতির বেটা, সূর্যের জন্যে। 'গাঁওমে স্রিফ দো এলেমদার!' নয়নসুখ বলে থাকে। এই দুই এলেমদার নানা জায়গায় ওঠাবসা করে। গদীওলাদের সঙ্গে খুব চেনাজানা মুহব্বৎ হয়েছে। ইচ্ছে করলেই নিষাদবাগে নতুন মহাজন বসাতে পারে বইকি। আর সেই আশঙ্কায় চৌবেলাল ঘাটোয়ারি শরৎকে প্রচুর খাতির করেন। শরৎকে বলেন, তুই আমার ভাই, শরৎ। আমার মায়ের বেটা। ওমাসে পূর্ণিয়া গিয়ে তোর কথা বলতেই বু'ঢ়য়া তক্ষুণি হুকুম জারি করে বলল—ও-বেটাকে না নিয়ে একা বাড়ি এলে তোমার মুখ দেখবনা বনবিহারী! শুনে শরৎ হাসে অবশ্যি। কিন্তু ও বড্ড ঘড়েল পাকা বুদ্ধির লোক।

বনবিহারী চৌবে এদেশে এসে লাল চৌবে অর্থাৎ চৌবেলাল হয়েছেন। লাল মাণিক মণিমুক্তা সাতরাজার ধন। পূর্ণিয়ায় চৌবেকে সবাই বলে বনোয়ারিজী। আর এ খবর পেয়ে শরৎ সেই থেকে ডাকে বনোয়ারিজী বলে।

চৌবে কাঁধ থেকে ছাতা খুলে বাঁধে এগিয়ে যান। মাঝেমাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে নদী বরাবর উত্তর পশ্চিম কোণে নিজের ঘাটটা দেখে নেন। তাজ্জব লাগে। কতদূর অব্দি চলে এসেছেন এখন! হুহু হাওয়া বইছে তোড়ে। পুবের জোরালো হাওয়া শুরু হয়েছে কদিন থেকে। এ হাওয়া ঘুরলেই আকাশ বর্ষাবে। বাঁধবরাবর দুধারে সমানে ঝোপঝাড়। একটু এগিয়ে বাঁয়ে পুবের মাঠটা দেখতে থাকেন। পাটের চারা নেতিয়ে পড়েছে। আর চোখের কোণায় শেয়াকুল ঝোপের পাশে সামনে ঝুঁকে কোন মেয়ে কিছু করছে। দুলে দুলে টানছে লতাপাতা। হাতে লম্বা হেঁসো। আর তার ডাইনে বাঁধের গায়ে বিশাল বিশাল গাবগাছের তলায় একটা সাইকেল পড়ে আছে।

ধনপতির ছেলে সূর্য। চৌবেজী হাঁকেন—সূরযুয়া! হেই!

সূর্য ঘুরে দাঁড়ায়। ছায়ার মধ্যে ওর সাদা দাঁতগুলো চকচক করে ওঠে—চৌবেজী!

—হাঁ বেটা। আচ্ছা তো? কোথেকে আসছ বেটা?

—মহলা থেকে কাকাজী। আপনি আচ্ছা তো?

—নেহী বেটা।······বলে সেই ঝোপটার দিকে ঘোরেন চৌবেজী।—উও কৌন রী ?

কথাটা ঝোপ-কাটুনী মেয়েটিকে বলা। সে মস্তো ঘোমটা টেনে তক্ষুণি আড়ও ঘুরেছে। তার সারা গায়ে রুপোর গয়না ঝলমলাচ্ছে। গায়ের রঙ ফরসা। চমক লাগার কথা। এমন মেয়ে মাঠে গেছে ঝোপঝাড় কাটতে—তার মানে জ্বালানী আনতে ? পর মুহূর্তে চৌবেজী টের পান—আরে বাপ ! এতোয়ারির বহু না ? মাঙ্গবরের মেয়েটা না ? হাঁ রী বেটি, ইয়ে ক্যায়সা ? এ কেমন রী বেটি, এঁ্যা ?

হো হো করে প্রচুর হাসেন ঘাটোয়ারি বাবু। সূর্য দ্রুত বলে—এতোয়ারির বউ জঙ্গল কাটছে দেখে আমারও তাজ্জব লেগেছে, কাকাজী !

—লাগবার কথা বেটা।···অকারণ দরদ দেখিয়ে চৌবেজী আবার বলেন—মাঙ্গবর আমার কথা শোনেনি। শুনলে ওর মেয়েটা সুখে থাকত।

ফুলকলিয়া ঘোমটার ভেতর ফোঁস করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে—হাঁ নিষাদবাগের বউ ছপ্পরখাটে বসে পাঁও নাচাবে। কাজ কাম করে খেতে হবে না তো তাকে ? আর তাই নিয়ে এত্তা বাত কিসের হবে ?

চৌবে ফের জোরালো হাসেন—আ রী বেটি ! শুন শুন। ইধার আ। তোকে এই এট্টুকুন দেখেছিলাম, এখন কেত্তা বড় হয়ে গেছিস। হাঁ রী ! মনে পড়ে না আমার ঘাটের গদীতে বসে মেঠাই খেতিস আর ময়নার সঙ্গে ঝগড়া করতিস ? জানো সুরযুয়া, বড় চটপটে মুখ-বাজ ছিল মাঙ্গবরের এই মেয়ে ! এখনও দেখছি তাই আছে।

ফুলকলিয়া ঝোপের ভেতর থেকে বুনোশিমের মস্তো লতা আবার টানটানি করে যেন এদের দেখিয়েই। আর তক্ষুণি একটা ঢ্যামনা সাপ আঁকাবাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে। মাগে ! বলে আর্তনাদ করে এতোয়ারির বউ লাফ দেয়। গাবগাছের তলায় দুটি পুরুষ হো হো করে হাসে। ফুলকলিয়ার ঘোমটা খসে পিঠে পড়েছে। চুলের ঝাঁপি উপছে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। চুল—নাকি অন্ধকার প্রবাহ, দুধারে দুই পাড়ের মতো উজ্জ্বল বাহু, আর আঁটো রুপোর বাজুদানায় রোদের ঝিলিমিলি বিচ্ছুরণ। নিষাদবাগের মাঠে দিনদুপুরে যেন কী অলৌকিক। আর সাপটা পালাচ্ছে নড়বড় করে। দেখতে দেখতে শুকনো ব্যানার ঝোপে সে লুকিয়ে পড়ে। চৌবেজী বলেন—বাপরে বাপ ! তোর ডরে ভেগে গেল দেখলি তো ? খুব তেজওয়ালী মেয়ে তুই !

ফুলকলিয়া করুণ চোখে লতাটার দিকে তাকায়।

সূর্য ফিসফিস করে বলে—আর সাহস পাচ্ছে না। বুঝলেন কাকাজী ?

—অ। রী বেটি! চ্যামনা সাপ। বিষ নেই একফোঁটাও। ডর করিস না।—চৌবেজী মুখের খৈনিটা ফেলে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ঝোপটার কাছে যান। ঝোপে ছড়ির বাড়ি মারেন বারকতক। তারপর বলেন—ওই একটাই ছিল।

সূর্য বলে—বাঁধের ধারে ঝোপঝাড়ে সাপ আছে অনেক। মাঝেমাঝে প্রায়ই দেখতে পাই। সেদিন রাত্তিরে টর্চ না থাকলে চন্দ্রবোড়ার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিতুম। একটু আগে এতোয়ারির বউকে তাই সাবধান করে দিচ্ছিলুম, আনাড়ী কি না!

বলে সে সাইকেল ওঠায়।—কাকাজী যাই। দেখা হবে পরে।

চৌবেজী ঘুরে বলেন—আরে বাবা, থামো না। যাচ্ছটা কোথায়? এলুম তোমাদের কাছে—তো সবাই দেখছি ভেগে পড়ল। তোমার সাথে দেখা হল তো তুমিও ভেগে যাচ্ছ। কথা বলবটা কার সঙ্গে?

সূর্য হাসে।—তবে চলুন আমাদের বাড়ি। চা খাবেন। মাঠে আর কী দেখবেন? অবস্থা তো টের পাচ্ছেন—সব বরবাদ এবারকার মতো।

চৌবে বলেন—এক মিনিট। তারপর ফুলকলিয়ার কাটা লতাটা টেনে বের করেন।—এই নে বেটি। কিন্তু এ দিয়ে কী হবে? এঁ্যা? তোর শাস এই দিয়ে গলার ফাঁস করে ঝুলবে নাকি?

ফুলকলিয়ার মুখে হাসি ফুটেছে। বড় ভাল মানুষ এই ঘাটোয়ারি বাবু। তার বাবার সঙ্গে কত ভাব, তা তো ভালই জানে। আহা, বাবা যদি এ সময় থাকত, কত খুশি না হত। তবে রাগ করত সন্দেহ নেই। কোন দুঃখে তার মেয়েকে ঝোপঝাড় কাটতে পাঠিয়েছে বেহান? বেহানের সঙ্গে জোর বচসা বাধিয়ে দিত না কি? আলবৎ দিত। এ্যাদ্দিন ছোটিই জ্বালানী কেটে এনেছে। কখনও বুড়ি নিজেই বেরিয়েছে। ছাগল বেঁধে দিয়ে কাছাকাছি ঝোপগুলো কেটেছে। রোদে দুএকদিন পড়ে থেকেছে সেগুলো। তারপর বেটাকে হুকুম করেছে নয়তো নিজেই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেছে বাড়ি। আর কাঁটাঝোপ হলে পেছন-পেছন আসতে হবে ছোটকে। ছোট পথের ধুলোমাটিতে কড়া নজর রেখে হাঁটবে কাঁটা খসে পড়ছে কিনা। কাঁটাগুলো তুলে সে ফেলে দেবে একধারে। এই হল গাঁয়ের রেওয়াজ রাস্তা দিয়ে মানুষ আসছে যাচ্ছে সবসময়। কাঁটা ফুঁড়ে যাবে যে পায়ে! নিষাদবাগের রাস্তায় কাঁটা পড়ে থাকা দেখলে তুমি মুখিয়াই হও বা তার ছেলে হও, তোমাকে তুলে ফেলে দিতেই হবে। না দিলে পাপ। শুধু পাপ নয়। ওই পড়ে-থাকা কাঁটা মনে খচ-খচ করে বিঁধবে তোমারই।…

আজ সকালে উঠে শাস হুকুম করেছিল—জ্বালানী আনতে হবে। গোবরের

চাবড়া দিয়ে পাটকাঠির গোছা আর ঢেলা শুকনো কাঠ অনেক জমানো আছে। সে তো বর্ষার সময়ের জন্য। এখন কয়েকদিন অন্তর সবাই কাঁচা ঝোপঝাড় কেটে বা উপড়ে রাখছে। তাই বলে একজনের কাটা ঝোপ অন্যজন পরের দিন দাবি করে বসবে না। করলে খুব ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাবে অবশ্য! ধনপতিকে আসতে হবে। ধনপতিকে আনা মানেই জরিমানা। ঠাকুরবাবার পৃথিবীতে অঢেল গাছগাছড়া যখন তখন কেন আর ঝুটঝামেলা করতে যাওয়া।

কিন্তু জ্বালানী কি কখনও জীবনে এনেছে মাস্তবরের বেটি? হঠাৎ হুকুমটা শুনে ধরে ফেলেছিল, শাসের আরেক নতুন জুলুম শুরু হল। মনেমনে প্রায় কেঁদে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কাজটা ভাল লেগে যায় ফুলকলিয়ার। ছোটকে ডেকেছিল। ছোটি বলল—চাকিতে মাষকলাই ভাঙতে বসব মায়ের সঙ্গে। মাষকলাইয়ের রুটি হবে এবেলা। পুছো না মাকে। মা গে! ও মা! তেরা বহুকে বাৎলে দে না।

ছোটিও আজকাল কেমন বিগড়েছে! তবে বুড়ির হাতের তলায় হাতের মুঠি দিয়ে চাকির মুঠো ধরে ঘোরানো এবং তার দুই হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে থাকা ফুলকলিয়ার নরকবাস। বুড়ির মুখে খৈনির পচা গন্ধ তো আছেই। তার ওপর লিকলিকে শুকনো ডালের মতো পা সামনে ছড়িয়ে দেবে। সেই পা যদি ফুলকলিয়ার উরুর উপর উঠে যায় তার হুঁশ হবে না। চাকিটাও খুব ছোট। দুধারে দুজন পা ছড়িয়ে বসা মুসকিল। একটু ঝুঁকে-ঝুকে দুলনি দিয়ে ঘোরাতে মাথায়-মাথায় ঠোক্কর লাগবেই। ওধারের মেয়েটি ছোটি হলে সওয়া যায়। ছোটি আবার কমজোর মেয়ে, যে একটুতেই কাহিল হয়ে যায়। কারণ ছোট হলেও চাকিটা খুব ভারি। ঘোড়া-গাধা খচ্চরের পিঠে চাকি চাপিয়ে পাহাড়দেশের চাকিওয়ালারা ইদানীং নিষাদবাগের দিকে আসছেই না। এলে শাস কথা দিয়েছে, হাল্কামতো চাকি কিনবে। ওটা ঘোরাতে তার নিজেরও কষ্ট হয় কি না।...

হুঁ, আজ ছোটি বসেছে মাষকলাই পিষতে। মা আর বেটি হালাক হোক না। ফুলকলিয়া মাঠে একা কতক্ষণ ঘুরবে গায়ে হাওয়া দিয়ে। ছাড়া-পাখির সুখে উড়ে বেড়াবে।

তো খানিক বাদে সাইকেলের ঘন্টি বেজেছিল, আর এতোয়ারির বউ ঘুরেই বুকের রক্ত ছলকে কয়েক মুহূর্ত কাঠ। নিরিবিলি মাঠঘাট জায়গা। গাবগাছের তলায় এসে ধনপতির বেটা থেমে গেল। এতোয়ারির ঘরওলী এখানে কী করছে গে?

মাঠঘাটের খোলামেলায় কী যেন আছে। তুমি লাগামছাড়া—স্রিফ বুনো ঘোড়া, কী পাখি হয়ে যাওনা! কে দেখছে? সরম করেই আর কী ফল? ফুলকলিয়া মন

খুলে দুচার কথা আবোলতাবোল বলেছে। সে রাতের ধাকাধাক্কি নিয়ে হাসাহাসি করতেও বাধেনি। ধনপতির ছেলেকে কেন এত ভাল লেগেছে তার, তাও বলতে দ্বিধা করেনি। কারু সাতে-পাঁচে থাকে না, লেখাপড়া জানে, সবার সঙ্গে ভাব—তাই। তবে কী রকম ভাল লাগা, তা যদি পুছত, ফুলকলিয়া মুসকিলে পড়ে যেত। ও সরল মনেই যা বলার বলেছে। আর তাই শুনে সূর্য উল্টে কেমন মেয়েদের মতো রাঙা হ'য় গেল কেন?

চৌবেজী হেঁকে বসল ঠিক এই সময়। লোকটার আর সময় ছিল না আসার?

ধনপতির বৈঠকখানা বলতে একটা চওড়া দাওয়া। ওপরে খড়ের চাল। চৌপায়ায় বসে চৌবেজী কাঁসার গেলাসে চা খায়। ধনপতি গরুকে খড় কেটে দিতে দিতে উঠে এসে বসেছে। বুকের সাদা লোমে খড়কুটো লেগে আছে। খৈনীটা ভালমতন ডলছে। সূর্য জামা-কাপড় বদলে তাঁতের লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে খুঁটিতে হেলান দিয়ে। নয়নসুখ ট্যাঙস ট্যাঙস করে ঠিকই হাজির হয়েছে। সে দেয়ালে পিঠ রেখে চৌবেজীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছে।

কথাটা তো ভালই। বেটির বিয়ে ভালয়-ভালয় চুকে গেল। এবার বেটার বিয়ের আর দেরী কিসের? সামনে আষাঢ়ে লাগিয়ে দিক না মুখিয়া। ভাল কনে আছে। তার বাবা কিনা চৌবেজীর হাতের বশ। দেখতে চাইলে কালপরশুর মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এইসব কথাবার্তা চলছে।

তবে এমন কথা খুব একটা নতুন নয়! আগেও বলেছে চৌবেজী। সূর্য আসলে উড়িয়ে দেয়। কেন উড়িয়ে দেয় তা সবাই আন্দাজ করে। লেখাপড়া-জানা ছেলের চোখ খুলে গেছে। বাবু-বাড়ির বহু-বহুড়ির মতো মেয়ে এদের। চাঁই কুলে তেমন মেয়ে কি আছে? ধনপতি মহলার সম্পর্কটা ছেড়ে দিয়েছে। অনেক রকম বদনাম শোনা যাচ্ছিল। তো চৌবেজী যখন বলছেন, যাবে।

নয়নসুখ সূর্যের দিকে মুখ টিপে হেসে বলে—জরুর যাবে। সুরযুয়াভি যাবে। নিজের চোখে দেখে আসবে।

সূর্য বলে—কাকাজী, ব্রিজের কথা বলুন। ঘাটের দিকে মাপজোক তো কবে হয়ে গেছে। ডিসট্রিকট ইনজিনিয়ার কী বলল বলছিলেন?

চৌবেজী হাসেন।—আরে বাবা! আগে তোমার ব্রিজটা বানাতে দাও। তবে না।

নয়নসুখ বলে—বিরিজ, কোন বিরিজ?

সূর্য হাসতে থাকে, জবাব দেয়—কাকাজীর ঘাটোয়ারী উঠে যাবে এমন ব্রিজ।

—কাঁহা?

—রাণীর ঘাটমে।

ঘাটোয়ারিজী খৈনী নিতে হাত বাড়ান।—ছোড়ো। আমার ঘাটোয়ারি ওঠায় কে? ত্রিজ হলে অন্য কোথাও হবে। ধনপতিয়াদা? তাহলে কথা বলতে ডেকে পাঠাই।

ধনপতি খুশি হয়ে বলে— হুঁউ।

—পুরণের বেটির জন্যে কত বড়-বড় মোড়ল ঘুরঘুর করছে। অবহেলা কোরোনা।

নয়নসুখ বলে—কৌন পুরণ? কাপাসীর পুরণ মুখিয়া?—

—ধনপতির বাড়ির পিছনের দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ফুলকলিয়া—হাতে হেসো। কখন থেকে কথা শুনছিল। পারলে হেসোর কোপ মারে ঘাটোয়ারির গলায়। হঠাৎ হনহন করে চোখে জল নিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে গঙ্গার ধারে চলে যায় সে।

দৌড়ে বালির চড়া পেরিয়ে জলে হুড়মুড় করে নামে হেসোসুদ্ধ। মুখিয়ার বেটার জন্যে তোমার ঘুম নেই কেন ঘাটোয়ারি বাবু? আসলে মুখিয়ার ওই জোয়ান ছেলেটার—অত সুন্দর চোখওয়ালা ছেলেটার একটা বউ থাকার কথা ভাবাও যায় না। কেন ও গেরস্থর মতো বউয়ের মরদ হবে? ও যে সূর্য!

## ॥ ছয় ॥

ছোটির মুখে খবর পেয়েই ফুলকলিয়া ছোটে। হাতের কাজ ফেলে তার আলুথালু চুল নিয়ে ছোটা দেখে সরবতিয়ার মা কুঁচুলি বুড়িটাও বলে ওঠে—যে গাছের বাকল সেই গাছে লাগাতে যাচ্ছে গে! ভাগীরথীর পাড়ে বাঁধ বরাবর নজর করে এতোয়ারির মা ছাগল খুঁজছে। সে দেখতে পায় বহু লাগামছাড়া টাট্টুর মতো ছুট লাগিয়েছে। তরাসে তার বুক আচানক কেঁপে ওঠে। বেটা এতোয়ারির কিছু মন্দ টন্দ হল নাকি? পরক্ষণেই কে চেঁচিয়ে বলে—লোত্নী (নতুন বউ)! আ রী লোত্নী! অমন করে যাচ্ছিস কোথায়? নদীর চড়ায় নামতে-নামতে এতোয়ারির বউ দেমাক দেখিয়ে তেমনি জোর গলায় ঘোষণা করে—বাবা আসছে রী! বাবা—বাবা আসছে!

সরস্বতী ঠসী-বহরী নয়। কানে চমৎকার শুনতে পায়। আর তক্ষুণি নিজের অজানতে তার ঘোমটা ওঠে যায় শনচুলের মাঝবরাবর। বেয়াই আসছে! মানী লোক কলাবেড়িয়ার মাতব্বর—যার পদবী কিনা মণ্ডল। সেও কিনা ধনপতির মতো সরকার। অগত্যা ছাগল খোঁজা বরবাদ করে সরস্বতীকে বাড়ির দিকে পা চালাতে হল। ওদিকে নদীর পাড়ের নিচে বেমক্কা জমে থাকা বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে ফুল-কলিয়া অপেক্ষা করছে। মুখে ঝলমল করছে খুশির হাসি। ওই হাসি বাবা-দাদাকে

দেখে নিষাদবাগের কোন বহুড়ির মুখে না ফোটে। উত্তর-পশ্চিম দিকে দূরে কলাবেড়িয়ার নীচে জল এখন জাং-ভর বড়জোর। মাস্তবর সেই জল পেরিয়ে মধ্যিখানে চড়ায় উঠতেই দূর থেকে ছোটি দেখতে পেয়েছিল! ফুলকলিয়ার বুক উথাল পাথাল। ওই তার বাবা আসছে! ইচ্ছে করে, বুকের কলজে ফেটে যায় তো যাক—ডুকরে কেঁদেই তার খুশিকে প্রকাশ করে। পারে না বলেই এই হাসি। আর যেন বুকের ভেতর কোন গভীর গাছের ওপর এসে পড়েছে মত্তমাতাল হাওয়া, পাতাগুলো থরথর করে কাঁপে, সে এক আওয়াজ।...

ওপাশে একটু দূরে ঘাটের মেয়েগুলো আর বাচ্চাগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কলাবেড়িয়ার মাস্তবরকে দেখছে। ফুলকলিয়া তা টের পেয়ে আবার নিষাদবাগকে শুনিয়ে শুনিয়ে ঘোষণা করে—হামারী বাবা! বাবা আসছে গে!

তো মাস্তবর আর যাই হোক, রাধার ঘাটের চৌবেলালজী নয় যে গাঁসুদ্ধ হুলস্থুল পড়ে যাবে। একটু পরেই যে-যার কাজে মন দেয়! ছোটিও ছাগল খুঁজতে বাঁধের দিকে যায়। তার কমবয়সী চোখের নজর বরাবর এরকম। আধাক্রোশ দূরের মানুষটিকে ঠাহর করে বলে দেবে কৌন। গাঁয়ের—না, ভিন গাঁয়ের। স্বজাতের—না বেজাতের। ফুলকলিয়া ছোটির প্রতি কৃতজ্ঞ। লুকানো একটা চাঁদির টাকা তার জন্যে খরচ করতে আপত্তি করবে না। চাই কী, তাকে সঙ্গে নিয়েই টাউনে যাবে একদিন।

মাস্তবর নদীর মধ্যিখানের চড়াটা পেরুতে অসম্ভব দেরি করে। তারপর আবার খানিকটা জল। দূরে কোথায় পদ্মার মুখে চড়া। খরার মরশুমে ভাগীরথীকে তাই ভিখারিনী দেখায়—কাজলবরণ শাড়ী ছেঁড়া-খোঁড়া। রূপোলী শরীর জায়গায়-জায়গায় উদোম হয়ে আছে। হাঁটু-জলের ফালিটায় এসে মাস্তবর ডাইনে-বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে কিছু দেখে। তারপর মুখ নামিয়ে জলের তলায় রোদ্দুরের প্রতিফলন, আর কালচে সবুজ শ্যাওলার ঝাঁপির দিকে তাকায়। ফুলকলিয়া ঠোঁট কামড়ে লক্ষ্য করে। এতসব কী দেখছে গো কলাবেড়িয়ার মোড়ল মানুষটা? তারপর মাস্তবর মাথা ঝুঁকিয়ে কুঁজো হয় এবং এবং কী যেন কুড়িয়ে নেয় জলের তলা থেকে। লোকটার স্বভাব বরাবর ওই রকম। রাস্তায় হাঁটতে একশোবার দাঁড়াবে—এদিক ওদিক কী দেখবে, কাগজের টুকরো হোক কিংবা এক-চিলতে ফসলের শীষ হোক, কুড়িয়ে সযত্নে হাতে নেবে। কাঠকুটো হলে তো কথাই নেই। ঠাকুর- বাবার দুনিয়ায় ফেলনা সবকিছুই ওর কাছে কুড়িয়ে রাখার ধন। ফুলকলিয়ার ধৈর্য্য টুটে যায়। মাস্তবর যেন বেটির ধৈর্য পরীক্ষা করতে করতে আসছে। ফুলকলিয়া চেরা গলায় না ডেকে পারে না—বাবা! ও বাবা!

এ তার অস্তিত্ব ঘোষণা। যেন মাস্তবর মেয়েকে দেখতেই পাচ্ছে না তাই। বড় অভিমান এই ডাকে। এ ডাক দুনিয়ার তাবৎ শ্বশুরঘরবাসিনী অবমানিতা তরুণী বহুড়ীর গলা ছাড়া আর কোথাও শোনা যাবেনা। এ ডাকে হারিয়ে ফিরে পাবার খুশি আছে—আশ্রয়ের জন্ম প্রার্থনা আছে: অহসনীয় দুঃখের খবর ঘোষণা আছে। স্মৃতির জন্ম হাহাকার আছে। ফুলকলিয়ার সব হাসি, ব্যাকুলতা আর প্রতীক্ষা দ্রুত একাকার হয়ে অলীক প্রবাহে ভরে দেয় শুকনো ভাগীরথী। ফুলকলিয়ার চোখের জলে ভরা নদী টলটল ছলছল উথাল পাথাল উত্তরঙ্গ। —বাবা গে! এক গোপন নির্জন সঞ্চিত কান্না দমকে দমকে বেরিয়ে আসে।—বাবা গে!

আর মাস্তবর এতক্ষণে যেন দেখতে পায়। হাত তুলে সাড়া দেয়—বেটিয়া! দহের ঘাট থেকে সবাই দৃশ্যটা দেখে। বুধিনী সুধিনী বোবা-কালা যমজ বোনও ফুলো গাল আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে। বহুৎ ছোকড়ির বিভা হয়েছে নিষাদবাগে—স্বামীর ঘর করতে করতে বুড়ি হয়ে গেল, এমন তো কেউ করেনি। নদীর চড়ায় বাপ-বেটি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়া বাকল গাছের গায়ে যেন সেঁটে গেছে। বাঁকা হেসে দার্শনিক নয়নসুখের বিধবা মেয়ে অঞ্চলা বলে—ঢঙ! আমাদের যেন ভিন গাঁয়ে বিভা হয়নি! আমরা যেন কেউ স্বামীর ঘর করিনি! আর সরবতিয়ার মতো কিশোরীও বলতে থাকে—কলাবেড়িয়ার মোড়ল ভাবরে নিষাদবাগওলা জুলুম বাজ। বলবেনা রী অঞ্চলাদিদি? তা তো বলবেই। অঞ্চলা কাপড় কাচে পিঁড়িতে। তালে তালে বলে—এতোয়ারিদা আজ অব্দি একবার ভুলেও গায়ে হাত তোলেনি। বহুর দিকে অমন টান কোন মরদের থাকে রী? আর বহু কি না আলাদা বিছানায় শোয়। তোরা জানিস সে কথা? কেউ জানে না। সবাই অবাক। এ তো বড় শরমের কথা! বহু মরদের সঙ্গে শোয় না তো কাচ্চাবাচ্চা হবে কী করে? কাচ্চাবাচ্চা না হলে ভারি ভুরির শাপ লাগবে না? হয়তো লেগেছে। আসমান তাই বর্ষাচ্ছেনা। সবজিখন্দ ধানপাট শুকিয়ে যাচ্ছে। পবন দেওতা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। সুরয দেওতা দিনকে দিন রেগে যাচ্ছে। ল্যাংড়া রঘুয়া ভরের সময় নাকি বলেছে, পাপ এসেছে নদীর পচ্ছিম পাড় থেকে। কলাবেড়িয়া নদীর পচ্ছিম পাড়েই তো! উত্তর-পচ্ছিম মানেই পচ্ছিম পাড়! এ হিসেব অঞ্চলার।

এই সময় শরতের বউ নির্মলা এসে বলে—ক্যা রী! সব মুখ গোমড়া করে ভাম বিল্লির মতো কী বুকনি ঝাড়ছিস?

অঞ্চলা বাঁকা হেসে চোখের ইশারায় ব্যাপারটা দেখিয়ে দেয়। নির্মলা বলে—বাপের এক বেটি। দুখ বাজবেনা? বুড়ো বয়সে লোকটা হাত পুড়িয়ে খাচ্ছে।

জর-জারি হলে মাথা টিপবে কে? হঠাৎ ভালমন্দ হলে পয়সাকড়ি লুঠে নেবে না গাওবালারা? এক বেটি যার, সে বোঝে—আর বোঝে ওই বেটি। যেমন আমি। করলহাটি আর কলাবেড়িয়ার একহি দুখ—এ দুখ বুঝবে নিষাদবাগের কোন মানুষ গে?…

ওখানে মেয়ের কাঁধ পাকড়ে বাবা হাঁটে। ফুলকলিয়া টের পায়, খুব শিগগির তার বাবা বুড়ো হয়ে গেছে যেন। পাড়টুকু উঠতে দম আটকে যাচ্ছে। আর মুখটাও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল ক্রমশঃ। কালকাসুন্দে নিশিন্দা ঝোপের মধ্যে ফালি রাস্তায় গিয়ে সে বলে—জামাই আছে রী ফুলি?

—নেই। বিহানেই তো গাঁওয়ালে যায়।

—হুঁ! …মান্তবর বাকি পথটুকু আর কথা বলে না। বাড়ির উঠোনে বেয়ান দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি। অগত্যা মান্তবরও হাসে।

ফুলকলিয়া কিছু তাজ্জব হয়ে শাশুড়ির হাসি দেখল। শাশুড়িকে কখনও কি হাসতে দেখেছে? হয়তো দেখেছে—লক্ষ্য করেনি। তবে হাসিটা সত্যি তাজ্জব করছে। বেয়াইকে যেন বরণ করার জন্যে সরস্বতী তৈরি। অথচ এর আগেও মান্তবর বার দুই এসেছে। মেয়েকে দেখতে। সরস্বতী কাজ ফেলে এমন করে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়নি। হাঁ—ফুলকলিয়া বুঝেছে। তাকে পিটি দিয়েছিল—পয়সাওলা লোকের বেটির ওপর জুলুম করেছিল, পাছে বাবার কানে তোলে। শাশুড়ি সেই ভয়েই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হাসিটি হাসছে এবং মান্তবরকে খাতির দেখাচ্ছে। ফুলকলিয়া তাই বলে কিছু চেপে রাখবে না। বাবার কানে তুলবেই।

—সুরয পশ্চিম থেকে এল গে বহু! বহুর দিকেই সরস্বতী হাসিমুখে কথাটা ডাক করে। এটাই নিয়ম। সরাসরি বেয়াইয়ের সঙ্গে কথা বলার আগে—এই হল কি না ভূমিকা।

মান্তবরও সেই নিয়ম মেনে বলে—নেহী রী বেটিয়া। সুরয নেহি। হামি কাওয়া। কাওয়া সব দিক থেকেই আসে ডাকতে ডাকতে। ‥মান্তবর একটু হাসে।

কাওয়া—কাক। এই উপমাটা সন্দেহজনক। সরস্বতী তবু হাসে।—বহুই বলুক, কাওয়া কভি কভি সুখ ডাক ডাকে।

সে পাটকাঠির বেড়া ছেড়ে উঠোনে যায়। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের ভঙ্গীতে ফের বলে—বহু, বাবাকে বসতে দাও।

তা আর বলতে? ফুলকলিয়া ঘরে ঢুকে চৌপায়া বের করে। এতোয়ারি শ্বশুর এসে বসবে বলে এই চৌপায়াটা তৈরি করেছিল। বাবুইদড়ির বুনুনিতে লালনীল নক্সা

তুলে দিতে বলেছিল বউকে। মান্তবর দাওয়ার চালের ঠোক্কর থেকে মাথা বাঁচাতে কুঁজো হয়। তারপর চৌপায়ায় বসে বলে—বেয়ানের খবর ভাল তো ?

—আমার আর ভাল বেয়াই! বটতলার ডাক শুনতে শুনতে দিন কাটাচ্ছি। বেয়াইয়ের খবর ভাল কি না, তাই শুনি। সরস্বতী একটু তফাতে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল।

ফুলকলিয়া ঠোঁটে আঁচল কামড়ে চৌকাঠে হেলান দিয়েছে। মান্তবর বলে—আঁচল কামড়াতে নেই, বেটি।

হুঁ, বাবার এই অভ্যাস বরাবর। ফুলকলিয়া অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে আঁচল ঠিকঠাক করে। সরস্বতী শান্তভাবে বলে—বহু! বাবাকে পা ধোবার জল দাও। আর ছোটী কোথায় গেল, দেখ।

থাক। মান্তবর হাত তোলে। তারপর রসিকতা করে। —গাঁওয়ালে এক মজার কথা আছে। 'এস কুটুম বসো খাটে, পা ধোওগে ডোবার ঘাটে!' আমি গঙ্গায় পা ধুয়ে এসেছি বেয়ান! ফুলি, চুপসে বৈঠ্ মা।

সরস্বতী বুড়ি হেসে ওঠে। ফুলকলিয়াও হাসে। হঠাৎ তার মনে হয়, শাশুড়িকে যতটা খারাপ মেয়ে ভেবেছে, হয়তো ততটা খারাপ নয়। আসলে হয়তো তার নিজেরই কিছু দোষ-ঘাট আছে। শাশুড়ির সঙ্গে বাবার এরকম একটা বোঝাপড়া দেখে নিজের ওপর দুঃখিত হওয়া ছাড়া উপায় কি ? এখন যদি শাশুড়ি তার নামে বাবাকে লাগায়, ফুলকলিয়া অপ্রস্তুত হবে ঠিকই—কিন্তু মুখটি খুলবেনা। এমনকি, ভেবেছিল বাবাকে ফেরার পথে এগিয়ে দিতে যখন ঘাটঅব্দি যাবে, তখন মারখাওয়ার কথাটা তুলবে—তাও মন থেকে মুছে দেয়। নালিশ তুলে হবেটা কী ? সে তো আজেবাজে ঘরের মেয়ে নয়, তার বাবা নয়ানসুখের মতো কোন সরকারজীর ডাকের লোকও নয়, যে বেটিকে আর স্বামীর ভাত খেতে দেবেনা। ওসব কেলেঙ্কারী বড় ঘরে বড় একটা শোনা যায় না। ছি ছি, দেশ জুড়ে টি টি পড়ে যাবে! ফুলকলিয়া শাশুড়িকে ক্ষমা করে দেয়। বাবার জন্য পা ধোবার জল আনতে বলেছে, আর কী চাই ? তবে একটু চা-পানি খেতে বলাও তো চাই। মানী বেয়াইকে আর কীভাবে খাতির করে, দেখতে ফুলকলিয়া উৎসুক হয়। শাশুড়ির মুখের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে। মেঠাই না খেতে বলুক অন্তত এক গেলাস চা। এতোয়ারি আজকাল দুবেলা চা খাচ্ছে এবং বাড়িতে চায়ের কারবারটা আছে, এটা বাবাকে জানাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেয়াই-বেয়ান এখন কী যে সব বাৎ-চিত জুড়ে দিয়েছে। ক্ষেত খামারের কথা, আসমান কানা হবার কথা, মহুলার হাটে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই কথা......

—বেয়াই এবারে ছোটির জন্যে বর দেখুক। সামনের ছটপরবে ছোটি গায়ে উল্কি চড়াবে। দেখতে-দেখতে যবের শীষের মতো লকলক করে উঠল মেয়েটা। এতোয়ারি ন'হেতে ডুরে শাড়ি এনে দিল সেদিন। পরল যখন, চোখে তাকানো যায় না। এ পোড়া চোখে কেত্তা বড় কেত্তা জওয়ানী লাগে জী!

—হাঁ জী। আজকাল ওই হয়েছে। ছোকড়া-ছোকড়ি সব দেখতে দেখতে ঝটঝট বেড়ে যাচ্ছে। তো খোঁজখবর করে দেখি।

—তুমি বড়া আদমী বেয়াইজী। সব ভুলে যাবে বিলকুল। সরস্বতীয়া হাসে। ঘোমটা আরও টেনে দেয়। —বহু। কাওয়া তাড়িয়ে দে গে।

এতোয়ারি সেদিন কোত্থেকে সরু ধান এনেছে সের পনের। সরু চালের ভাত খাবে। ওর সাধ আহ্লাদ দিনে দিনে বাড়ছে। জেরা টাউবাজ ভি হয়েছে। তার মা ইতিমধ্যে এ কথাও জানিয়েছে বেয়াইকে।

ফুলকলিয়া কাক তাড়ায়। কাকে ধান খাক, না খাক তবু শাশুড়ির হুকুম। ফুলকলিয়া বাবার সামনে নিজের সংসার পাওয়া এবং সেই সংসারকে ভালবাসার নমুনা দেখাতে চায়। উঠোনময় ঘুরে এটা নাড়ে, ওটা সরায়, রান্নাশালে যায়। আবার ফিরে গিয়ে দাওয়ায় উঠে। চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়। কেমন চেয়েছিল, কেমন বদলে গেল মনটা ক্রমশ। নিজেকে সে অত বোঝেনা। শুধু আবছা মনে হয়—কী হবে ঝকমারির? সব বাবাই মেয়েকে সুখে থাকা দেখতে চায়। না দেখালে বাবার মনে কষ্ট হবে যে।

মাস্তবর এই গম্ভীর, এই হাসিমুখ। বরাবর এই রকম।—ছোটির জন্যে কিছু আনা হলনা। দোষ নিওনা বেয়ান। হঠাৎ চলে এলুম আর কী। তো জামাই—

সরস্বতী বলে—কী?

—জামাইকে কাল দেখলাম টাউনে সন্ধ্যেবেলা। আমাকে দেখল কী না বলতে পারি না। সাহাবাবুর আড়তে গেলুম, তো উনি নেই। বলল. রাতের গাড়িতে কলকাত্তা চলে যাবেন। এদিকে মুশকিল, দেড়মণ খ্যাসারি দিয়েছিলুম। টাকাটা নিইনি তখন।

সরস্বতী আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলে—হাঁ। অনেকগুলো টাকা!

—সাহাবাবুর সঙ্গে অনেক কালের কারবার! মাস্তবর কথাটা গলা একটু চাপা করে।…হাঁ গে বেয়ান, জামাইয়ের সঙ্গে গাঁওয়াল করে, ওই ছোকড়াটা কে?

সরস্বতী আর ফুলকলিয়া দুজনেই ভাবে, এই রে! কলাবেড়িয়ার মোড়লকে কেউ মেয়ের জন্যে বর ঢুড়তে বলেছে! দুজনেই তাই শব্দ করে হাসে। ফুলকলিয়া হাসি

ঢাকতে মুখে আঁচল চাঁপা দেয় এবং বলে—হাটুয়া? নিষাদবাগওলা ওকে তামাসা করে বলে—গড়নটা পিটিয়ে ঠিকঠাক করে আয়, তবে বিভা হবে।

আর সরস্বতী বলে—নয়ানসুখের ভাগ্নে! ছোড়ো জী! ও বিভা করবে কী দিয়ে?

নয়ানসুখের ঘরে তিন এত্তাএত্তা ছোকড়ি। অঞ্জলা যার নাম, সে বিধবা। চঞ্চলা সঞ্জলার জন্যে বর পছন্দ হচ্ছেনা—নাকি সরকারজী বলেছে বুঝেশুঝে ভাল ঘরে পাঠাব। আমার ওপর ছেড়ে দে। এখন হাটুয়া—নয়ানসুখের ভাগ্নে—তার বিভার পয়সাকড়ি আগে ওই দুই ক্ষেত কুড়িয়ে ঘরে আনুক বেয়াই!

সঙ্গে ফুলকলিয়া টিপ্পনি কাটে—অঞ্জলা তো ভকতরামকে স্যাঙা করবে।

মাস্তবর বলে—কোন ভকতরাম?

—সেই যে চানা ডালমুট বেচে বেচে বেড়ায় গাঁওয়ালে।

—হাঁ, হাঁ। ভালই তো।

বিরক্ত সরস্বতী বলে—লেকিন ও তো ভিনজাত আছে জী! 'মুসহর' না 'দাহিলা' নাকি 'গোঁও।'

হাঁ। তা ভি আছে।···বলে মাস্তবর কিছু ভাবতে থাকে। ভাবনার মধ্যেই সে ছিটের ফতুয়ার পকেট থেকে খৈনি বের করে এতক্ষণে। আপন মনে বলে—টাউনবাজরা আজকাল জাত মানছেনা।

ফুলকলিয়া ভাবে, তাই যেন এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বাবা কী একটা করছে না। খৈনি ডলতে দেখে তার এখন কী যেন ভাল লাগে। এসময় যদি হুট করে বুড়ির বেটাটাএসে পড়ত—বেশ হত। সে এলে নিশ্চয় শ্বশুরের জন্যে চা-পানির ফরমাস দিত। ···উঁহু, ফরমাস সে দিত না। চা তৈরি কারু হাতে পছন্দ নয় তার। নিজেই বানাতে বসত। আর হয়তো শ্বশুরকে একটা সিগারেটও দু' হাত জোড় করে তার মধ্যে রেখে এগিয়ে দিত। জামাই আজ-কাল সিগারেট খায় শ্বশুর কি জানে? ফুল-কলিয়ার মনটা আসলে সরল—নিজেও টের পায়, তাই না এসব ভাবে? অযেয়েন্স হলে ভাবত? মনে-মনে বলে শাশুড়িকে তেরা বহু বড়ী ঘরকি লড়কী। সমঝালিনা এখনও? টের পাচ্ছিস গো তোর বউ-মা কী সব ভাবছে এখন? শাসবুড়ির প্রতি অনুকম্পা ও করুণার দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ফুলকলিয়া! আহা বেচারী! বড় ঘরের বেটিদের মন কেমন হয়, ওর তো বোঝার সুযোগ নেই।······

ওদিকে সরস্বতী হাটুয়ার কথা তুলে বেয়াইকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বেয়াই চুপচাপ খৈনি ডলছে আর ডলছে। শেষে আরও বিরক্ত হয়ে ঘোরে বউমার দিকে।—বহু গে! দরজায় গিয়ে ছোটাকে দেখ তো বেটি! ডেকে বল কাম আছে। তাই বলে রাস্তায় ঘুরতে যেওনা যেন।···

ফুলকলিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো প্রায় দৌড়ে নামে। পাটকাঠির বেড়ার ওপাশে গিয়ে গলা ছেড়ে ডাকবে কি না ভাবে। গাঁয়ের বউ, এ কথাটা এখন তীব্র হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। মুখিয়াজীর বটতলার ওপাশে বাঁধে ছোটি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে রামলালের শুকনো লকড়ি ভাঙ্গা দেখছে। ওই এক লোক নিষাদবাগে। আস্ত হনুমান। আগে নাকি হনুমানের উৎপাতে নিষাদবাগ তটস্থ থাকত। এই রামলালই ল্যাংড়া রঘুয়ার কাছে কী মন্তর-তন্তর পেয়ে গেল। হনুমানের দল এলে তাকে দেখেই ভেগে যায়। শেষঅব্দি ভেগেই গেল। রামলাল গাছ তলায় গিয়ে দু'হাঁটুতে হাত রেখে মুখ কাত করে ওপর দিকে তাকাত নাকি। তারপর বলত—কাঁহা গে ? আর ব্যস। লেজ তুলে প্রভু রামচন্দ্রজীর চেলারা ভেগে যেত।

হু, ছোটি সেই মজাই দেখছে। রামলাল গাছে চড়ে লাকড়ি ভাঙলে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে চ্যাচায়।—একবার হনুমান সাজো না রামুয়া কাকা! ও কাকা! কাকা গে!

ফুলকলিয়ার সামনে দিয়ে অঞ্জলা গেল কার বাড়ি থেকে ঘুঁটেতে আগুন নিয়ে। ফুলকলিয়া তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। অঞ্জলা বাঁ হাতের তালুতে ঘুঁটে নিয়েছে। ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। ছাতিমতলায় শনের দড়ি পাকাতে পাকাতে ভরত হুশিয়ারী দেয়। অঞ্জলা যেন দেবতাকে ধুনো দিচ্ছে, এমনি ভঙ্গী করে হাত চিতিয়ে এগোচ্ছে। নাক কুঁচকে চোখ পিটপিট করে ঠোঁটে বাঁকা হাসি রেখে এবং যথারীতি একটা স্তন উদোম করে বাড়ি ঢুকতেই ফুলকলিয়া বলে ওঠে—বেশরম! বাগান-পাড়ার কুত্তীন! খরার রোদে সব শুকনো খটখটে। দুপুর হতে না হতে লু হাওয়া উঠছে। আগুন ধরে গেলে নিষাদবাগ পলকে ছাই হবে না? ধুমসি মেয়েটার আক্কেলটা দেখছ? যত পিগগির রামভকতের ঝোপড়িতে গিয়ে ঢোকে, তত মঙ্গল। বাবা সেটা বোঝে বলেই তো জাতের কথার আমল দিল না।

—ও গে ভারতীর মা! ও রী দিদি। জেরা ছোটিকো বোলা দে না রী! বলবি কলাবেড়িয়ার গুনবাবা এসেছে, তাহলে এক্ষুণি এসে যাবে।

ভারতীর মা খুশি হয়েছে ফুলকলিয়ার বাবা এসেছে শুনে।—কখন এল রী? খবর ভাল তো বহিন? তারপরই সে যথারীতি রসিকতা করে! কী করে এল রী ফুলিবউ? ধন-ধান লুঠ হয়ে যাবে না? কই, দেখি আমার মোড়লের বেটাকে!

ভারতীর মা ওদিকে যাবে কী, ফুলকলিয়ার পাশ দিয়ে বাড়ি ঢোকে। খুব রসিক মেয়ে। পরকে আপন করতে জুড়ি নেই। তবে সেটার চেয়ে গোপন কথা: গাঁয়ের বহু-বহুড়ীর গোপন সম্পদের জিম্মাদার সে। এক কাঠা চাল কিংবা খন্দ, হয়তো দুআনা এক আনা পয়সা হাতিয়ে বউগুলো ওর কাছে জিম্মা দেবে। তা নিয়ে

ঝামেলাও কম হয় না অবশ্য। আগে থেকে বলে রাখলে ছলছুতো করে ভারতীর মা বাড়ি আসবে ঠিকঠিক সময়ে। রুমালটি বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলতে ওর জুড়ি নেই। ফুলকলিয়া তাই বলে ওকে কিছু জিম্মা দিতে যাচ্ছে না। বাবা পয়সাওলা যার—তার মান চলে যাবে না?…

আর একটু দাঁড়িয়ে ছোটির জন্যে অপেক্ষা করে। তাঁরপর বিরক্তি ধরে যায়। তার ওপর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই রাস্তায় যারা যাচ্ছে, তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কী করছিস রী বহু? ছোটীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তোর বাবা এসেছে শুনলাম? হ্যাঁ। কেউ এসে গয়না টিপেও দেখতে ছাড়ে না। ওজন কত ভরি, কোথায় বানিয়েছে সে নিয়েও বাৎচিৎ হচ্ছে। অতএব ফুলকলিয়া বাড়ি ঢোকে। …ছোটি আসবেনা গে মা! হনুমানের খেলা দেখছে। বলে সে দাওয়ার দিকে এগিয়েই অবাক হয়। শাশুড়ির গলার স্বর বদলে গেছে। বাবার মুখটাও খুব গম্ভীর। ভারতীর মাকে সরস্বতী ধমক দেয় সেইসময়—কী শুনছিস গে? আপনা কাম কর গিয়ে। ভারতীর মা ঠোঁট উল্টে হাত নাড়া দিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল।

তারপর বুড়ি ভাঙ্গাগলায় বলে—তুমি ঝুঠমুট বেটাকে দোষ দিচ্ছ বেয়াই। বিলকুল ঝুট। টাউন জায়গা। কাকে দেখতে কাকে দেখছ। হায় ঠাকুরবাবা। হায় ভগবান, আমার বেটা সিধাসাদা মানুষ। পাথরের মতো, গাছের মতো চুপচাপ থাকা ছেলে। ক্ষিদে পেলে ভি বলবে না, মা গে, ক্ষিদে পেয়েছে। এখনও ভি কাছে শুলে মায়ের গলা ধরে শোবে। তবে হাঁ, জেরা টাউনবাজ হয়েছে আজকাল। পয়সা কড়ি যে কামাবে, সেই টাউনবাজ হবে। ভাল জামাকাপড় পরবে, ছেনিমাবাজী দেখবে, চা-পানি ভি পিবে। সিগারেট ভি ফুঁকবে।

মাস্তবর খৈনী ফেলে দেয় মুখ থেকে। থু থু ফেলে দাওয়ার নিচে। তারপর মাথা নেড়ে বলে—দেখ বেয়ান! আমি তোমার বেটার হাতে মেয়েকে দিয়েছিলাম—কেন? না, পছন্দ হয়েছিল। কেন পছন্দ হয়েছিল, না দেখন-সুরত ছেলে পাঁচটার একটা। বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল। হুঁসিয়ার। হিসেবী। কারু সাতেপাঁচে থাকে না। কোন ঝুটঝামেলায় নেই। পয়সা নেই বা কম আছে, তাতে কী? মাস্তবর মেয়ে বেচে খেতে চায়নি। নয়তো তার বেটিকে বিয়ে করতে মা গঙ্গার দক্ষিণে ওই কাটোয়া টাউন থেকে উত্তরে জঙ্গীপুর টাউন পর্যন্ত যত স্বজাতের বড় বড় ঘরের ছেলে আছে, একদম লাইন ভি লেগে যেত। তো আমি তা চাইনি। এতোয়ারিকে বরাবর আমার পছন্দ ছিল। এসব কথা কখনও বলার ফুরসৎ পাইনি বেয়ান, এখন বলছি। আমার মনে না ধরলে তুমি কখনো ভেব না যে আমি তোমার ঘরে বেটি দিতাম! আরে ভাই! তারপর থেকে যার সঙ্গে সঙ্গে দেখা, সেই বলে—মোড়লজী

এ কি করলে? হ্যাঁ সব্বাই বলে। নিবাদবাগের লোকও বলেছিল। জানতে না বিয়ান, জেনে রাখো। তোমার গাঁওবালা ভি বারণ করেছিল। শুনিনি।…

মাস্তবর দম নিতে একটু থামে। সরস্বতীর দৃষ্টি নিষ্পলক। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। জিভটা ভেতরে নড়ছে। ঘোলাটে চোখ, তোবড়ানো মুখ, গাছের বাকলের মতো খসখসে ভাঁজপড়া দুই হাত—বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। আর আকাশ গনগনে নীল—যেন ঘোর স্তব্ধতার ওই চেহারা। বাতাসও বন্ধ। পাটকাঠির বেড়ার ওপরে চড়ুইয়ের ঝাঁক চ্যাঁচামেচি করছিল। পালিয়ে গেছে কখন। শুধু ওপাশের পাকা আমের গাছে ঝিঁ ঝিঁ পোকাটা বিকট স্বরে করাতের মতো স্তব্ধতা চিরে ফেলেছে। তারপর গঙ্গার ধারে হয়তো শিমূলগাছ থেকে ভেসে এল ফটিকজলের ডাক। ফ-টি-ক্ জ-ল! ফ-টি-ক জ-ল!

—কেন শুনিনি? না—ছেলে আমার পছন্দ। গাঁওয়াল করে বেড়াচ্ছে মাস্তবরের জামাই—লোকে টিপ্পনি কাটে। বাঃ রে বাঃ! পিঁপড়ে ভি বসে খায়না জামাই বসে খাবে কেন? চোট্টামি ফেরেববাজী করে না। দালালী করে না। গতর খাটিয়ে খায়। আমার এই পছন্দ। কেন? না—আমার ঘরে ওই একহি বাত্তি। আরে ভাই! আর কে পাবে আমার ক্ষেতি-ভুঁই ঘরবাড়ী গরু-বাছুর? আরে! আর কদিন বাদেই তো ওসবের মালিক হবে এতোয়ারি।

সরস্বতী কিছু বলবে যেন। কিন্তু বলে না। হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ওঠে। ফুলকলিয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। মাস্তবর গ্রাহ্য করে না।

—এয়াসেই ভাবছিলাম, এসে ওদের নিয়ে যাব। পরে ভাবলাম, বেয়ানের বুড়ো বয়সে কষ্ট হবে। তার ওপর ছোটার বিভা দিতে হবে। হাঁ বেয়ান, এইসব সাধ আমার ছিল।

সরস্বতী চোখ মুছে বলে—হাঁ। গাঁওবালা ভি তাই বলে। এতোয়ারিকে তামাসা করে। তো এতোয়ারি বলে নিবাদবাগ ছেড়ে কোথাও যাব না। বেয়াই, বেটার আমার সে সব লোভ নাই। তা থাকলে এ্যাদ্দিন তোমার কাছ-লাগড়া হয়ে ঘুরত। বলো? সেই আটমঙ্গলার পর কবার গেছে তোমার বাড়ি? হা ভগবান! বেটাকে আজ তুমি বদনাম দিতে এলে? কী মতলবে এলে গে? কী তোমার মনে আছে গে? বেটিকে ভাত খাওয়াবে না? ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বড়ঘরে স্যাঙা দেবে? কেউ লোভ দেখিয়েছে?

হ্যাঁ—সরস্বতী জেগেছে। সেই কুঁদুলী দজ্জাল মেয়ের ঘুম এবার আচানক ভেঙেছে। ফুলকলিয়া বিব্রত বোধ করে। আর বেয়ানের এই স্বর বদলানো এবং তেজ দেখে এবার মাস্তবর থ। হাঁ করে তাকায়।

সরস্বতী হাউমাউ করে ওঠে রাক্ষসীর মতো।—আমার বেটাকে তুমি বাগান-পাড়ার গলিতে দেখেছ? আমার বেটা বেশ্যার ঘরে যায়? বেয়াই! পয়সাকড়ি না থাক, এতোয়ারি কার বেটা মনে সমঝে নিও একবার। মা গে, মাগে! হঠাৎ সে কপাল চাপড়ায়। চেরা গলায় বলতে থাকে—এতোয়ারি যদি এ বাত শোনে কী হবে গে—পাথর ফেটে আগুন গিরবে গে! খুনখারাবি হয়ে যাবে গে! গঙ্গামে বান ছুটবে গে!

সুর ধরে আওড়ায় সরস্বতী। মাস্তবর অস্ফুট গর্জায়—বেয়ান! হুঁস রেখে বলো।

সরস্বতী ঘোরে ফুলকলিয়ার দিকে। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে চ্যাঁচায়—ওই জানের বেটিকে পুছ করো আগে। কেন তোমার বেটি আমার বেটার পাশে শুতে যায় না? সনঝেবেলায় ছোটীর গলা ধরে থাকে তো থাকেই—আয় রী ছোটি আয়। কেন? পুছ করো জানের বেটীকে। কেন মুখিয়ার বেটার গায়ে ধাক্কা লাগায়—রাতবিরেতে বাঁধের ধারে জঙ্গলে গড়াগড়ি খেতে এত সাধ—কেন পাড়ার বহুবেটিকে বলে বেড়ায়—মুখিয়ার বেটার যেখানে বিভা লাগাবে, আমি ভাংচি দেব…আমি ভাংচি দেব…আমি ভাংচি দেব…

সরস্বতীর এবার নাচ শুরু হল। হাততালি দিয়ে বারবার বহুর কথাটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলে। মাস্তবর মানী লোক। এত অবাক হয়েছে যে কী করবে ভেবে পায় না। উঠে পড়ে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে বেয়ান মুখে ফেনা তুলে বলে—তুমি না মোড়ল? তুমি না কলাবেড়িয়ার মুখিয়া সরকার জী? বেটির বিচার করে যাও। আমার বেটা যদি খানকিপাড়া গিয়েই থাকে, কেন যায়—কোন দুঃখে পুছো সুরতওয়ালীকে! এই বড় ঘরের বেটি! বল—বাবার সামনে বল এবার!

মাস্তবর যেতে-যেতে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড়ায়। ফুলকলিয়ার দিকে ঘোরে। ফুলকলিয়া চৌকাঠে মাথা রেখে হু হু করে কাঁদছে।

মাস্তবর কিছু ভাবে। ঠোঁট কামড়ায়। সরস্বতী সমানে চেঁচাচ্ছে। এখন অনেকটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার কথাগুলো। গলা ভেঙে গেছে। বুড়ো আঙুল নেড়ে হাঁসফাঁস করে কিছু বলছে—হয়তো বলছে: এতোয়ারি কাঁধে ভার নিয়ে সারাজীবন ঘুরবে গাঁওয়ালে, তবু তোমার মতো বখিল লোকের পায়ের তলায় থাকতে যাবে না। দুনিয়াসুদ্ধ দেখছে এ্যাদ্দিন জামাইকে কখানা জামা দিয়েছ—কখানা ধুতি দিয়েছ—জুতো দিয়েছ। ভুলেও তো হাতে একটু মিঠাই আনোনা এ বাড়ি। মেয়ের নাম করেও লোকে তা আনে। শরম করে না জী? ওই ছোটি, শুন-বাবার জন্যে কত গল্প করে। কত পথ তাকায়! থাক থাক। আর বড়াই কোরো না।

তিন গাঁয়ের মুখিয়া আছ, এ গাঁয়ে বড়াই করতে এসো না। বলে—ছেলে পসন্দ বলে বিভা দিয়েছে। তো কুড়ি ভরি চাঁদি, সাত কুড়ি টাকা কে নিল জী? চাঁদির বদলে এতোয়ারির ভুঁইটুকুন যে চলে গেল—মনে ভাবলে না মেয়ে গিয়ে কী খাবে? ধিক! শতধিক! ঝুটবাজ! ফন্দিবাজ! আমার বেটাকে বাগানপাড়ায় দেখেছ থামো থামো—তোমার এই দুগালী সুরতওয়ালী বেটি ভি সেখানে যাবে! না যায় তো আমার মুখে চুনকালি লাগিয়ে বেগুনক্ষেতে আমাকে খাড়া করে রেখো।...

ততক্ষণে আনাচে-কানাচে নিষাদবাগের বহুবেটিরা জড়ো হয়েছে। পাটকাটির বেড়ার ফাঁকে জোড়ায় জোড়ায় ড্যাবডেবে চোখ। ছাতিমতলা থেকে ভরত শনের দড়ি পাকাতে পাকাতে ঢ্যারা হাতে চলে এসেছে। মান্তবর ধরা গলায় বলে—শুনছ? শুনছ বেয়ানের বাৎচিৎ? আমি এলুম দুটো হককথা বলতে—আর উল্টে মুখখিস্তি।

ভরত এগিয়ে যায় সরস্বতীর দিকে। ধমক দিয়ে বলে—এ্যাই বুঢ়িয়া। এ্যাই গে সরস্বতীয়া! কার সঙ্গে কী রকম কথা বলছিস খেয়াল আছে গে? চিরটা কাল একরকম থেকে যাবি তুই?

সরস্বতী এতে আরও ক্ষেপে যায়। হাততালি দিয়ে নাচতে-নাচতে বলে—পুছো ভাল মানুষ বড়ঘরী ভুঁইক্ষেতিওয়ালা লোকটাকে! পুছো ওই বখিল কলাবেড়িয়া-ওলাকে! আমার বেটার বদনাম গাইতে নদী পার হয়ে কে এল, তাকেই পুছো। আর পুছো ওই ঢলানি সাবুনমাখানী পাওডারওয়ালী দুবেলা ঘাটে নাহানেওয়ালী ওই ছোকড়ীকে। নিষাদবাগে বহু-বহুড়ী আর নাই? ছেলে-পুলের জন্ম দিয়ে চুল পাকিয়ে আমার মতো বুড়ি হয়ে গেল না?

ভরত গতিক বুঝে নরম স্বরে বলে—আঃ বহিন, চুপ চুপ। নিষাদবাগের ইজ্জত রেখে কথা বল। তুই কি না আক্কেলওয়ালী ঔরত! ছি, ছিঃ!

এবার সরস্বতী একটু শান্ত হয়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—বেটির বাপ, জামাইয়ের শ্বশুর এসেছে গে জামাইকে শাসন করতে। এদিকে বেটির জন্তেই যে জামাইয়ের কলজে পচে যাচ্ছে, সে হিসেব ওর আছে? তোমরা নিষাদবাগওয়ালারা দেখছে না এতোয়ারির কী হাল হচ্ছে?

মান্তবর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়। ভরত বলে—দাদা, এক বাত শুনো। বেটা-বেটির জন্ম দেওয়া যত সুখের, তত দুঃখের। তো আমি বলি কী, মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটুখানি বসো। বেয়ানের হাতের জলটল খাও।

মান্তবর হঠাৎ ঘুরে দাওয়ার দিকে তাকায়। মেয়েকে দেখে। তারপর কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে—আমার বেটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ফুলিয়া চলে আয়।

অমনি সরস্বতী উঠোনের উনুনের পাশ থেকে ছাগলের খুঁটি বসানো দুরমুষটা তুলে কোমরে আঁচল জড়ায়।—নিয়ে গেলেই হল? গায়ের জোরে নিয়ে যাবে তো যাও না দেখি। সাতকুড়ি টাকা ফেলো, বেটিকে বলো গয়না খুলে দিক। তারপর নিয়ে যেও।

ভরত তার দুরমুষটা কেড়ে নিয়ে বলে—আহা! মুখে বলছে বলেই কি নিয়ে যাচ্ছে?

এবার মাতব্বর একটু গলা চড়িয়ে ডাকে—ফুলিয়া। চলে আয়! এ্যাই ফুলিয়া!

সরস্বতী চিলচিৎকার করে দাওয়ায় উঠে ফুলকলিয়াকে ঘরের ভেতর ঠেলতে থাকে। এই সময় শরতের বউ নির্মলা এসেছে ঘাট থেকে। কাঁখে পেতলের ঘড়া। ঘাড় থেকে বুক অব্দি গামছা জড়ানো রয়েছে। সত্ত নেয়েছে। ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে শরীরে। টুপটাপ জল ঝরে শুকনো উঠোনে কাদা হচ্ছে। সে কলসী নামিয়ে রেখে হাসিমুখে দাওয়ায় যায়। বুড়িকে সরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে—আসমান কানা। বর্ষাচ্ছে না। তাই তোমরা বুঝি এমনি করে বর্ষাচ্ছ গে? ছোড়, ছোড়। দুনিয়া একদিকে, এরা অন্যদিকে হাঁটবেই। ও বুড়োর বেটা, ও কলাবেড়িয়ার মোড়ল! তোমার বেটি আছে, আমি আছি। চলো, বেয়ান তো গুড়জল করাবে না। আমি ছাগলের ঘন দুধ দিয়ে চা খাওয়াব।

মাতব্বর কিছু না বলে ঝটপট ঘোরে এবং বেরিয়ে যায়। ফুলকলিয়া বুক ফাটানো চিৎকার করে ওঠে—বাবা!

নির্মলা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—চুপ রী! বাবা কি তোর একা আছে?

## ॥ সাত ॥

সবাই জানে শ্বশুরের সামনে এতোয়ারি 'চুহা' হয়ে 'গাড়া'য় ঢুকতে পারলে বাঁচে। শ্বশুরের দেওয়া বদনামের বিরুদ্ধে যা বলার তা তার মা'ই বলেছে নিষাদবাগওয়ালীদের সামনে। সবাই বিশ্বাসও করে নিয়েছে যুক্তিটা। এতোয়ারি টাউনবাজ হয়ে উঠেছে কিছুটা। তাই বলে বাগানপাড়ার ছোকড়ি নিয়ে মজবে, একথা ওই গাছটাকেও জিগ্যেস করো—মানবে না। অতএব কলাবেড়িয়ার মোড়ল মেয়েকে এতোয়ারির ভাত-ছাড়ানোর মতলব দিয়েছে। আর মেয়েও সেইমতো রাস্তা ধরেছে। মরদের পাশে শোয় না। তাকে গ্রাহ্যও করে না। নিষাদবাগওয়ালারা বেচারা এতোয়ারির জন্যে দুঃখিত। বরং আরও স্নেহের চোখে লোকে তার দিকে তাকাচ্ছে। বউকে কী কী পদ্ধতিতে এসব সংকটের সময় মুঠোয় রাখতে হয়, তারও ফন্দিফিকির বাৎলাচ্ছে অনেকে। আর সরস্বতী বুড়ি তো বউয়ের ওপর আরও

মোড়লদারি দেখাতে শুরু করেছে। একটু চোখের আড়াল হবার যো নেই ফুলকলিয়ার। সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে ওঠে বুড়ি।—কাঁহা গেইলা গে ধরমওয়ালার বেটি? ওধারে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? চোখ গেলে দেব। এদিকে আয়!

ফুলকলিয়া তাই বলে ভড়কে যাবার মেয়ে নয়। পাল্টা ফোঁস করে বলে—তোমার মরা বাবাকে দেখছি গে! গঙ্গায় দাঁত ছরকুটে ভেসে যাচ্ছে কি না। তাই দেখছি।

বুড়ি ছাগলের খুঁটিপোতা দুরমুষ তুলে গর্জায়—মুখ ভেঙে দেব আবাগীর বেটির।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। বুড়ি মনে মনে বেজায় ভড়কে গেছে। গোলমালটা যে অন্যখানে। এতোয়ারির সায় পাচ্ছে না শাসন-তর্জনে। সে রাতে বুড়ি জোর করে বউকে ছেলের পাশে পাঠিয়েছিল শুতে। এতোয়ারি রেগে আগুন। তালের পাটি আর বালিশ তুলে নিয়ে বলল—বারোয়োরিতলায় মাচায় শুতে চললাম। তুই তোর বউ নিয়ে আরামসে নিদ যা গে মা।

গতিক বুঝে বেশি হইচই করেনি সরস্বতী। পরে বলেছিল—বহু নিবি না তাহলে? আচ্ছাসে শোচ করে ছাখ এতোয়ারি। যদি না লিস এখনই বল। গয়না কাপড় কেড়ে নিয়ে গাঙ পার করে দিই মোড়লের বেটিকে।

—দে না। আমি কি বলছি দু'বেলা ধূপ চন্দন দিয়ে পুজো কর? এই বলে এতোয়ারি গাঁওয়ালে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এ এক সমস্যা সরস্বতীর। বলতে গেলে বউ হচ্ছে কি না চৌবেলালজীর মতো এককাঁড়ি নগদ টাকা দাদনের কারবার। এতোয়ারি এখনও সেই নাবালক থেকে গেছে বলে তো তার মা তা নয়। বউ তো একটা লাগবেই। গয়না যদি বা কেড়ে নেওয়া গেল, পণের নগদ টাকা আবার কী বেচে যোগাড় করবে? জেদের মাথায় তাও না হয় করা গেল। কিন্তু ওদিকে কলাবেড়িয়ার মোড়ল আবার মেয়ে বেচে কোন না আরও সাত-আট কুড়ি টাকা নাফা করবে! এটাই বজ্জ মনে বিঁধছে বুড়ির। এ নিয়ে সে জ্ঞানী ভরত, দার্শনিক নয়নসুখ আর সুবিচারক ধনপতি মুখিয়ার কাছে গোপনে পরামর্শ চেয়েছে। সবাই বলেছে, এতোয়ারির গোস্বা হয়েছে বউয়ের ওপর। পুরুষ মানুষের ব্যাপার। বেশিদিন থাকবে না গে বহিন! বউ যদি উল্টোপাল্টা বুলি না বলে, তুই চুপসে বৈঠা থাক। ছেলে-বউয়ের মধ্যে মিল হয় কি না ছাখ্। দার্শনিক নয়নসুখ বলেছে—আরে! গাইবাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। তো কলাবেড়িয়ার মোড়ল মতলব করুক, তার বেটির যদি নিষাদবাগে ভাত খাবার ইচ্ছে থাকে, সে কিছু করতে পারবে না।

ধনপতি বলেছে—হাঁ। উও ঠিক, তেরা বহুর হালচাল বুঝছিস তো ?

সরস্বতী ফিসফিস করে বলেছে—বুঝতেই তো পারছি না দাদা। সে রাতে শুতে বললুম তো বহু শুতে গেল। লেকিন বেটা শুতে নিল না। তারপর থেকে আমি আর ছোটী দুপাশে, মধ্যিখানে বহু নিয়ে শুচ্ছি। সারারাত ঘুমোতে পারিনে। কখন ভেগে যায় নাকি! তোমরা বলবে ঘরে বহুকে ঢুকিয়ে শেকল আটকে দিইনে কেন? সেও ডর লাগে। কাহে? কী, মনুয়ার বহুর মতো রাগের চোটে গলায় দড়ি দেয় যদি!

হাঁ, এটাও ভাববার কথা। মানুষবের চেনাজানা খাতির ধনপতির চেয়ে বেশি। থানাপুলিশ করবে। মনুয়ার শ্বশুর মোড়ল না হয়েও হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছিল। ধনপতি আর তার ছেলে 'এলেমদার' সুরযপতি অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছিল মনুয়াকে। তবে মনুয়া আর গাঁয়ে রইল না। বেলডাঙায় চলে গেল তার বাবুর আড়তে। এখন কয়াল হয়ে তারাজু মাপে। ছে ছে···ঘেঁষ ঘেঁষ ন্‌ঠেন্‌ ন্‌ ঠেন ঠে···!ওর চোখেমুখে আজকাল রোশনাই ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাবু হয়ে গেছে সে। দেখলে কে বলবে এই সেই নিষাদবাগের মনুয়া—কাঁধে ভার বয়ে গাঁওয়ালে যেত! জামা খুললেই কিন্তু কাঁধের কালচে ছোপ বেরিয়ে পড়বে। ওই তোমার জন্মদাগ। ঠাকুরবাবা ব্রহ্মাজী দেগে দিয়েছেন। তাঁর দুই কন্যা ভাবি আর ভুরিকে বহন করতেই তোমার জন্ম হয়েছিল যে!

তো ফুলকলিয়ার আচরণে অবশ্য এদের ভাত না খাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পাল্টা মুখ করার জোরটাই যা বেড়েছে শুধু। কিন্তু আর সব ঠিকই আছে। ছোটীর সঙ্গে ভাব গপসপ হাসি তামাসা তেমনি বজায় আছে। কাজেও মন আগের মতো লাগাচ্ছে। তবে মাঝেমাঝে পশ্চিমের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে দূরের কলাবেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা—এটাই কেমন লাগে যেন। আর সেদিন থেকে শরতের বউ নির্মলার আনাগোনাটাও বড্ড বেড়েছে। নির্মলাকে সরস্বতীর খাতির করে চলতেই হয়। এভাবে টাকাকাড়ি আর কে দেবে মুখের কথায় ওই নির্মলা ছাড়া? মুখে খুন উঠে মরে যাও, গাঁয়ে চার আনা হাওলাত পাবে না কারও কাছে। তাই নির্মলা যখন এসে বউকে ডাকে—আয় রী বহু! নাহান করতে যাই! সরস্বতী মানা করতে পারে না। শুধু ছোটিকে ইসারায় লেলিয়ে দেয় পেছনে। ছোটি মায়ের কথা মেনে ওদের পিছু ধরে। কিন্তু বারোয়ারিতলায় গিয়েই সে কেটে পড়ে।······

এই সময় এক পড়ন্ত বিকেলে নদীর ওপারে আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল। বাতাস থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ কারো খেয়াল হয়নি ব্যাপারটা। ল্যাংড়া

রঘুয়া ক্রাচে ভর করে বাঁধে শিমূলতলায় দাঁড়িয়ে একটি ডাক ছাড়তেই সারা নিষাদবাগ সচকিত সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুরবাবা কালা ভঁইসা ছেড়ে দিয়েছেন! ওই ছাথ তার শিঙ থেকে রোশনি ঠিকরোচ্ছে! ওই ছাথ তার কপালে সিঁদুর! আর তারপর সেই অন্ধকারবর্ণ বিশাল মহিষ গর্জন করল পশ্চিমের নীলবর্ণ বাথানে। ল্যাংড়া রঘুয়া হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল হা হা হা হা! হা হা হা হা! বহু-বহুড়ী বাচ্চা কাচ্চা বুড়োবুড়ি গাঁয়ে যারা ছিল, দৌড়ে চলে এল বাঁধে। বুধিনী-সুধিনী বোবা-কালা যমজ বোনের চোখগুলো বড়ো হয়ে গেল। আবার গর্জে উঠল ঠাকুরবাবার কালো মোষ। চাপচাপ সিঁদুর। সোনালি রূপোলি বিচ্ছুরণ। গর্জন। ধনপত্তিয়ার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। নয়নসুখ বিড়বিড় করে বলল—ঠাকুরবাবা! ঠাকুরবাবা! ল্যাংড়া রঘুয়া হাত তুলে কালান্তক ভঁইসাকে ডাকতে ডাকতে আবার হাসল হা হা হা হা! তারপর ঠাকুরবাবার ভঁইসা দেখেছে নিষাদবাগকে। শিঙ নেড়ে তেড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। গাছপালা কেঁপে উঠল। গঙ্গার শুকনো চড়ায় ধুলোবালি উড়ল। চোখের পলকে এসে পড়ল দুরন্ত কালো মহিষ। নিষাদবাগ থরথর করে কেঁপে উঠল। ল্যাংড়া রঘুয়া দু'হাত তুলে এক ঠ্যাংয়ে নাচতে থাকল। তার জটা-চুল দুলতে থাকল। সেই দুলুনির তালে তালে হাওয়ার গতি বাড়ছে আর বাড়ছে। তারপর বাঁধের তাল গাছ থেকে শুকনো বাগড়াখানা খসিয়েই চুল নাড়া দিল বছরের প্রথম কাল-বোশেখি। খুব দেরি করেই এল এবার। আর প্রচণ্ড ঝড়ের পিছনে-পিছনে দ্রুত চলে এল বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে অল্পনল্প শিলপড়া। গরু-ছাগল চ্যাচাতে চ্যাচাতে গাঁয়ের দিকে দৌড়াল। বাঁধ থেকে হইহল্লা করে সবাই গাঁয়ে ফিরে আসছে। সরস্বতী বুড়ি বাড়ি ঢুকেই চ্যাচায়—বহু গে! লকড়ি তুলেছিস? ও ছোটি! তোর দাদার জামা তুলেছিস? সব তোলা হয়েছে দেখে সে খুশি হয়। ছাগলটাও দাওয়ার কোণে লেজ নাড়ছে।

ছোটি ডাকে—আয় তো বহুদিদি! শিল কুড়োই।

ফুলকলিয়া লাফ দিয়ে নামে দাওয়া থেকে। ননদ-ভাজে উঠোনে শিল কুড়োতে থাকে। আঁচলে রাখে। চড়চড়ে বৃষ্টির ফোঁটায় দুজনে ভিজে ঝুপসি হয়ে যায়। সরস্বতী দাওয়ায় বসে পড়েছে চারপায়াটা নিয়ে। তার মুখেও হাসি। মাঝেমাঝে কপট ধমকাচ্ছে—ছটা গিরবে রী ছোটি! বহু, উঠে আয়!

ওরা শোনে না। উঠোনে পায়ের ছাপ পড়তে না পড়তে ধুয়ে যাচ্ছে। কুচি-কুচি এট্টুকুন শিল। ছোটি পিঠে হাত দিয়ে মিছেমিছি কঁকিয়ে উঠছে—ইঃ মা গে! ফুলকলিয়া খিলখিল করে হাসে।

ততক্ষণে সরস্বতীর মনে ছেলের জন্তে ভাবনা এসেছে। এখন কোথায় আছে

এতোয়ারি? যদি কোন মাঠের মধ্যিখানে থাকে? যদি কোন গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে? ভয়ঙ্কর গর্জন করে বাজ পড়ছে। কানে তালা ধরে যাচ্ছে। ননদ-ভাজ সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে বসে পড়ছে। আওয়াজ থামলে আবার হাসি আর শিল কুড়ানো। কিন্তু আর শিল পড়া কমে গেল। বৃষ্টি আর মেঘের ডাক বারবার। সরস্বতী এতোয়ারির জন্যে মনে মনে ঠাকুরবাবাকে ডাকছে। চোখ বুঁজে একমনে ডাকছে। হেই ঠাকুরবাবা! ওই আমার একটি মোটে! আর তো নেই! তাকে যেন কিরপা করো, বাবা। সরস্বতীর খালি মনে হচ্ছে, এতোয়ারি নয়নসুখের ভাগের পাল্লায় পড়ে ঠিকই কোন মাঠের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছে। ফিরে আসুক ভালয় ভালয়, ওই ছোকড়ার সঙ্গ ছাড়াবে। হাটুয়া কেন এতোয়ারিকে মাঠের মাঝখানে এসময় নিয়ে যাচ্ছে তা সে জানেনা কেবল এমনি ধারণা হচ্ছে। হাটুয়ার হাবভাব আজকাল কেমন ধারা যেন! আরও চালিয়াৎ আরও পাকা লাগে। মুখে বড় বড় বুলি। সব বুলির মানে সরস্বতী বোঝেও না।

ফুলকলিয়ার মনের ময়লা কি কেটে গেল বৃষ্টিতে? সে উঠে আসতে চায় না। শিল চুষতে চুষতে ছোটাকে বলে—আ রী ছোকড়ি! মুখিয়ার মেয়ে সন্ধ্যামণির বিয়েতে নেচোছলাম—তার ফল এতদিনে ফলল রী! ছোটি সায় দিয়ে বলে—ঠিক বলেছিস রী বহুদিদি!

সরস্বতী ধরা গলায় ডাকে—উঠ যা, উঠ তো, খুব হয়েছে। আর ভিজিস না!

ফুলকলিয়া বলে—আ রী ছোটি! রাত লেগে গেল এরই মধ্যে? এত্তা আঁধার!

ছোটি বলে—হাঁ বহুদিদি! সেও শিল মুখে পুরে দেয় টপাটপ। খুশিতে চোষে। অবেলায় যেন সন্ধ্যারাতের অন্ধকার নেমেছে। কালো ছায়া ঘিরে আছে নিষাদবাগকে। উঠোনে সবুজ ছেঁড়া পাতা আর ছোট ছোট ডালপালা এসে পড়েছে। হাওয়ার বেগটা কমেছে। বর্ষণ বেড়েছে। জল গড়াচ্ছে নর্দমায়। দুটো কাঁসার গেলাসে ননদ-ভাজ নিজের নিজের শিলগুলো ঢেলেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনিও শুরু হয়েছে দু'জনের। শিল চুষে দাঁত-জিভ গলা থেকে বুক অব্দি হিম ভাব।

সরস্বতী বলে—কাপড় ছাড়গে বহু! ছোটি, মরবি গে? কাপড় ছাড়!

আর দু'জনে অবাক হয়ে দেখে বুড়ির দু'চোখে জলের ধারা নেমেছে। ঠোঁট কাঁপছে। ছোটি চোখের ঝিলিক তোলে, বউদির দিকে তাকায়। ঠোঁটে চাপা হাসি। ছোটি জানে, মা এবার বাবার জন্যে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে, তারই পূর্বাভাষ। ফুলকলিয়া কিন্তু অবাক হয়।

সরস্বতী একটু পরে গুন-গুন করে কাঁদতে থাকে। ননদ-ভাজ কাপড় ছাড়ে

দাওয়ায়। চুল মোছে। দুজনেরই মনে বিরক্তি। দিলে তো খুশি মাটি করে। বৃষ্টির দিনে সরস্বতী বরাবর এমনি ঝিম মেরে যায় এবং তারপর কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। বৃষ্টি হলে কাঁদবার কী আছে?

হঠাৎ ছোটি বলে—এই যাঃ বহুদিদি গে! ও বহু দিদি!

—কী রী?

—আম কুড়োতে গেলাম না যে। ও মা! বহুৎ ডালপালা গিরে গেছে—কুড়িয়ে আনলাম না কাহে গে?

সরস্বতী কান্নার মধ্যে হুকুম দেয়—না। চুপ করে বসে থাক।

ফুলকলিয়া নিষাদবাগে এই প্রথম ঝড়বৃষ্টি দেখল। ছোটির কথায় সে একটু আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু সরস্বতীর কান্নায় মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সে চুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘরে ঢোকে। ঘর অন্ধকার একেবারে। লম্ফ না জ্বাললে কিছু দেখা যাবে না।

ছোটি বাইরে তখনও আফশোস করছে। আম না পাক, একগাছা লকড়ি তো পেত! বুধিনী-সুধিনীরা এতক্ষণ বাড়ির উঠোন ভর্তি করে ফেলেছে। শিল কুড়োবার সময় এ কথাটা কীভাবে ভুল গেল সে?

ফুলকলিয়া ভেতর থেকে বলে—ছোটি! লম্ফ জ্বাল না রী!

—তুই জ্বাল রী।

—তোর দাদার মেচবাত্তিটা কোথায় জানিস?

—মেচবাত্তি কি তোমার জন্যে রেখে গেছে: আমার বহু লম্ফ জ্বালবে গে! সরস্বতী ফের গুনগুনানি থামিয়ে বলে—চুলায় আগুন আছে।

ছোটি হেসে খুন সঙ্গে সঙ্গে। উঠোনের চুলোয় আজকাল রান্না হয়। জলে ভর্তি হয়ে গেছে।

রাতে যদি কিছু রাঁধবার থাকে, দাওয়ার চুলো জ্বালতে হবে। সে হাসতে হাসতে বলে—যা রী বহুদিদি! চুলার কলে লম্ফের শীষ ধর গে। ফুরুৎ করে জ্বলে উঠবে।

সরস্বতী বুঝতে পেরে করুণ সুরে বলে—ছোটি! মালতীদের ঘর থেকে লম্ফ জেলে আন্ মা!

—হুঁ, বরষাচ্ছে দেখছ না আভি? লম্ফ বুঁতে যাবে না? আমি ভিজে যাব না ফির? ছোটি আপত্তি জানায়। আর বহুদিদির কী হল রী? লম্ফ জেলে কি সুরত দেখবি এখন? ইঃ! কলাবেড়িয়ার বেটীর সুরত বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে কি না দেখবে গে।

—ছোটি! তোর বড্ড কথা হয়েছে রী আজকাল! ফুলকলিয়া চাপা গলায় বলে। আঁচলের তলায় লম্ফ জেলে না আনতে পারলে কী হবে জানিস?

—কী হবে শুনি?

—বহু হতে পারবিনে কোনদিন।

—ভাগ ভাগ। আমি তোর মতো বহু হবো ভাবছিস বুঝি? ছোটি মরে যাবে, বহু হবে না!

সন্ধ্যাবেলা অলক্ষুণে কথা শুনে সরস্বতী কান্নাটা পুরো মুলতবি রাখে। রাগ দেখিয়ে বলে—আলো না জ্বাললে আঁধারে গিলবি তোরা। পোকা মাকড় সুদ্ধ গিলবি যে!

বৃষ্টি একটু কমেছে। ফুলকলিয়া লম্ফ নিয়ে বেরোয়। শাশুড়ী কী বলবে না-বলবে গ্রাহ্য করে না। উঠোনে নামে। ছোটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। --শুকনো কাপড় আবার ভেজাতে যাচ্ছে মোড়লের বেটি! ও মা! তোর বহু লম্ফ জ্বালতে যাচ্ছে গে।

সরস্বতী গর্জায়---বহু। এ্যাই বহু।

বহু ততক্ষণে বাড়ির বাইরে চলে গেছে। সরস্বতী একটু ভাবনায় পড়ে যায়। পালিয়ে যাবার ছল নয় তো? কিন্তু তাই বলে সে এই বৃষ্টিকাদায় বহুর পেছনে ছুটতে পারবেনা। সে ব্যস্তভাবে বলে—ছোটি! ভাখ তো, কোথায় গেল?

—তুমি যাও না তোমার বহুর সঙ্গে। আমার কাঁপুনি ধরেছে। ছোটি নির্বিকার বলে দেয়। আবার ভিজব? তুমি যতই 'ভড়পাও ছোটি নড়বেনা'।

সিঁকনিপড়া রোগা মেয়েটা কবে কবে সাবালিকা হয়ে গেছে যেন। কথাবার্তার রকমসকম দেখে থ বনে যায় সরস্বতী। সে অগত্যা বারবার চেরা গলায় ডাকতে থাকে—বহু গে। এ্যাই বহু। ও রী আবাগীর বেটি।

বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় তখন অন্য একটা ব্যাপার ঘটছে নিষাদবাগে। কোটি-কোটি পোকামাকড় দারুন চ্যাচামেচি করে গান জুড়ে দিয়েছে। বেয়াড়া গলায় ব্যাঙ আর সোনাগদি ডাকছে কোথায়। ঝিরঝিরানি তুচ্ছ করে জোনাকি বেরিয়ে পড়েছে দুচারটে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু বিজলীর ঝিলিক আর মেঘের ডাক বাজছে। আবার এতোয়ারির কথা ভেবে বুড়ি আনমনা হয়ে যায়।

পাশের বাড়িতে তখন ফুলকলিয়া লম্ফ জেলেছে। মালতীর মা বলে—তোর মরদ ফিরেছে গো?

—না রী কাকী!

—মালতীরা এখনও ফিরল না রী। জামাইয়ের সঙ্গে গোকরনের হাটে গেছে। এত্তা দেরী কাহে?

গাঁওয়ালে যাওয়া মেয়ে মরদের জন্যে এখন নিবাদবাগ উদ্বিগ্ন। সবাই এমন দিনে ঘাড়িতে থাকলে বৃষ্টির সুখটা তারিয়ে ভোগ করতে পারত।

—চলি কাকী। বুঢ়িয়া চিল্লাচ্ছে শুনছ না?

—তুমি বড়ঘরের মেয়ে বলেই সব সইছ মা। আর কোন মেয়ে সইত না। আমার মালতী তো মরদকে লিয়েই চলে এল। আমি বললাম, তা ভালই হল একরকম। আমার তো বেটা নেই। জামাই বেটা হয়ে দাঁড়াল। · বলে মালতীর মা ফিসফিস করে ওঠে। এতোয়ারিকে লিয়ে আপনা বাপের ঘরে চলা যা না রী। তোর বাপের কেত্তা ধন-ধান। এত বড় বাড়ি। টিনের চাল। গরুর গোহাইল ভি আছে। আমি তো দেখেছি। কাহে ঝামেলা করে আছিস রী? আমি হলে এ্যাদ্দিন…

সরস্বতীর ডাক ভেসে এলে মালতীর মা চুপ করে। ফুলকলিয়া চলি কাকী বলে পা বাড়ায়। বৃষ্টির ফোঁট' খুব হালকা এখন। হাওয়াটা আবার উঠছে। ঠাণ্ডা লাগছে। আঁচলের আড়ালে লম্ফ নিয়ে রাস্তায় নামে ফুলকলিয়া। তারপর শোনে অন্ধকারে ক্রিং ক্রিং ক্রিররররর রিং। রক্ত ছলকে ওঠে বুকে। আলো কোথায় টিপগাড়ির? রাস্তার মাঝখানে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াতে পারে কি কলাবেড়িয়ার বেটি? একটু দাঁড়ায় সে—সাবধানে একপাশে। লম্ফ দেখতে পেয়েছে টিপ-গাড়িওয়ালা। কাছে এসে বলে ওঠে—কৌন গে? কাপড়ে আগ্ ধরে যাচ্ছে যে! হুঁশ করে ধর্ না লম্ফঠো।

হকচকিয়ে ফুলকলিয়া লম্ফ সামলায়। ধরেনি। ধরে যেত আরেকটুতে। সে চাপা হেসে ওঠে।—মুখিয়ার বেটার টরচবাত্তির কল কি আবার বিগড়েছে?

টিপগাড়ি থেমে যায়। সুরযপতি বলে—কৌন রী? এতোয়ারীর বহু? আরে ভাই! ভুল করে নিয়ে বেরোইনি টর্চ বাত্তিঠো। গাঁয়ে ঢুকে তোমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হল, তোমাকেই পুছি। এদিকে বরষাল কেমন?

—বহুৎ জোর বর্ষেছে। উধার ক্যায়সা জী?

—আমি তো ছিলাম টাউনে। ওখানেও জোর বর্ষেছে। কম বর্ষালে বাঁধের রাস্তায় কাদা হত। সাইকেল কাঁধে নিতে হত।…সূর্য হাসতে হাসতে পা বাড়ায় আর সাইকেলে চাপে না সে।

হঠাৎ ফুলকলিয়া ডাকে—মুখিয়ার বেটাকে একহি বাত বলব জী!

—বাত? আমাকে? ক্যা রী বহু? বোলো।

—বাবার সঙ্গে শাপের ঝগড়া হয়েছিল সেদিন। মুখিয়ার বেটা শোনেনি?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

ফুলকলিয়া ভাঙা গলায় বলে—সেই থেকে খুব জুলুম হচ্ছে আমার ওপর! এমন এলেমদার গাঁয়ে থাকতে আমার ওপর জুলুম হবে জী? আমি…আমি নিষাদবাগে আর থাকব না জী। হাঁ, মুখিয়ার বেটা যদি এর ফায়সালা না করে, আমি পালিয়ে যাব।

কথাটা বলেই সে কান্না চেপে বাড়ি ঢুকে পড়ে! সূর্য অবাক হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সাইকেল ঠেলে এগোয়। ঘণ্টা বাজায় আবার। বলা যায় না কে এসে পড়বে—মানুষ বা জানোয়ার! এতোয়ারির বউয়ের কথাগুলো মনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কী করতে পারে সে? সে তো বাপের মতো গাঁওপতি মুখিয়া নয়। আর নিষাদবাগের কোন শাশুড়ী না বহুর ওপর জুলুম করে? সূর্য মনে মনে হাসে। কিন্তু মনের মধ্যে ফুলকলিয়ার কণ্ঠস্বর থামে না। এ এক উপদ্রব! সূর্য যেতে যেতে ঘুরে অন্ধকারে এতোয়ারির বাড়িটা দেখবার চেষ্টা করে। কলাবেড়িয়ার মেয়েটা কেমন অদ্ভুত যেন—নিষাদবাগের মেয়েদের মতো নয়।

পরক্ষণে সূর্যের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফোটে। আরে দুর দুর! গায়ে উল্কিদাগা লেখাপড়া না জানা বোকার হদ্দ একটা মেয়ে! ওর সঙ্গে যদি সূর্যের দৈবাৎ বিয়ে হত, কী লজ্জার ব্যাপার না হত! শহরের বন্ধু-বান্ধব বা চেনাজানা সব ভদ্রলোকের কথা ভেবেই সূর্য তার বউয়ের একটা চেহারা-চরিত্র খাড়া করেছে। সে বউ কোথাও না কোথাও আছে। শুধু খুঁজে বের করতে হবে—এই যা!

ধনপতি হেরিকেন হাতে বেরিয়েছে ঘণ্টা শুনে।—এলি বেটা? এতক্ষণ তো ভাবনায় সারা হচ্ছিলাম। খুব বাজ-বিজলী হচ্ছিল কি না। কোথায় ছিলি তখন?

—টাউনে। এদিকে খুব বর্ষেছে মনে হল!

—খুউব। ঠাকুরবাবার কিরপা হল এ্যাদ্দিনে।

—হুঁ। তোমার চৌবেজী দেখবে কাল ভোর হতে না হতে এসে পড়বে ওর ধড়ে তো জান এল!…সূর্য হাসতে হাসতে সাইকেল ঢোকায় দরজায়। ধনপতি হেরিকেন তুলে আলো দেখায় ছেলেকে।

ওদিকে ফুলকলিয়া বাড়ি ঢুকতেই সরস্বতী ধরেছে।—কার সঙ্গে বাত করছিলি গে রাস্তায়?

—ভূতের সঙ্গে।

ছোটি খিলখিল করে হেসে বলে—হাঁ। ভূতের টিপগাড়ি ছিল। ঘণ্টি বাজছিল।

সরস্বতী গর্জন করে ওঠে—এ্যাই বহু! সুরযুয়ার সঙ্গে কী বাত করছিলি?

ফুলকলিয়া পাল্টা চেঁচিয়ে বলে—দুনিয়া ঠাণ্ডা হল। তুমি আর ঠাণ্ডা হবে না! খালি বহু, বহু আর বহু! বহু তো কখনও বাবার কালে দেখনি—খালি বহু বহু। বহু পেয়েছ যার জন্যে, সেই বেটার কথাটা ভাবো ততক্ষণ। ঝড়বিষ্টিতে কোথায় থাকল, সেই কথাটা ভাবো। তা নয় খালি বহু বহু।

এইতে বুড়ি শান্ত হয়। বলে—হাঁ গে, হাঁ। ওহি তো ভাবছি।

ছোটি বলে—মা, ভুখ বাজছে। খেতে দে না গে।

—দিই বেটি।...বলে বিষণ্ণ সরস্বতী আস্তে আস্তে ওঠে চারপায়া থেকে।—

শরতের ঘড়ির হিসেবে সময় মাপা। সাহাবাবুর আড়ত থেকে বেরিয়েছে রাত বারোটায় কাঁটায় কাঁটায় থাকতে বলেছিলেন সাহাবাবু। শরতের উপায় নেই। বউ একলা থাকবে। ঘুমাতে পারবে না চিন্তাভাবনায়। টর্চ আর সাইকেল নিয়ে সে নিষাদবাগে ফিরে আসছে। কলেজের পর পর্তুগীজ চার্চ অব্দি গঙ্গার ধারে র বাঁধের কাঁধ বরাবর রাস্তাটুকু পীচের। তারপর বাঁধে উঠতে হবে। মাঠজঙ্গল য়ে গাঁয়ের এলাকা শুরু সেখানে। যত বৃষ্টিই হোক, এ মাটিতে জল দাঁড়ায় না, দাও হয় না। সাইকেল বারোমাস চলে। পোয়াটাক এসেই শরতের টর্চের লো কাঁধে ভারওয়ালা একটা লোককে ধরে ফেলে। ভারের দুধারে খালি দুটো ড় ঝুলছে আর এদিক-ওদিক দুলছে। কারণ লোকটা টলছে। টলতে টলতে ধের গায়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে ঝোঁক সামলে নিচ্ছে। শরত মুচকি হাসে। টর্চ ভায় না। যেভাবে ওর ভারটা এদিকওদিক ঘুরে যাচ্ছে, সংকীর্ণ রাস্তায় ইকেলের পাশ কাটিয়ে যাওয়া কঠিন। হাত দশেক তফাতে পৌঁছে শরত বলে—কৌন রে?

লোকটা ঘোরে না। গায়ের হাফ-শার্ট কাদায় বিচিত্তির। ধুতিটা হাঁটু অব্দি রীতি তোলা। এমন বেশে গাঁওয়ালে কিংবা টাউনে সবজি খন্দ-আনাজপাতি চতে যায় যে, সে নিশ্চয় সৌখিন। পরক্ষণে শরত চিনতে পারে—এতোয়ারি বে? াই এতোয়ারি!

এতোয়ারি কথা বলে না। টলতে টলতে একই ভাবে হাঁটে। তখন শরত ইকেল থেকে নামে। পিছনে যেতে যেতে চাপা হেসে বলে—তুই বাঙ্কোতও লি শেখে রে? এ্যাঁ? আমি ভাবতাম, তুই মাটির ঢিবি। তুই দেখছি একেবারে াস্ত দেবতা। এতোয়ারি!

কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে এতোয়ারি।

শরত বলে—হাটুয়া কোথায় রে ? তোর প্রাণের ইয়ারকে কোথায় ফেলে এলি।

এতোয়ারি কিছু বলে না। শরত টর্চ নিভিয়ে পিছু পিছু চলতে থাকে। দুধারে মাঠ ঝোপঝাড় বাঁশবন আর গাছ পালায় পোকামাকড়রা জোরালো আওয়াজ দিচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে খাল-ডোবায়। কোথাও দূরে গঙ্গার তলায় শেয়াল ডাকল গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। পাখির ডানা নাড়ার শব্দ কোথাও। শরত সিগারেট ধরায়। ফের ডাকে—এতোয়ারী।

—হুঁ।

—কোথায় খেলি রে ? হাড়ি, না বোতল রে ?

এতোয়ারি গলার ভেতর থেকে জবাব দেয়—বোতল! তাড়ি নে ছে। হাঁ—বোতল।

—বোতল! এত পয়সা কোথা পেলি রে এতোয়ারি ?

তুমি কোথা পাও ? এহি বাত-ঠোর জবাব দাও, হাঁ!

শরত খিলখিল করে হাসে।—হাঁ রে এতোয়ারি। বাড়ি ঢুকবি কী করে রে ? সরস্বতী পিসি তোর পিঠে খ্যাংরা ঝাঁটা মুড়ো করে দেবে যে ?

এতোয়ারি হা হা করে হাসতে হাসতে প্রায় আছাড় খায়। সামলে নিয়ে বলে—মা জানতে পারলে তো। আমি চুপসে শুয়ে পড়ব উঠোনে। আমি তো রোজ ··

হিক্কা ওঠে ওর। শরত বলে—রোজ কী করিস ?

সে কথার জবাব আর দেয় না এতোয়ারি। আবার অস্পষ্ট কী শব্দ করে শুধু।

—আজ তো উঠোনে কাদা রে! আজ ঘরে শুতে হবে।

—হুঁঃ। তো ঘরেই শোব।

-বহু যে জানবে রে ?

—শ্বশুরশালার বেটিশালীকে হামি থোড়া পরোয়া করি জী! হামি তো রোজ পিই। হাঁ—রোজ।

—রোজ বোতল ?

—নাঃ। আজ বোতল পিইস্। পরশু—না তরশু বোতল। ঔর ঔর দিন তাড়ি। গাঁজা ভি। শরৎদা, তুমি কী পিয়েছ গে ?

শরত জবাব দেয় না কথাটায়। হ্যাঁ, সেও মাঝে-মাঝে একটু আধটু খায়। মদ-তাড়ি গাঁজ নিষাদবাগে কেউ-কেউ না খায় এমন নয়। আগে কড়া শাসন ছিল ধনপতির বাবার আমলে। ধনপতি ঢিলে মুখিয়া। আর দিনে-দিনে লোকেরা টাউনবাজ হয়ে গেল। কে কাকে শোধরাবে ? নয়নসুখের ভাই মোহনসুখ তো উঠোনের তালগাছে তাড়ির ভাঁড় ঝুলিয়েছিল। ওই গাছ থেকে পড়েই কলেজ

ফেটে মারা যায়। সেই একটা ভয় ঢুকে গেল নিষাদবাগে। নয় তো এ্যাদ্দিন অনেক গাছে ভাঁড় ঝুলতে দেখা যেত এই খবার মানে। শরত বলে কোথায় খাস রে এতোয়ারি ? বল না. আমিও বসব একদিন।

এতোয়ারি জোরে মাথা নাড়ে! নেহি জী।

—বল্ না ভাই! শরত কথাটা জেনে নিতে চায়। ফুঁসলিয়ে বারবার বলে—এই ভাই এতোয়ারি! তোদের সব খরচা আমার। বলনা রে!

এতোয়ারি খিকখিক করে হাসে।—বাগানপাড়ায় জী বাগানপাড়ায়।

শরত চমকে ওঠে। তাহলে নির্মলাকে ঘাটোয়ারিবাবু যা বলেছিল, আর ওই ছোঁড়াটার শ্বশুর কলাবেড়িয়ার মোড়ল যা বলে গেছে, সব সত্যি! এতোয়ারি বেশ্যাবাড়ি মদ খেতে যায়! শরত এতটা বিশ্বাসই করে নি। আরে, এতোয়ারি একটা অথস্তে গেঁয়ো মাটির ঢেলা! সেও বেশ্যাবাড়ি ঢুকে বসল! শরত বলে—হুঁ ভাল রাস্তা ধরেছিস রে বুড়ির বেটা! কে চেনালে বল্ তো ? তোর প্রাণের ইয়ার হাটুয়া বুঝি ? হুঁ। সে ছাড়া আর কে হবে ? ও ছোকড়ার তো হাড়ে-হাড়ে বদবুদ্ধি বরাবর। ওরে এতোয়ারি! মরে যাবি—বুঝলি ? খবর্দার।

এতোয়ারি টলে পড়ে হাসির চোটে। অন্ধকারে পা পিছলে আছাড় খায়। তবু হাসি থামে না তার। তারপর উঠে বলে--হাটুয়া পড়ে আছে নাটমন্দিরে। আমি চলে এলাম। তো শরৎদা! টর্চবাত্তিঠো জ্বালো না! দেখো না হামি ঠিকসে যাচ্ছি, নাকি বেহুঁশ যাচ্ছি ?

—চুপ শালা মাতাল!

—তুমি গাল দিচ্ছ জী ?

—হাঁ, দিচ্ছি। আরে শালা গিদ্ধড়! ঘরে তোর অমন বহু। তুই কোন দুঃখে বাগানপাড়া যাচ্ছিস, এঁ্যা ? যখন খারাপ ঘা হয়ে জলেপুড়ে মরবি, তখন বুঝবি শালা।

এতোয়ারি দাঁড়িয়ে বলে—ক্যা ? ঘা হবে ?

—হ্যাঁ। গামময় চাকা-চাকা ঘা হবে। বিছুটির মতো জ্বলবে!

এতোয়ারি দাঁড়িয়েই থাকে। টলুনি সামলায়। ভাঁড়টা অন্ধকারে দোলে এদিক ওদিক। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে।

—কী হল রে ? চল। পাঁও বাড়া। এ্যাই শালা মাতাল খানকিবাজ!

এতোয়ারি ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভাঙা গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলে—হাটুয়া হামাকে লিয়ে যায় শরৎদা। ওই শালা হামাকে রুপেয়াভি ধার করাইস গে। তিশঠো রুপেয়া উধার লিস হাম ঘাটোয়ারিসে।

শরতের মায়া হয়। ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—যা করেছিস, আর করিসনে। নাক-কান মুলে বল আর কখনো করব না।

—না। আর কভি না কিবে। সত্যি নাক কান মুচড়ে এতোয়ারি ভাঙা গলায় কিরে করে। হামার মরা বাপের কিরিয়া। হামার বেটাবেটির কিরিয়া।

মাতালের কাণ্ড। শরত ধমকায়।—বেটাবেটি হোক বে। তারপর কিরে খাস। চল্।...

বাকি পথটুকু এতোয়ারি আর কথা বলে না। গাঁয়ে ঢুকে শরত সাইকেলে চাপে। রাস্তা এরই মধ্যে শুকিয়ে গেছে।—যেতে পারবি তো এতোয়ারী? বলে এতোয়ারির জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই সে বাঁদিকে মোড় নেয়। এতোয়ারি ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে তৈরি হয়। নেশা ততটা আর নেই। কিন্তু মনটা কেমন করছে। আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠছে। বাগানপাড়া গেলে গায়ে চাকা-চাকা ঘা হবে? অনুশোচনায় তার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। হাটুয়া—ওই শালা ভালুকের মতো গতন শুওরের মতো নাক আর মুখ—ওই শালাকে কাল মাঠে গিয়ে পুঁতে ফেলবেই ফেলবে।...

ছোকড়িটা বৃষ্টির মধ্যেই দুজনকে ঠেলে বের করে দিয়েছিল কি? এতোয়ারি হঠাৎ ধাঁধায় পড়ে যায়। নাকি হাটুয়া তাকে ঠেলে দিল? মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে দুজনে অনেক কষ্টে নাটমন্দিরের আটচালায় ঢুকে পড়েছিল। তারপর?

—হুঁ। তারপর এক সময় এতোয়ারি উঠে পড়ল। কোথায় শুয়ে আছে সে? হাটুয়াকে ডাকল। ওর সাড়া নেই। তারপর কেমন করে জেলখানার পাচিলের পাশ দিয়ে কলেজ আর গীর্জা ছাড়িয়ে নিষাদবাগের রাস্তা ধরেছে, কে জানে? ঠাকুরবাবা দয়া না করলে এমন হয় না। শরতদাদা ভি এসে পড়ল হঠাৎ। নয়তো রাস্তা ভুলে মহুলার দিকে চলে যেত।

ফোঁসফোঁস করে নাক ঝাড়ে এতোয়ারি। মনে মনে ঠাকুরবাবার উদ্দেশ্যে মাথা কোটে। রক্ষা করো বাবা! হাম এক নাদান ছোকড়া। হামি তোমার থানে কুমড়ো দেব। ভারিভুরির জন্যে দেব দুসের মাসকলাই আর একছড়ি পাকা কলা। হামার যেন ঘা ফোট না হয় ঠাকুরবাবা! হেই গে বহিন ভারি ঔর ভুরি! বাগান-পাড়ায় যাবার সময় হামার ভার থালি ছিল, তোরা ছিলিস না গে! এ বাতঠো তো বলবি ঠাকুরবাবাকে।

এভাবে তৈরী হয়ে এতোয়ারি বাড়ি ঢোকে। দাওয়ায় মিটমিটে লম্ফ জ্বলছে জাঁতার আড়ালে। মা শুয়ে আছে একা। এতোয়ারি ঠাহর করে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। দাওয়ার কাছে গিয়ে সাবধানে ডাকে,—মা! মা গে!

—বেটা! সরস্বতী হুড়মুড় করে উঠে। কাঁহা ছিলি বেটা? ঝড়জলের সময়?

—গাঁওমে।

বুড়ি লম্ফের দম বাড়িয়ে দেয়। বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারে।—বহু! বহু গে। সাড়া না পেয়ে ছোটিকেও ডাকে। ছোটির ঘুম দুনিয়া ওলটপালট হলেও ভাঙবার নয়। অতএব—বহু! এ্যাই বহু! ওগে রাজার বেটি রানী! ওগে আবাগী নিদওয়ালী।

এতোয়ারি অন্য রাতের মতো হুঁশিয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই শুতে পেলে বেঁচে যায়। সেও ডাকে—দরজাটা খুল না গে। লাথ মারকে তোড় দেখা!

দরজা খুলে যায় অবশেষে। এতোয়ারি মোষের মতো ঘরে ঢোকে! ফুলকলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বদ-গন্ধটা টের পেয়েছে। নাকে কাপড় ঢেকে বেরিয়ে আসে সে। শাশুড়ির অত খেয়াল নেই। দাওয়ার কোণায় সিকের তোলা হাঁড়ি নামাচ্ছে। ছেলে খাবে। কিন্তু এতোয়ারি জানায় ঘরের ভেতর থেকে—হাম খাকে আয়া। তু শো যা, মা। আর ছোটিকে লিয়ে যা! ছোটি! উঠ্ রী উঠ্। ছোটি ওঠে না দেখে সে অতবড় মেয়েটাকে দুহাতে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। দাঁড় করিয়ে দেয়। ছোটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সরস্বতী খুশি হয়ে ডাকে—ইধার আ বেটি মেরা পাশ। যাক গে, বেটা আজ বহুর পাশে শোবে। আজ খুব ঘুম হবে মায়ের।

দাওয়ায় ফুলকলিয়া নাকে কাপড় ঢাকা দিয়ে অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে তাজ্জব, আতঙ্কিত।

## ॥ আট ॥

যে মদ খায়, সেই তো মাতাল। ফুলকলিয়ার মাতালকে বড় ডর। ডর—আবার তীব্র আগ্রহও বরাবর। আবছা মনে পড়ে, মাস্তবর একবার তাড়ি খেয়ে বাড়ী ঢুকেছিল। ফুলকলিয়ার মা তো উনুন থেকে জলন্ত কাঠ বের করে মারতে গেল। ফুলকলিয়া খড়-কাটা খোপড়িতে সেঁধিয়ে থর থর কাঁপে। উঠোনে দাঁড়িয়ে মাস্তবর দুলছে আর হি হি করে হাসছে। ফুলকলিয়ার মা জলন্ত কাঠ তুলে শাসাচ্ছে। একরাত একদিন ফুলকলিয়া বাপের কাছ ঘেঁষেনি। তার বাবা—সেই চিরচেনা অমায়িক হাসিখুশি মোড়ল বাবাটা হঠাৎ কেমন করে অজান অচিন হয়ে পড়েছিল, ভাবতে অবাক লাগে! পরে শুনেছিল কোথায় কোন বাবুর পাল্লায় পড়ে একটুখানি খেয়ে ফেলেছিল মাস্তবর—স্রিফ্ বাবুকা খাতিরসে। ব্যস, ওতেই নেশার চূড়ান্ত। মুখিয়া মানুষের পক্ষে এটা বদনাম বইকি। তারপর থেকে আর কখনও বাবাকে নেশা গিলতে দেখেনি ফুলকলিয়া।

সেই রাতটা কীভাবে যাবে, মাতাল একটা লোকের পাশে শোয়া! এতোয়ারি কাদা মাখানো ধুতি জামা গেঞ্জি পটাপট খুলে লুঙ্গি পরে নিল। তারপর কেমন হেসে ডাকল বউকে।—ত্থাথ তো রী! হামার গায়ে কোথাও ঘা-ফোট নিকলাছে নাকি! ফুলকলিয়া পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার দুই তিন ডাকলে যেতেই হল। এতোয়ারির মুখের হাসিটা করুণ। আর কী যেন ছটফটানি ভাব।—ত্থাথ রী! লম্ফ তুলে পিঠটা ত্থাথ। এতোয়ারি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। অগত্যা লম্ফ তুলে ফুলকলিয়া পিঠ দেখার ছলে হিসহিস করে উঠল।—তুমি মদ পিয়েছ জী?

—হাঁ। পিয়েছি। তো তোরই বা কী তাতে, তোর বাবারই বা কী? পিয়েছি—হামি পিয়েছি। তোর বাবার কাছে তো হাত পাততে যাইনি! তোকে যা বলছি, তাই কর।

ফুলকুলিয়া লম্ফ রেখে ফের হিসহিস করে উঠল।—মাতালের কাছে আমার নিদ হবে না। আমি শাসকে বলে দিচ্ছি, তোমার বেটা দারু পিয়েছে!

—ক্যা? দারু? এতোয়ারি হেসে উঠল। তারপর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গান জুড়ে দিল। 'ঢাকো ঢাকো সঁইয়া', পিও পিও দারু, চমচমাচম চম··। বাগানপাড়ার প্রসিদ্ধ গীত।

দাওয়ায় পাটকাঠির বেড়াঘেরা ঘুপটি জায়গাটায় সরস্বতী বেটার ব্যাপার-স্থাপার দেখে ছোটিকে চিমটি কেটেছিল—ছোটি পরে সেটা বলেছে বহুদিদিরে। বুড়ি কিছু ধরতেই পারেনি। বহু বেটার মিলন হচ্ছে ভেবে তার নাকি প্রবল ছটফটানি।

ফুলকলিয়ার নাকে তখনও আঁচল ঢাকা। এতোয়ারিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখছিল। একি সেই ঝিমধরা চুপচাপ থাকা মানুষটা? দাঁত বের করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর আর কথা নেই। একটু পরে নাক ডাকতে লাগল। তখন উঠে দরজায় খিল দিয়ে ফুলকলিয়া বিছানা থেকে দূরে মেঝেয় একটা চট বিছিয়ে শুল। ফুঁ দিয়ে লম্ফ নিভিয়ে দিল। ঘরে উৎকট গন্ধ। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সে অন্ধকারে সেই রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতোয়ারির বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল। নাক ডাকা থামলেই সে চমকে উঠছিল। এই বুঝি মাতাল লোকটা তাকে ডাকবে। কে বলতে পারে অন্ধকারে তার বুকে আচানক চেপে গলা টিপে ধরবে না! আতঙ্কে দুঃখে ফুলকলিয়া কীভাবে রাতটা কাটাল, কেউ জানবেনা। যদি জানে, সে ওই ঠাকুরবাবা আর তার দুই মেয়ে ভারি ভুরি। ফুলকলিয়া সারারাত তাদের প্রতি করুণ প্রার্থনা করেছে। মেঘ সরে তখন আকাশে যে সব নক্ষত্র ঝিকমিক করছিল তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল তিনটি নক্ষত্র থেকে ঠাকুরবাবা, ভারি আর ভুরি ফুলকলিয়াকে দেখছিল—সে টের পেয়েছে।

ওদিকে নয়ানসুখের ভাগ্নে রাতে বাড়ী ফেরেনি। নয়ানসুখ বারোয়ারি লণ্ঠনটি জেলে রাতদুপুরে এতোয়ারির বাড়ি এসেছিল। ডাকাডাকি করতেই সরস্বতী বেজার হয়ে বলেছে—এতোয়ারি এখন উঠবে না। পোঁহাতকালে এসে যা শুধোবার শুধিও। নয়ানসুখ ক্রুদ্ধ হয়ে গজগজ করে গেছে। তার উৎকণ্ঠা ভাগ্নের জন্যে নয়। আনাজ খন্দ বেচা টাকাকড়ি সঙ্গে আছে। রোজই তো নয় ছয় করে আসছে। রোজই নাকি টাউন হয়ে বাড়ি ফিরছে। নিজের ছেলে হলে নয়ানসুখ মেরে হাড় ভেঙে দিত। মারধোর করলে লোকে বলবে ভাগ্নে তো? তাই সইতে পারছে না। বলবে নয়ানসুখের কাঁধে ভারবাওয়া থেকে ছোঁড়াটা নিষ্কৃতি দিয়েছে। অথচ তার ওপর অত্যাচার! অতএব নয়ানসুখের হাতমুখ বন্ধ—বিশেষ করে মুখিয়ার ডাকের লোক সে। বদনাম দিলেই হল। তার ওপর মুখিয়ারও বড় পক্ষপাত ওর ওপর। নয়ানসুখ মরে গেলে হাটুয়া যে ডাকের লোক হবে, সবাই জানে। ওদিকে ঘাটোয়ারী চৌবেলালজী তো সেদিন সবার সামনে বলে গেলেন—ওকে আমার খুব পছন্দ। সুতরাং হাটুয়ার কিছু গুণ আছে, অস্বীকার করার উপায় নেই।

নয়ানসুখেরও সে-রাতে ঘুমটা বরবাদ। ভোরবেলা সে আবার হাজির হয়েছে। তখনও এতোয়ারি বেদম ঘুমোচ্ছে। ফুলকলিয়ার ওঠা অভ্যাস ঘোরানি থাকতেই। ছোটিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে সারতে যায়। তারপর দহের ঘাট থেকে মুখ ধুয়ে বাড়ি ফেরে। আজ ফুলকলিয়াও ঘুমোচ্ছে। অগত্যা নয়ানসুখ সরস্বতীর কাছে বসল। সরস্বতী সারাদিনে বার তিনেক হুঁকো খায়। এখন তার হুঁকো খাবার সময়। আগুন পাবে কোথায়? নয়ানসুখের কাছে মেচবাত্তি থাকবেই সে জানে। সে কারণে এক গাল হেসে বসতে বলেছে। ছোটি পিচুটিপড়া চোখে ঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝেমাঝে কপাটের জোড়ে মুখ রেখে ডাকছে—বহুদিদি গে! ও বহুদিদি!

সরস্বতী দাওয়ার চুলোটা ধরাতে ব্যস্ত হয়েছে। উঠোনের জল শুকিয়েছে, কিন্তু কাদাভাবটি ঘোচেনি। বৃষ্টি জোর হয়ে গেছে বটে। উঠোনের চুলোর একটা ঝিঁক ধসে গেছে। শিরিসের ভাঙা ডাল এসে পড়েছে এক টুকরো। উঠোনময় ছেঁড়া পাতা আর ডালের টুকরো ছড়ানো রয়েছে। ছাগলটা মহানন্দে চিবুচ্ছে। ঝড়টাও জোর হয়েছিল। পাটকাঠির বেড়া কয়েক জায়গায় নেতিয়ে গেছে। এতোয়ারি উঠুক। আজ আর গাঁওয়ালে নয়, এসব কাজ তো আছেই, তার ওপর মাঠে যাওয়া আছে। পাশের সবজি ক্ষেতের অবস্থা এখনও সরস্বতী দেখে আসেনি। হুঁকো না খেয়ে সে বেরুচ্ছেনা যত ক্ষতিই হোক।

—আমার দুতিনটে কলাগাছ ভেঙেছে। নয়ানসুখ জানায়। বুড়ির কলকের দিকে তার দৃষ্টি। মাটির হুঁকো বকবক শব্দ করছে। তোবড়ানো গালে এতোয়ারির মা হুঁকো টানছে আর জাল ঠেলছে। স্ত্রীলোকের হুঁকোয় তো মুখ দেওয়া যায় না। নয়ানসুখ কলকে টানবে।—ঔর এক মাচা করেলা ছিল, বহিন। মাথা মুচড়ে গেছে। অনেক কাজ পড়ে গেল।

—তোমার বেটিরা আছে। এত ভাবনা কিসের গে?

—তা পার বলতে। নয়ানসুখ হাসে। এতক্ষণ কোমরে আঁচল জড়িয়ে তিন বহিন কাজে লেগেছে বই কি!

—হাঁ গে নয়ানসুখ দাদা! অকলার দুসরা বিভা লেগেছিল—সাচ না ঝুট?

নয়ানসুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—ছোড় দে রী বহিন! গাঁওকা কুত্তা যেইসা খামাকা চিল্লায়, এ হল ওেইসা! অকলা তো কেঁদে কেটে খুন সেই থেকে। ফিরে থেয়ে বলছে—আমার বাবা বেঁচে আছে না বটতলায় গেছে? বাবা থাকতে বিভা নিজে ঠিক করব কাহে গে?

—হাঁ। আপনা জাত ছোড়কে।

সরস্বতীর অস্ফুট মন্তব্যে নয়ানসুখ জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভাব গোপন করে এতোয়ারির দরজার দিকে তাকায়।—ছোটী, ডাক না মা। সুরযের ছটা দেখা যাচ্ছে। কেত্তা বেলা বেড়ে গেল!

বুড়ি এবার কলকে এগিয়ে দেয়।

—লো জী!

নয়ানসুখ দু'হাতে ধরে বারকতক টেনে ফেরত দেয়।—হাঁ রী বহিন! এতোয়ারি রাতমে হাটুয়ার কথা কিছু বলেনি?

—নাঃ!

দরজা খুলে ফুলকলিয়া হাই তুলতে তুলতে বেরোয়। মুখটা গম্ভীর। ছোটির চোখের হাসিটা তার অশ্লীল লাগে। এতটুকু মেয়ে! ন্যাকামি দেখ না। নিঃশব্দে ছোটির কাঁধ থামচে দাওয়া থেকে নামে। বেরিয়ে যায়। সরস্বতীর ঠোঁটে হাসি খেলা করে তাই দেখে। ফিসফিস করে বলে—তোমাকেই বলছি, দাদা। রাত থেকে বহু আর বেটা মিলে গেছে। আর নিবাদবাগওলারা কী বদনাম রটাবে? সবার মুখে বাসিচুলোর ছাই পড়ল কি না বলো।

নয়ানসুখ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে যায় ঘরের দরজায়। তার আর ধৈর্য ধরে না। —এতোয়ারি! আই এতোয়ারি! বেটা, উঠ, উঠ যা। অনেক বেলা হয়ে গেল।

ডাকাডাকিতে সাড়া না পেয়ে নয়ানসুখ ভেতরে ঢোকে। এতোয়ারির গায়ে হাত রেখে ঠেলে। আবার ডাকে।

—উঁ! কৌন রে?

—আমি নয়ানসুখ রে এতোয়ারি বেটা!

—হাঁ।

—বেটা! হাটুয়া এখনও বাড়ি ফিরল না? কোথায় সে?

—উঁ?…বলে এতোয়ারি হুড়মুড় করে উঠে বসে। একটু হাসে—যেন নয়ানসুখকে দেখে লজ্জা পেয়েছে।

হাটুয়াকে কোথায় ছেড়ে এলি বেটা এতোয়ারি?

—হাটুয়া? এতোয়ারি একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে—বৃষ্টির সময় নাটমন্দিরে ঢুকেছিলাম। হাটুয়া এল না। আমি চলে এলাম।

—নাটমন্দির! টাউনমে?

—হাঁ জা।

নয়ানসুখ একটু আশ্বস্ত হয়। আবার উদ্বিগ্নও। ভাগ্নের কাছে পয়সাকড়ি আছে। চোট্টারা মেরে দেয়নি তো? ওর যা ঘুম! আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে সে।

বারোয়ারিতলার কাছাকাছি গিয়ে নয়ানসুখ দেখে চঞ্চলা আসছে। —বাবা! বাবা! তোমার গুণের ভাগ্নে বাড়ি ফিরেছে!

নয়ানসুখ বলে—তা তুই হাঁফাচ্ছিস কেন?

দশ এগারো বছরের চঞ্চলা চোখ বড়ো করে বলে—হাটুয়া দাদা বাড়ি ঢুকেই জোর কান্নাকাটি করছে।

—কাহে? হুয়া ক্যা?

—যাকে পুছো না! …নয়ানসুখের পাশে-পাশে চঞ্চলা হাঁটে। নয়ানসুখ হন্তদন্ত হয়ে যেন ছুটছে। চঞ্চলা ফের জানায়—তার ওর ঝুড়ি, তারাজু, উসকা জামা সব ছিনে লিয়েছে ডাকু।

—ক্যা?

—চলো না! উসকো মারপিট দিয়েছে!

নয়ানসুখ আর্তনাদ করে উঠে। —মেরেছে হাটুয়াকে?

—হাঁ। খুন নিকলেছে দো জায়গায়।

চঞ্চলা কনুইয়ের কাছে এবং কপাল দেখায়। নয়ানসুখ এবার দৌড়তে থাকে।

নিষাদবাগে—শুধু নিষাদবাগ কেন এ জেলায় ভাগীরথীর দু'ধারে যত চাঁই-সম্প্রদায়ের বসতি আছে, সবখানেই এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। ঠাকুরবাবার

দুনিয়াটা হরেক আজব মানুষে ভরা। ভাল আছে, মন্দভি আছে। মন্দের গায়ের জোর সব সময় বেশি। হাট-বাজার বা গাঁওয়ালফেরা গরীব মানুষটির যা দু'পাঁচ টাকা সম্বল, একলা পেলে কেড়ে নেবার লোকের অভাব নেই। তাই পারতপক্ষে একাদোকা যেতে নেই। বোকা না হলে কেউ যাবেও না—কিংবা কোথাও অজানা জায়গায় রাত কাটাবেও না। ধনপতির মতো লোক—কাটোয়া ষ্টেশনে একরাতে গুণ্ডা তাকে প্রায় ন্যাংটো করে ছেড়েছিল। ধনপতি আর জীবনে কাটোয়া-মুখো হয়নি কি সাধে? গত বছর জীবন্তীর মাঠে সন্ধ্যাবেলা পাঁচ-পাঁচজন নিষাদ-বাগওয়ালীকে তিনচারজন মন্দলোক ঘিরে ধরেছিল। কী সাহস! জানেনা, এসবমেয়ে দরকার হলে বাঘিনী হয়ে ঘাড় মটকে খুন পিয়ে নেয়। কুমড়ো কাটার জন্যে হেঁসো ছিল মালতীর। একা মালতী ওদের ভাগিয়ে দিলো। শুধু ভাগিয়ে নয়, কাঁধে হাতে এলোপাথারি কোপ বসিয়ে। তারপর কিছু দিন ওপথে সবাই যাওয়া বন্ধ করল। তখন জীবন্তীর হাট একেবারে কানা। এদের মধ্যে এই একজোট হবার ক্ষমতা এখনও ঠাকুরবাবার কৃপায় আছে। জীবন্তীর বাবুরা বাধ্য হয়ে পঞ্চগেরামী করলেন। মুখিয়ারা গেল। মিটমাট হল। চোট খাওয়া ডাকুদের ধরে ফেলতে অসুবিধে হল না। মহুলার দশরথ বাবুদের সামনে হাত মুখ নেড়ে বলেছিল—আমাদের জন্যে পাহারা বসাতে বলছিলেন বাবু মশাইরা। শুধু হুকুম দেন, রাস্তা আটকে দাঁড়ালে আমাদের ছোকড়া-ছোকড়ীরা হেঁসোর কোপ ঝাড়বে। তখন যেন উল্টে আমাদের জেল খাটাবার চেষ্টা করবেন না।

নয়ানসুখ বাড়ি ঢুকেই যেন সব জোর ফুরিয়ে ফেলল। দাওয়ায় হাটুয়া বসে আছে খালি গায়ে। কপালে একটু কাটা দাগ। মুখটা কালো। চোখদুটো লাল। মামাকে দেখেই হাঁউমাউ করে ওঠে সে। সে কী কান্না! অতবড় জোয়ান ছেলের হেঁড়ে গলায় কান্না বিচ্ছিরি লাগে। নয়ানসুখ ধরা গলায় বলে—থাম, থাম্। চুপ যা বেটা। যা হবার হয়েছে—কেঁদে কী হবে এখন? কেত্তা পয়সা থা তেরা পাশ, তাই বল্।

—সাড়ে তিন রুপেয়া। এক আধুলি, তিন একটাকিয়া নোট।

—সব লে লিয়া?

—হাঁ।

—নাটমন্দিরমে?

—নাটমন্দিরমে। শালা এতোয়ারির জন্যে এমন হল গে মামা! ওই শালা বলল, এখানে শুত যা। রাস্তায় জলকাদা হবে। আঁধার ভি হবে। পৌঁহাতে উঠে চলে যাব।

—তারপর কিনা সরস্বতীয়ায় বেটা চলে এল তোকে ফেলে ?

—হাঁ। হাম তখন নিদমে শুত করে আছে। শালা ভাগ গেছে কখন !

নয়ানসুখের বড় মেয়ে অঞ্জলা মাচানের কাছ থেকে মন্তব্য করে—কোন পিয়া হাটুয়া তো দেখা নেহি গে। এতোয়ারিভি লিতে পারে।

হাটুয়া বলে—এতোয়ারি নেয় নি। বাজে কথা ব'লস না রী দিদি।

নয়ানসুখ বলে—তো তোকে মার দেইলা কৌন ?

—মার দেইলা তো পোঁহাতেমে।

—কৌন ?

—লাটমন্দিরের লোক। বললে, তুই বেট' ছোটা জাত হয়ে এখানে শুয়ে আছিস কেন ? খুব ঝামেলা বাধল। ছোটা জ ত বললে শুনব কেন, বলো না মামা ?

—হুঁ। তব ?

—শালারা মার দিল থামোকা এই দেখ না

—ভার ঝুড়ি, তেরা জামা কেড়ে ভি লিলে ?

—না জী। উও সব তো রাতমে চোরে লিয়ে পালিয়েছে।

নয়ানসুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ছোড দে বেটা। আর কভি টাউন হয়ে বাড়ি ফিরিস না। হাঁ রে। খাওয়া দাওয়া ?

হাটুয়া ফের কাঁদবার জন্যে প্রকাণ্ড হাঁ করতেই মেজবোন সঞ্জলা বলে—বাসি ভাত আছে। কলাইয়ের ছাতু আছে।

অঞ্জলা বলে —আগে নাহান করে আয় গে। কোন গুয়ে-মুতে শুয়ে ছিলিস !

তা আর বলতে ? হাটুয়া উঠে পড়ে। বলে—জেরা তেল দে রী সঞ্জলা।

বেলা বাড়ালে এতোয়ারি গেছে মাঠে। তিনকাঠা পাট, দুকাঠায় তিল আছে। বৃষ্টিতে রাতারাতি চেকনাই ফুটেছে। মাঠ থেকে বাঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচে ওর পটলক্ষেত গঙ্গার ঢালু পাড়ে। এখন কদিন জল বওয়ার হাত থেকে ছাড়ান পেল। ক্ষেতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মড়ার মাথাটা খোঁজে সে। ঝড়ের চোটে বাঁশটা কাত হয়ে পড়ে গেছে। মাথাটা খুঁজে বের করে সে। বাঁশটা সোজা করে মাথাটা বসিয়ে দেয়। তারপর কাঁটার বেড়া গলিয়ে নিচে নেমে যায়। দহের জলে দু হাত কচলে ধুয়ে কিছুক্ষণ উজ্জল রোদে নিজের শরীর খুঁটিয়ে দেখে। জাংয়ে একটা ফুস্কুড়ি দেখেই সে শিউরে ওঠে। বারবার নখে টেপাটিপি করে। শরীরের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে যেন। জাং দুটো ওজনদার হয়ে গেছে। সে

সন্দেহাকুল দৃষ্টে ফুস্থুড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চাহনি ভয়ার্ত। একটু পরে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে দহের কিনারা দিয়ে গাঁয়ের দিকে হাঁটতে থাকে। সামনে ঘাট। ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে। থালা হাঁড়ি মাজছে। কলকলাচ্ছে পাখির ঝাঁকের মতো। ঘাট এড়িয়ে সে ওপরে উঠে যায়। ভরতের বেগুনক্ষেত আর ধনপত্তির কুমড়োক্ষেতের মাঝামাঝি সরু আলে গিয়ে চোখ পড়ে একটু তফাতে হিজলগাছের দিকে। ঝড়ে একটা ডাল ভেঙে ঝুলছে। সেই ডাল ধরে হনুমানের মতো লাফাচ্ছে নয়ানসুখের বেটি অঞ্জলা। এতোয়ারি ফুস্থুড়ির কথা ভুলে আনমনা হয়। বাগানপাড়ায় না গেলেও তার চলত। অঞ্জলার সঙ্গে ভাব জমালেই ভাল ছিল। শরীরের ক্ষিদে মিটানো নিয়ে কথা! হুঁ— কাচ্চাবাচ্চা পেটে আসার একটা ঝামেলা আছে। এলে আসত। বরং অঞ্জলাকে বিভা করে নিত। দুই বহু থাকতো ঘরে। আপশোসে এতোয়ারির বুকে দুখ বাজে।

—এতোয়ারিদা! ও এতোয়ারিদা!

অঞ্জলা দেখতে পেয়ে ডাকছে। ওর তো এত লজ্জাশরম নেই—এই যা খারাপ লাগে। এতোয়ারি তামাশা করে বলে—হনুমানের মতো গাছে উঠেছিস কেন রী?

—এ দাদা! ডালঠো নিচেমে টেনে ধর না দাদা! আর দাদা গে!

এতোয়ারি অগত্যা যায়। অঞ্জলা ওপরে, সে নিচে। বেহায়া মেয়েটা কাপড় সামলায় না তলায় লোক দেখেও। এতোয়ারির তাই বলে লজ্জাশরম আছে। সে তাকায় না ওপর দিকে। অঞ্জলা পায়ের চাপ দিতে থাকে। সে ডালটা ধরে জোরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ভেঙে পড়ে। অঞ্জলা কাঠবেড়ালির মতো নেমে আসে। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ নাচিয়ে বলে—কাল রাতে হাটুয়াকে ফেলে এসেছিলে কোথা গে?

—নাটমন্দিরে। ওর যা নিদ। ডাকলাম—উঠল না।

—এসে জোর বেঁচে গেছ! হাটুয়ার সবকুছ কেড়ে লিয়েছে ডাকুরা। পৌঁহাতে নাটমন্দিরওয়ালা ওকে মার ভি দিয়েছে!

—এ্যায়সা?

—হাঁ। তো হাটুয়া তোমার ওপর খুব রেগেছে!

—কাহে?

অঞ্জলা চোখ নাচিয়ে কেমন হাসে।—উও বাত ছোড়। কাল রাতমে বহুকী পাশ শুত্‌ করেছ। তাই না গে? খুউব মজা উড়ায়া! খু-উব ফায়দা উঠায়া শশুরের বেটির ওপর।

—ভাগ রী!

—হাঁ, হাঁ সবাই শুনেছে। তো বাতাও,...

—কী বাতাব?

—ক্যায়সা হুয়া?

—কী হবে? অঞ্চলা, তুই খুব ফাজিল মেয়ে রী! · এতোয়ারি বিরক্ত হয়ে পা বাড়ায়। তোর ভকতরামের সঙ্গে বিভা হচ্ছে না কেন? হলে সেই ভাল ছিল।

—কা বোলা? শুনো—শুনো! কা বোলা?

এতোয়ারি একটু ঘাবড়ে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে—হামি আপনা কানসে শুনেছে। বহুত দিন আগে ওই থানটায় শরতদার বহুর সঙ্গে তোমার বাত হচ্ছিল। বোলো, হাম ঝুট বলছে?

শরতের বউয়ের নামে অশ্লীল গাল দিয়ে অঞ্চলা চোখ মোছে। এতোয়ারি অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। অঞ্চলা ফুঁসতে ফুঁসতে বলে—নির্মলার চুল পাকড়ে হামি মার লাগাব, দেখে লিও। ও হামাকে লোভ দেখায়। গহনা দেখায়। ভকতরাম না ঘোড়ারামের মুখে হামি·· আবার অশ্লীল কথা বলে ওঠে অঞ্চলা।

এতোয়ারি হাসতে হাসতে বলে—আমি ভাবতাম, তোমার ভি সায় আছে।

অঞ্চলা হিসহিস করে বলে—না। তারপর দ্রুত এদিকওদিক তাকিয়ে নেয়। ফিসফিস করে বলে—সাঁঝমে শিমুলতলায় আসতে পারবে এতোয়ারিদাদা?

—কাহে?

—তোমাকে একঠি বাত বলব। জরুরী বাত।

—আভি বোলো।

—না জী। বাত অনেক লম্বা। সময় লাগবে তো এতোয়ারিদাদা!

এতোয়ারি একটু ভেবে বলে—আচ্ছা। তারপর তক্ষুণি হনহন করে চলে যায় বাঁধের দিকে। আর পিছু ফেরে না একবারও। বাঁধে গিয়ে দেখে, উত্তরে বাঁধের নিচে গাঁয়ের বারোয়ারিতলায় ঘাটোয়ারি বাবু দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেলও আছে সঙ্গে। গাঁওবালাদের ভিড় জমেছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে। চৌবেলালজী না এসে পারে? এতোয়ারির বিয়ের সময় ধার ছিল তিরিশ টাকা। ইদানীং আরো ধার হয়েছে তিরিশ টাকা। তার মানে তিনকুড়ি। তার ওপর দেড়কুড়ি সুদ না দিয়ে পার নেই। এতোয়ারি বাঁধের ধারে ঝোপের আড়াল দিয়ে পূবের মাঠে নামে।

পূব-উত্তর কোণে আমবাগানের দিকে হেঁটে যায় সে। ল্যাংড়া রঘুয়ার সঙ্গে দেখা করার মতলব আছে। আজ পৌঁহাতকালে নয়ানসুখ গিয়ে তাকে ওঠাবার পরই আচানক ল্যাংড়া রঘুয়ার কথা মাথায় এসেছিল। এ তো আর জর-জারি

সর্দি-'খাসি' ভাগদারি বেমারী নয়। এ এক আজীব কারবার। কাহে আজীব? না—এ তোমার খারাপ কাজের জন্যে ঠাকুরবাবার জরিমানা। তুমি অজান-অচিন ভিনজাতের সঙ্গে 'আঙে আঙ' অঙ্গে অঙ্গ) মিশিয়ে খেল করেছ এ খেল বহুৎ বুরা খেল। নিষিদ্ধ খেলা। আর শুধু ঠাকুরবাবা কেন, ভারি-ভুরিও খুব রেগে গেছে। কাল রাতে গাঁয়ে ঢোকার মুখে গঙ্গার ধারে ঢ্যাঙা শিমুল গাছটা থেকে জোড়া পেঁচার ডাক শুনতে পেয়েছিল না এতোয়ারি? এতোয়ারি ভোলে নি, তার যখন বিয়ের কথা বলতে মা, নয়ানসুখ, ভরত আর কানাইয়া ওপারে কলাবেড়িয়া গিয়েছিল, একপহর রাততক ফিরল না দেখে সে শিমুলতলায় গিয়ে দাঁড়াতেই জোড়া প্যাঁচার ডাক শুনেছিল। এসবের মানে ল্যাংড়া ওস্তাদ ছাড়া আর কে বলতে পারবে? তারপর ধনপতির বেটির বিভার রাতে শুওরের স্বপ্ন। স্বপ্নের কথাটা ভেতরে চাপা ছিল এতদিন। সেদিন শুওর নদীর মাঝবরাবর এসে বাড়ি ঢুকে যা করে গেছে, তাতে স্বপ্নের ব্যাপারটা অবিকল ফলে গেল। মাস্তবরই সেই স্বপ্নের শুওর।

ল্যাংড়া ওস্তাদের কাছে এসব চুপা কথা মন খুলে বলতেই হবে। তবে যা হওয়াটা রুখতে হলে বাগানপাড়ার কথাটাও যে বলতে হবে! এতোয়ারি মুষড়ে পড়ে। রঘুয়ার চোখের সামনে মিছে কথা বলা অসম্ভব। সব ধরে ফেলবে। এতোয়ারির শরীর অবশ লাগে। জাং দুটো আবার ভারি লাগে। আমবাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে এতোয়ারি এত বেখেয়াল হয় যে পায়ের কাছে একটা পাকা আম সে দেখতেও পায় না। শুধু পায়ের কাছে কেন, কালকের ঝড়ে বাগানের আম পড়ে ছিল অনেক, আর সব আম কুড়োন হয়নি এখনও। এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বাগানটার মালিক ভরত। আমগুলোর ওপর টাকা খেয়েছে শরতের। শরত নিজেও ছোট-খাট দাদন দেয় আজকাল। এতোয়ারি অন্য সময় হলে চেঁচিয়ে নির্মলাকে ডাকত। এখন হুঁশ নেই। বাগানের পর নিচু ভুট্টার ক্ষেতের আল দিয়ে জঙ্গলে ঢোকে সে। ঘন জঙ্গল বটে! বেত আশশেওড়া কেয়া কুল বৈঁচির জটপাকানো অবস্থা। তার মধ্যে সব হিজল ভাঁড়ুলে আর কামরাঙা গাছ। একসময় বাঘ ডাকত নিষাদবাগের জঙ্গলে। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক ফালি হাঁটা পথ। তার শেষে 'হাড় মুটমুটির' নালা। এক প্রেতিনী থাকে ওখানে—চলতে যার পায়ের হাড় মুট মুট করে আওয়াজ দেয়। নালার ওপারে ল্যাংড়া রঘুয়ার বাড়ি। গাঁয়ের পথে এলে তো রশিভর রাস্তা। চৌবেলালজী এতখানি ঘুরিয়ে মারলেন বেচারা এতোয়ারিকে।

ছেলেবেলা থেকেই এই বাড়িটার প্রতি এতোয়ারির ভয়-চমক আছে। কার বা নেই? রঘুয়া সন্ধ্যাবেলা উঠোনে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাড় মুটমুটি প্রেতনীর সঙ্গে

গপগপ করে, সবাই দেখেছে। বর্ষায় যখন এই নালা দিয়ে ভাগীরথীর জল ঢোকে, গাঁয়ের উত্তরে শহর থেকে আসা বাঁধের সাঁকোতে জাল ফেলে মাছ ধরে জেলেরা। তারা তিন গাঁয়ের লোক। সরকারের কাছে ইজারা নেয়। কিন্তু যা মাছ ধরার, দিনেই ধরে। রাতের সব মাছ হাড় মুটমুট নিয়ে পালায়। পুবের বিলে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে মচমচ করে কাঁটাসুদ্ধ খায়। আর যাবার সময় রঘুয়াকে তো দু চারটে ছুঁড়ে দিয়ে যাবেই। এখন খাল বিলকুল শুখা। কালকের এত বৃষ্টি কোথায় গেল কে জানে! শুধু গরু মোষের পাওটে খাবলা খাবলা জল জমে আছে। শরতের মা যমুনাকানী খালের ওপর দিকে ছাগলের খুঁটি পুঁতছে। কানী হয়েও এ ক্ষমতা তার আছে। আরও আছে ভাইপো রঘুয়ার মতো কিছু অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার। যত চুপা হয়ে যাও, সে টের পেয়ে যাবে। এতোয়ারি খাল পেরিয়ে পাড়ে উঠতেই আওয়াজ দেয় বুড়ি—কৌন গে?

—হামি এতোয়ারি, পিসি।

—হাঁ। সরস্বতীয়ার বেটা তুই।

—রঘুয়া দাদার কাছে যাচ্ছি, পিসি।

বুড়ির মুখ ফেড়ে লম্বাটে হাসি রোদ্দুরে ঝকমক করে বেরিয়ে পড়ে।—হাঁ। কাল তেরা মা এসেছিল। পঞ্চুভি এসেছিল। তার আগেও ভি এসেছিল। যা যা। রঘুয়া ঘরমে বৈঠা আছে।

—হাস গেইলা কাহে গে পিসি?

—এক বাত শুন বেটা। হামার কাছে আয়। আয়, আয়।

এতোয়ারি অবাক হয়ে কাছে যায়।—বোলো পিসি।

—বেটা, তুই বুদ্ধু আছিস না কী আছিস?

—কাহে গে?

—বহু কাছ-লাগড়া করতে কি মন্তর লাগে, না তাবিজ লাগে, না জড়-বুট-আকড়-মাকড় লাগে? ক্যায়সা মরদ হি তু? কায়সা তেরা জোরভি? ছোঃ! ছোঃ!

বুড়ির মুখটা কুচ্ছিত দেখায়। সে থুথু ফেলে দুবার। এতোয়ারি রেগে গুম। সেই সময় ঝোপের ওধার থেকে ল্যাংড়ার মুণ্ডু উঁকি মারে।—আরেএতোয়ারি! ওখানে কী করছিস? এখানে চলে আয় বুড়বাক কাঁহেকা! আর পিসি! তোকে সাফ মানা করে দিচ্ছি, হামার কাছে কেউ এলে কথনো তাকে বুরা বাত বলবিনে, হাঁ!

যমুনাবুড়ি কাঁচুমাচু মুখে বলে—ও গে না, না। হামি কুছ বলিনি। পুছ করছিলাম কী…

—পুছ করবিনা।

—করবনা?

—না।

—বেশ। করব না···অভিমানে বুড়ি হেঁট হয়ে খুঁটিতে ভুরমুষ ঠুকতে থাকে।

খালের ধারে আওয়াজটা প্রতিধ্বনি তোলে খট খট খট খট। রঘুয়ার মুণ্ডুতেই ভুরমুষ ঠুকছে, এতোয়ারির এমন লাগে।

বাড়িটা গাঁয়ের এক টেরে। ধারে কাছে আর কোন বাড়ি নেই। ক্ষেত আর জঙ্গল চারদিকে। উঠোনে একটা মস্তো গাবগাছ আছে। তার ডগায় একফালি লাল কাপড় উড়ছে। ল্যাংড়া ওস্তাদের নিশান। যদি পুছো, তুমি তো ঠ্যাংকাটা মানুষ, কে টাঙাল ওটা? রঘুয়া গম্ভীর হয়ে জবাব দেবে—তালবেতাল। ওর হাতে জোড়া প্রেত আছে- তাল, ঔর বেতাল। তবে ঘরদোর বেশ ঝকমকে তকতকে রঘুয়ার। পিপি কুঁড়ের হদ্দ। এতোয়ারি গিয়ে দেখে, ওস্তাদ পাছা ঘষ্‌টে-ঘষ্‌টে এতক্ষণ দাওয়া নিকোচ্ছিল। মেয়েদের মতো এসব কাজে সে পটু। উঠোনে কুটো পড়লে নজরে আসবে। দেয়ালে সাদা লাল নীল হলুদ, কত রঙের আজীব নকশা এঁকেছে। ওসব তার তন্তরের ব্যাপার। দেখতে ছবির মতো সুন্দর। নিচু চালটা মোলায়েম কাশখড়ের। এ থরাতেই ছাউনি দেওয়া হয়েছে। মহলার দশরথ ছ'পণ কাশখড় উপহার দিয়েছিল। বাড়ুই—যে চাল ছেয়ে দেয়, সে করলহাটির জাব্বর। রঘুয়ার কাছে সে ছোকরা মন্তর শিখছে। ফুঁ দিয়ে দুধ নীল করাটা সে শিখে নিয়েছে। তো রঘুয়া ওস্তাদের সবতাতেই ওস্তাদী হাতের ছাপ রয়েছে। পাশে কুল গাছের গা ঘেঁষে চালা আর গোয়াল ঘরও দেখার মতো। পাটকাঠির বেড়ার দেয়াল। তাতে মাটির লেপন দিয়ে মানুষ থাকার মতো চমৎকার করে তুলেছে। তবে গাই গরুটা মারা গেছে। নালার ওপারে জঙ্গলে সাপে ছুঁয়ে দিয়েছিল। পোয়াতি ছিল গাইটা। তালবেতাল বাঁচাতে পারে নি। থাক গে, সে অনেক দুখো কাণ্ডকারখানা। অলৌকিককে সব সময় বাগ মানাতে পারলে মানুষ তো দেওতা হয়ে যেত। তবে শরতের দেওয়া দুমরা ছাগলটা একা গোয়াল দখল করেছে।

রঘুয়া ঝটপট হাত ধুয়ে বলে—বইঠ্‌।

গাবগাছের ছায়ায় বসে পড়ে এতোয়রি। ফুস্‌ফুড়িতে আর কিসের ডর? সাহস রক্তে চনমন করে উঠেছে তার। তালপাতার চাটাই পেতে ছায়ার আরাম গায়ে সে আফশোসের ভঙ্গীতে বলে—সিগারেট ছিল জী ওস্তাদ! ঘরমে ফেলে এসেছি। পকিটমে।

—হামি তোকে সিগারেট খাওয়াচ্ছি। বোস্‌ না রে। রঘুয়া রান্নাশাল থেকে

হাসিমুখে জানায়। ওর ক্ষমতা আছে বটে। গামছার খুঁটে এনামেলের ছোট্ট হাঁড়ি নামাচ্ছে। আরে ব্বাস! কয়লার চুলা যে! পেতলের ঘটিতে দুধ। দুধ চুলায় চড়িয়ে রঘুয়া বলে—ইনজিলকা বয়লার যে এতোয়ারি!

—হাঁ কৈলা!

—হাঁ। শরতের বাড়ি থেকে লিয়ে আসি। শরতের কয়লার চুলা, তুই জানিস না?

ঘাড় নাড়ে এতোয়ারি। সে গাঁয়ের খবর রাখবে কখন? ভোরে বেরোয়, ফেরে রাতে। তাছাড়া কোন সাত-পাঁচ খবরদারিতে কান দেওয়ার অভ্যেস তো তার নেই। একটু পরে সে আবার বলে—বেফায়দা পয়সা খরচ কৈলামে। এত্তা জালানী থাকতে কৈলা কাহে জী?

রঘুয়া খ্যাক খ্যাক করে হাসে।—আভি সমঝে গেলাম কেন তোর বহু বশ হয় না। আবে এতোয়ারি, শুনি তুই বহুৎ টাউনবাজ হয়েছিস। এঁ্যা? তো টাউনে গিয়ে কী শিখলি?

এতোয়ারি গোমড়ামুখে বলে—হামি আর টাউনে যাবনা জী।

—কাহে?

এতোয়ারি চুপ। মুখ নামিয়ে পায়ের আঙুল খোটে।

—কাহে রে?

তারপরই রঘুয়া হা হা হা হা করে তার প্রসিদ্ধ ভুতুড়ে হাসিটা হাসে। এতোয়ারির বুক কাঁপে। এই হাসির সময় রঘুয়া একেবারে বদলে যায়। তরাস লাগে ওকে দেখে। এতোয়ারি তাকিয়েই মুখ নামায় ফের।

রঘুয়া হাসি থামিয়ে ডাকে—এ্যাই এতোয়ারি! চা লিয়ে যা। চা পিয়ে তারপর থানে বসব। আয় ধর। বহুৎ গরম আছে। যেন হাত পোড়াস না!

গাবতলায় একটা মাটির বেদী। তার ওপর ত্রিশূলের ডগায় মড়ার মাথা। সিঁদুরে দগদগে মাথাটা। বেদীটা একটু আগে নিকিয়েছে। ওখানে এক টুকরো ছেঁড়া কম্বল পেতে রঘুয়া বসলেই ভর উঠবে। সব ছুপা কথা সাফ-সাফ বলে দেবে। এতোয়ারি চা খাবে কী, দ্বিধায় পড়ে যায়। সে আড়চোখে বেদী, মড়ার মাথা তারপর রঘুয়াকে দেখতে থাকে। রঘুয়া গোঁফে ভিজিয়ে চা খাচ্ছে। জটা নড়ছে। খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িতে মুখটা কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। শেষঅব্দি এতোয়ারি মন ঠিক করে ফেলে। গোপন কথাগুলো বলবে। ফুস্কুড়িটা দেখাবে। কলাবেড়িয়ার মেয়েটার দিকে তার কিছুতেই টান বাজছে না—সেই বাসরের রাত থেকেই ওকে তার কেন পছন্দ হচ্ছে না এসবের কারণ জেনে নেবে। ওই সুরতওয়ালীর

গায়ে গা দিলেই সে কেমন বরফের মতো ঠাণ্ডা বনে যায়? মড়ার মতো লাগে শরীরটা। খালি মনে হয়, ও তাকে ঠকাচ্ছে। এতোয়ারি যেন ওর কাছে তামাসা—যেন খেলনা। এতোয়ারি যে পুরুষ—জোয়ান মরদ, ও যেন তা মানেই না। তাই এতোয়ারির মনেও টান বাজছে না এই তো? এতোয়ারি মনে মনে ভেবে বলে – হাঁ এহি বাত।…

সবে রঘুয়া চা শেষ করেছে, এতোয়ারির এখনও আধ গেলাস, ছোটির ডাক শোনা যায় কোথায়। ওর যা আওয়াজ! চেরা গলায় দাদাকে ডাকছে। রেলের ইনজিন।—দাদা! দা-আ-দা!

এতোয়ারি ঝটপট উঠে দাঁড়ায়! ডাকবার আর সময় পেল না। কিন্তু ওই ডাকে কী খবর আছে যেন। এতোয়ারি উঠোনের ধারে গিয়ে সাড়া দেয়—এই ছোটি! ছোটি রী!

পিনচারটে জমির ওধারে বাঁধে দাঁড়িয়ে ছোটি চেঁচাচ্ছে—দা-আ দা! দাদার সাড়া পেয়ে পটল বেগুন কুমড়োর ক্ষেত ডিঙিয়ে চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—ও দাদা! দাদাগে! জলদি ঘর চল। বহুদিদি ভেগেছে! বহুদিদি সুটবেশ লেকে ভেগেছে গে!

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে রঘুয়া হতভম্ব। এতোয়ারি ভাঙাগলায় থেমে থেমে শুধোয় – ক্যা?

॥ নয় ॥

হুঁঃ, কলাগেড়িয়ার বেটী ভেগেছে তো কী হয়েছে। এর জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদার কী আছে, এতোয়ারি যেন বুঝতে পারে না। মায়ের দিকে তেড়ে যায় সে। ছোটিকে থাপ্পড় তোলে। উঠোনে গাঁওবালাদের ভিড় হটিয়ে বলে—কিছু হয় নি। যে-যার কামে যাও না গে!

আর এদিনই কিনা ঘাটোয়ারিবাবুর আসবার সময় হল! গাঁওবালারা যাবে কোনদিকে? এতোয়ারির খবর নিতে আসবে, না চৌবেলালজীর সঙ্গে ঘুরবে? এদিন নিবাদবাগ ছেড়ে কেউ গাঁওয়ালে যায়নি। বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ে সব্জির বাগান তছনছ হয়েছে। বেলা যত বেড়েছে, চারদিকে তত লোক। চৌবেলালজী

মাঠ ঘুরতে গেছেন। খুশি হয়ে আবার গাঁয়ে ফিরেছেন। ধনপতির বাড়িতে চা খেয়েছেন। তারপর এতোয়ারির দরজায় সাইকেলের ঘন্টি বাজল। এতোয়ারি কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে হাসিমুখে বেরোয়। চৌবেলালজী জিভে চুকচুক আওয়াজ দিয়ে বলেন—এ ক্যায়সা বাত রে এতোয়ারি? মোড়লের বেটীর পাখা গজাল কেমন করে? রাতে মারধোর করেছিলি নাকি?

এতোয়ারি গম্ভীর হয়ে বলে—উসকী বাত ছোড় দো বাবু! যদি রূপেয়ার কথা তোলো, বলব—সামনে সপ্তায় গোকরুণ হাট থেকে ফেরার পথে দেখা করব।

চৌবেলালজী স্তম্ভিত। রাগ চেপে বলেন--আমাকে কী ভাবলি রে? আমি টাকার জন্যে তোর দুয়ারে এলাম? ঠিক আছে। যখন ভাবলি টাকার কথা তুলতে এলাম, তখন তাই।

সরস্বতী বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল। ছুটে বেরিয়ে হাউমাউ করে বলে—এ বাবু! এ লালজী! ওরে আমার জানের বেটা! ওর মাথা বিগড়ে গিয়েছে। ওর কথায় কান দিস্ না বাবা! আমি যা বলছি, তাই শোন্। লহরওয়ালী পটওয়ালী চপওয়ালীর কাণ্ডটা শোন্। চুট্রিনের বদমাইসির কথা শোন্।...

এরপর বুড়ি পাঁচমুখে একশো কথায় ঘটনাটা বলতে থাকে। মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। চৌবেলালজীর মুখে অবশ্য হাসি ফোটে। শেষমেশ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—হাঁ গে হাঁ। সব বুঝেছি। তো আমার কথা শোন্। মাজবরকে পুছ করে দেখি, এতোয়ারি গিয়ে তার বউকে আনবে, নাকি সে নিজে বেটীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখে যাবে।

এতোয়ারি প্রতিবাদ করে—আমি যাব? সুরয উধার উঠবে। সে আঙুল তুলে পশ্চিমের আকাশ দেখায়।

চৌবেলালজী হো-হো করে হাসেন। —তুই এত্তা রাগী ছিলিস না তো এতোয়ারি। আজকাল খুব মেজাজী হয়েছিস দেখছি।

সরস্বতী যুক্তি দেখায়। —মেজাজ হবে না জী? উন্নিশ ভরি গয়না গায়ে ছিল: সব নিয়ে ভেগেছে। বাপের বেটী যদি গেল ওগুলো রেখে তো গেল না। চুট্রিন! ডাহিন! ঝুটবাজ!

চৌবেলালজী থামিয়ে দেন আবার।—চুপ রী, চুপ্। আমি এতোয়ারির শ্বশুরকে বলব। তুই কিছু ভাবিস না। ও বেটী যদি নিষাদবাগের ভাত না খায়, জোর করার কী আছে? হাঁ—গহনা ফেরত দিতে হবে। এতোয়ারির দুসরা বিভার খরচ ভি দিতে হবে।

এতোয়ারি বাঁকা মুখে বলে—ছোড় জী! ফির বিভা?

এই সময় ধনপতি এল। নয়ানসুখও এল। অমনি সরস্বতী তাদের নিয়ে পড়ল —গাঁওপতির বুঝি এতক্ষণে নিদ টুটল? সেই পোঁহাতকাল থেকে এত হইচই হচ্ছে, কানে কি কালা হয়ে গেছে ধনপতিয়া? কেমন মোড়ল হয়েছে যে গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ের বেটী ভেগে যায়? গেছে যদি, এখনও কোন বিহিতই বা করছে না কেন?

ধনপতি বিব্রত। নয়ানসুখ তার প্রতিনিধি। সেই বলে—এই তো এসেছে গে! না এসে পারে? গাঁয়ের ইজ্জত নিয়ে কাণ্ড। নিষাদবাগওলা তো বুড়বাক নয়। এটা যে অপমান, সে কথা বোঝার বুদ্ধি আমাদের আছে।

ধনপতি সায় দিয়ে বলে—জরুর। তবে আগে এতোয়ারিকেই যেতে হবে। যদি বহু না আসে, তখন আমরা যাব। কী বলেন চৌবেলালজী?

চৌবেলালজী বলেন—ঠিক ঠিক। মুখিয়ার মত কথা।

সরস্বতী আশ্বস্ত হয়েছে। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখগুলো দেখছে। তারপর ঘুরে আচমকা চিলচিৎকার করে উঠে বেটার দিকে আঙুল তুলে বলে—এ বুদ্ধু ভড়ুয়াকে আর কী বলব গে? নিজের বহুকে বাগ মানাতে পারল না! ও আমার বেটী না বেটা গে? একটুও শরম হয় না গে ওর?

এতোয়ারি পাল্টা চেঁচায়—এ্যাই বুঢ়িয়া! তুই থামবি?

সরস্বতী দশের সাহসে চড় তুলে এগোয় ছেলের দিকে। নয়ানসুখ সামনে দাঁড়িয়ে বলে—বহিন! চুপ যা। এতোয়ারির কোন দোষ নেই। কলাবেড়িয়ার মেয়েরা বরাবর এমনি। চাঁদের বহু ঠিক এমনি করে ভেগেছিল, মনে পড়ছে না? সেই থেকে আমরা তো ঠিক করেছিলাম কখনও ও গাঁয়ের বেটী আনব না, লেকিন তোমার কথায় আবার যেতে হল। তো, তখনই আমার মনে হয়েছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মুখিয়াজী! সন্ধ্যেবেলা নদীর মাঝ বরাবর এসে তোমাকে বলিনি কথাটা? বলিনি, এ বেটী এতোয়ারির ভাত খাবে না? তুমি রেগে গেলে তাই শুনে।

এসব কথার কোন শেষ নেই। ছাতিম গাছের ছায়াটা সরতে সরতে এতোয়ারির দরজার সামনে কড়া রোদ এসে গেছে। চৌবেলালজীর টাক ফুটে ঘামের ফোঁটা নিকলেছে। ধনপতি গাছতলায় সরে গেছে। নয়নাসুখ খইনি ডলছে আর বকবক করে যাচ্ছে। সরস্বতীও থেমে নেই। এতোয়ারি বাড়ি ঢুকেছে একসময়। নিষাদবাগের দুপুরের রান্না শুরু হয়েছে। ছাতিমতলায় ক্রমে আড্ডা জমে উঠছে। দু'একজন করে এসে হাজির হচ্ছে আর আপন আপন মতামত জানাচ্ছে। চৌবেলালজী যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ এরকম হবেই। এতোয়ারির বহুর কথাটা কোথায় তলিয়ে যায় এবার।

এতোয়ারি ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ঘরটা এত ফাঁকা লাগছে কেন গে? ওইখানে বাঁশের বাতা দিয়ে বানানো বেঞ্চিমতো জায়গায় নীল রঙের ঝকমকে স্যুটকেশটা ছিল। এখন নেই। এতোয়ারির বিয়ের ধুতি আর জামাটা পড়ে আছে নীচে। বেঞ্চিটার তলায় আলু, পেঁয়াজ আর বালির মধ্যে আদা রাখা আছে। সেখানে একটা চুলের কাঁটা গিরে গেছে। কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে এতোয়ারির চমক লেগেছে।

দড়িতে এতোয়ারির জাঙ্গিয়া, ছেঁড়া লুঙ্গি আর গামছা ঝুলছে। আর একটাও শাড়ি নেই। তার তলায় কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকের ওপর সিঁদুরের দাগ জ্বলজ্বল করছে। সিন্দুকের ওপর দিকে তাক। তাকে আয়না কাঁখই আছে। হিমানীর কৌটোটা নেই। চুলের ফিতে নেই। আলতার শিশিও নেই। কী ভয়ঙ্কর শূন্যতা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে পালাল মান্যবরের বেটি! এতোয়ারি নিষ্পলক চোখে সব খুঁটিয়ে দেখে। যেখানে যাক, যা কিছু করুক মনের তলায় ছিল এই ঘরখানা। মেয়েলি জিনিসে ভরা, একটুকরো শক্ত মাটির মতো। শেষ আশ্রয়ের মতো। সেই ঘরটা এখন আর ঘর বলেই মনে হচ্ছে না। ঘরে ঢুকেই পেত একটা আবছা মেয়েলি ঘ্রাণ। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনীতে নাক ঠেকিয়ে শুকত এতোয়ারি। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আর কি পাবে?

ছোটি দাওয়ার উনুনে ভাত চড়িয়ে জাল ঠেলছে। দুচোখের তলায় কালি পড়ে গেছে। খুব কেঁদেছে মেয়েটা। এখনও চোখ মুছছে হাঁটুতে। ওগো বহু দিদি গে! বুক ফাটা কান্না কেঁদে এখন মেয়েটা ক্লান্ত। কলাবেড়িয়াওয়ালী এ কী করে গেল!

এতোয়ারি মাদুর টেনে শুয়ে পড়ে। সিগারেট ধরায়। চোখ বুজে টানতে থাকে।...

কতক্ষণ পরে হাড় মটমটানি শুনে সে টের পায় হাটুয়া এল এতক্ষণে। কিন্তু চোখ খোলে না। হাটুয়া ঘরে ঢুকে তার পাশে বসে পড়ে—এতোয়ারি!

—উ?

—যা বলেছিলাম, হল তো বে?

এতোয়ারি জবাব দেয় না। হাটুয়া খিকখিক করে হাসে। তারপর হাত বাড়িয়ে এতোয়ারির সিগারেটটা কেড়ে নেয়। এতোয়ারি বাধা দেয় না। টানতে টানতে হাটুয়া বলে—ঠিক হয়েছে, বউ পালিয়েছে, শালা! কাল রাতে তুই আমাকে ফেলে পালিয়ে এলি। তার ফল!

—ভাগ বে! এতোয়ারি তেঁতোমুখে বলে। শুতবার জায়গা পেলিনা, নাটমন্দিরে শুলি! বেশ করেছে, মেরেছে!

হাটুয়া আবার হেসে ওঠে।—কোন মারবে বে? কোন শালার এত ক্ষমতা?

—থাম। মাথা তো ফাটিয়ে দিয়েছে!

—নাঃ!

—নাঃ? এতোয়ারি কনুই-ভর দিয়ে ওর দিকে তাকায়।

—চুপ বে। কাল নয়া ছোকড়িটা আমার পকেট থেকে সব পয়সাকড়ি কেড়ে নিলে না? খুব নেশা হয়েছিল বটে, লেকিন বুঝতে পারছিলাম তো পয়সা নিচ্ছে। শালা বরষাতের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে! কপালে চোট লাগল। পোহাতে কপাল চিনচিন করতেই টের পেলাম।

এতোয়ারি একটু হাসে।—তাই বল।

—ও শালীর ঘরে আর যাব না বে এতোয়ারি? পাশের ঘরে···

—তুই যাস। আমি আর যাব না।

—কেন যাবি না বে? এখন তো বহু নেই। বেশি-বেশি যাবি।

—ভাগ। গায়ে চাক্কা-চাক্কা ঘা-ফোট নিকলাবে।

হাটুয়া একটু ভড়কে যায়। বলে—কেত্তা আদমি যাচ্ছে, দেখলি তো?

ঘা-ফোট হলে যাবে কেন বল্ তো?

—তুই যাস। আমি যাব না। বলে দিলাম, ব্যস!

—বহুর জন্যে আসলে মন খারাপ, তাই বল! আবে শালা! নিজেই তো দেখলি, তোর বহুর চেয়ে কেত্তা সুরতওয়ালী ছোকড়ি তোকে কেত্তা আদর করল। চুমা ভি খেল। আর তুই বলেছিলি, বহুকে চুমা খেতে গিয়েছিলি তো বহু মুখ হঠিয়ে নিল। এতোয়ারি চাপা গর্জে বলে—হাটুয়া! ওসব বাত করলে আমি তোর সাথে আর কথা বলবনা।

হাটুয়া হাসে।—বহু পালিয়ে শালা সাধু হয়ে গেলি বে! বেশ—দিন কতক সাধু হয়ে থাক। তারপর দেখব। আমি তো ও বেলা চলে যাচ্ছি চৌবেলালজীর ঘাটে। তাই তোকে বলতে এলাম, কখন কী করতে হবে। সিগারেট লে।

—আর পিব না। এতোয়ারি খবরটা শুনে চমকেছে। ফের বলে—তুই ঘাটে কী করবি?

—চৌবেজীর ফরমাস খাটব। কত কাজ ওর।—হাটুয়া গর্বে সুখটান দিয়ে সিগারেট ঘষে নেভায়।

—তোর মামা যেতে দেবে তোকে?

—হুঃ, দেবে মানে কী বলছিস বে? মামা আমার কাঁধের চামড়া পাথর করে দিল না? এবার অক্লাদের গাঁওয়াল পাঠাক। দেখুক, কেমন কষ্ট!

—তাহলে ওবেলা তুই ঘাটে যাচ্ছিস? সাচ বলছিস?

—সাচ না তো ঝুট বলছি?

—হুঁ। বলে চুপ করে থাকে এতোয়ারি। ঠাকুরবাবার এ কেমন বিচার সে বুঝতে পারছে না। হাটুয়াও তো পাপের কাজ করেছে। তার বেলা এই বখশিস আর এতোয়ারির কপালে বউ পালালো?

হাটুয়া ডাকে—আয়। তোর সঙ্গে শেষ দফা নাহান করে আসি। উঠ উঠ্।

এতোয়ারির কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বহু পালাল, পালাল। হাটুয়াও ভি ভেগে যাচ্ছে! তাকে একলা করে ফেলছেন ঠাকুরবাবা! গাঁওয়ালে আর কার সঙ্গে যেতে যেতে সুখদুঃখ রঙ্গরসের কথা বলতে পারবে মন খুলে? তেমন তো কেউ নেই। থাকলেও তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে। হাটুয়া আর সে ন্যাংটো হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা থাকে না। বাগানপাড়ার ঘরে—একই ঘরে সে আর হাটুয়া একই ছোকড়ির সঙ্গে খেলেছে, কেউ কারও মুখ চেয়ে লজ্জা পায়নি। ভাবতে গেলে হাটুয়া তার নিজেরই অন্য একটা চেহারা হয়ে উঠেছিল। এখন হাটুয়াও খসে পড়ছে।

অভিমানে কাতর এতোয়ারি গোঁ ধরে বলে—তুই যা। আমি এখন নাহান করবনা।

—বহুর দুঃখে সাধু হয়ে যাবি নাকি? হাটুয়া ওর হাত ধরে টানে। ওঠ। যদি দুখ বেজেছে তো কথা শোন। কাল ঘাটে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস। ওখান থেকে কলাবেড়িয়া রশিভর রাস্তা। আমি লোক ঠিক করে রাখব। বহুর চুল পাকড়ে লিয়ে আসবি। কেমন?

এতোয়ারি বলে—ভাগ বে!

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না।

হাটুয়া তক্ষুণি বেরিয়ে যায়। এতোয়ারি আবার চোখ বোজে। পা তুলে দেয় সিন্দুকের ওপর। কত কী ভাবে। টের পায়, বাইরে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যে মেশা দুনিয়ার দুনিয়াদারি গঙ্গার স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। সে পাড়ে কোথাও বাঁকের মুখে মড়ার মতো আটকে আর কোথাও একটা শেয়াল নীল জলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এতোয়ারি অবশ হয়ে পড়ে থাকে।... *

এদিনও ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের আকাশে ঠাকুরবাবা কালা ভঁইমাটো ছেঁড়ে দিলেন। নিষাদবাগ শ্মশানের ওদিকে ঢ্যাঙা শিমুলগাছের ডগা নেড়ে ভারি ভূরি তুই বহিন তাকে ডাকল আয় আয়। কানহাইয়াদের তালগাছের শুকনো বাগড়াগুলো থেকে ভূতিনী-প্রেতিনীরা চামচিকে হয়ে উড়ল আর সকরকন্দের ক্ষেতে আছাড় খেয়ে মারা পড়ল। বুধিনী সুধিনীর এক পাশে ছাগল ম্যা ম্যা করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দিশেহারা হয়ে দৌড় দিল। ভরতের দামড়া গরু লেজ তুলে লাফ দিতেই দড়ি ছিঁড়ল। রামলালের ঘরের একগোছা খড় উড়ে ছেদীরামের গাব গাছে গিয়ে আটকে গেল। সারা নিষাদবাগ জুড়ে হই হই আজ। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জোরালো বৃষ্টি—তুচার কুচি শিল পড়তে না পড়তে মাটির ওপর জল গড়াচ্ছে। যাদের ঘরের দেয়ালে পাটকাঠির বেড়া তারা তো আঁতকে কাঠ। ভজুয়াদের তালগাছের ডগায় চড়াৎ করে বাজ পড়ে বাগড়া জালিয়ে দিয়েছে। দাউদাউ জলছে পাতাগুলো। বৃষ্টির মোটা ফোঁটা দেখতে-দেখতে সরু আর ঘন হয়ে গেল। তারপর এ যেন আশ্বিন-কার্তিকের ঝড়বাদলা। বরষাচ্ছিলনা না তো বর্ষাচ্ছিলনা—বর্ষাল তো একেবারে চুবিয়ে ছাড়ল গে! ভরত রাস্তায় দৌড়তে দৌড়তে মালতীর মায়ের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে গেল। ভরতের অনেকগুলো আমগাছ আছে। না দৌড়ে উপায় নেই। নয়ানসুখের তিন বেটি এতক্ষণ গাছতলা সাফ করে ফেলেছে! ওদের কাছে বাজবিজলী কী, বৃষ্টিই বা কী! তিনবোনে আজও ভাঙা ডাল কুড়িয়ে বছরের জ্বালানী মজুত করবে। কিন্তু ল্যাংড়া রঘুয়া আজ বেরোয়নি। আসলে বেরুবার ফুরসতই পায়নি। মেঘ জমতে না জমতে আচানক এই তুমুল কাণ্ড যে। ল্যাংড়া মানুষ। গাছ চাপা পড়ে খুন হয়ে যেত। কিন্তু বাড়ি থেকে তার কাঁপা-কাঁপা চেরা গলার আওয়াজ ঠিকই শোনা যেতে থাকে। বহুদিদি নির্মলাকে ডাকছে। তিন বিঘে পটল আর সরবতী আলুর ক্ষেত পেরিয়ে বৃষ্টি ঠেলে সেই আওয়াজ ছুটেছে মন্তরের জোরে। ভরতের বাগানের তিনটে আমগাছ শরৎকে ইজারা দিয়েছে। শরতের বউকে এখন যেতেই হবে। নয়ানসুখের বেটিদের ঠিকই দেখতে পাচ্ছে রঘুয়া। সে কিনা ত্রিকালদর্শী পুরুষ। বহুদিদি গে-এ-এ-এ-এ···অদ্ভুত লাগে এই তুলকালাম ধুসরতার মধ্যে তীব্র কাঁপ-কাঁপা ভুতুড়ে চিৎকার। মাঝে মাঝে আচানক চোখ ধাঁধানো বিজলীর ঝিলিক তারপর কানফাটানো মেঘের আওয়াজ বারো শো জাঁতা পেষা হতে থাকে, আবার—বহুদিদি গে-এ-ও এ-এ ···। আবার কড় কড় কড়াৎ। মড় মড় করে ডাল ভাঙে। হিজল ভাড়ুলে গাব জাম শিমুল টলতে থাকে। বাঁশবনে সাতশো ভূতিনী নাচে গায়। ছেঁড়া সবুজ পাতায় ঢেকে যায় রাস্তাঘাট উঠোন ক্ষেত। আর ওই কাঁপা-কাঁপা তীক্ষ্ন, মন্ত্রপূত, হিংসুটে, চেরা গলার ডাক—বহুদিদি গে-এ-এ-এ-এ!

এতোয়ারি চার পায়ায় বসে সিগারেট টানছে তখন। সরস্বতী ছাগলের গলা ধরে চুলার কাছে বসে আতঙ্কে কাঠ হয়ে আছে। ছোটী ঘরের চৌকাঠে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আর শিল কুড়োয়নি। গা ভিজায়নি। বেচারীর মুখ চুন, চাউনি করুণ। বহুদিদি থাকলে আজ আম কুড়োতে যেত! কিছু ভাল লাগে না, মন মানে না। আজ নাইতে গিয়ে কলাবেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে এসেছে। নির্জন চড়ায় ঝাঝাল রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। বহুদিদি অমন করে পালাল কেন, জানবার জন্যে তার ছোট্ট কলজে মুচড়ে গেছে। মা যদি না মালতীর মাকে রাতে বহুর লম্ফ জ্বালতে যাওয়ার ব্যাপারটা পুছতে যেত, আর ছোটীকে না পাঠাত ছাগল বাঁধতে, বহুদিদি পালাতে পারত না। বাঁধে দাঁড়িয়ে নজরওয়ালী ছোটীই দেখতে পেয়েছিল, গাঙের চড়ায় স্যুটকেস হাতে বহুদিদি হন হন করে চলেছে। কেন যে সে দৌড়ে গাঙে নামলনা ছাই! কেন দিশেহারা হয়ে দৌড়ে বাড়িতে গেল! সরস্বতী তখনও মালতীর মায়ের কাছে গপ করছে। শোনামাত্র খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে মা-বেটি গঙ্গার কিনারায় গেল। বুড়ির নজর চলে না অতদূরে। নীচে খাড়া নেমে গেছে পাড়টা। নামতে গেলে পা হড়কে গড়িয়ে বিশ হাত নীচে গিয়ে পড়বে। তখনও বহুদিদি ওপারে পৌঁছতে পারে নি। তারপর দেখতে দেখতে সে মুছে গেল চোখের সামনে। ছোটী সেই দৃশ্যটাই ভাবছে এখন। চেনা মানুষ অচিন-অজান হয়ে যায় কীভাবে, ভেবে কুল পায় না। ছোট্ট কলজে মোচড় দেয় আবার। চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ে। জমানো দুধের মতো মাটি কালো হয়ে যায়। জলের ধারা গড়াতে থাকে। বাড়িটাও কি বহুদিদির জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছে? ভজুয়াদের তালগাছের মাথাটা জ্বলেপুড়ে কালো হয়ে গেল। ধোঁয়াটাও ফুরল। ধূসরতা ঘন হতে-হতে জমে উঠছে কালো রঙের ছোপ, তারপর নিষাদবাগ ক্রমশ ঝিম মেরে যাচ্ছে। আর কোথাও কেউ ডাকাডাকি করছে না। বৃষ্টিটা ধরে আসছে। হাওয়ার তোলপাড় কমে যাচ্ছে। গা শিরশির করছে মৃদু হিমে। এতোয়ারিদের বাড়িতে বিষাদ এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

—মা গে! চুলা জ্বালবিনে?

—জ্বালি বেটা!

—ছোটী গে। মালতীদের বাড়ি থেকে জেরাসে দুধ এনে দে বহিন।

—পানি গিরছে, দাদা।

—ছাতা লেকে যা। পয়সা ভি লে?

এতোয়ারির বাবা কবে একটা ছাতা কিনেছিল। অনেকদিন পরে ছাতাটা বেরল। ছোটী দাদা বেচারার জন্যে দুধ না এনে পারে? দাদার জন্যেও তার বুকে বাজছে না? একটা পেতলের আনি হাতের মুঠোয় নিয়ে ছাতার তলায় সে বেরিয়ে যায়। হায়

আজ তাকে দাদা ছাতা দিল বৃষ্টির সময়। কত গরব করে হাঁটতে পারত ছোটী—শুধু বহুদিদিটা থাকলেই।

সরস্বতীর ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এতোয়ারি ফের ডাকে—মা গে?

—হুঁ।

—চুলা জ্বাল গে।

—জ্বালি বেটা।···

হুঁ, কাজে মন লাগছে না কারও। বাড়িটার হালচাল অন্যরকম ঠেকছে। এই শূন্যতা, এই হটমেনে বুড়বাক বনে থাকা, এই অপমান আর গাঁয়ে কেলেঙ্কারি—কী করবে এতোয়ারি? এতোয়ারি তুই কী করবি? একটা কিছু কর। তুই তো মরদ বেটাছেলে বে এতোয়ারি! এতোয়ারি মনে মনে ছটফট করে। দেখতে পায় অবিকল ওইখানে নীল চোখো শেয়াল দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে! বিলকুল মড়া হয়ে জলে ভাসছে এতোয়ারি।

চা খেয়েই এতোয়ারি বেরিয়ে পড়ে, বৃষ্টি থেমে গেছে। এখনই ঘুরগুটি, অন্ধকার। সুমসাম গাঁয়ের পথ। খানাখন্দে জল জমেছে। এতোয়ারি যায় নয়ানসুখের বাড়ি। বাইরে একটু দাঁড়ায়। অঞ্চলা বলেছিল না আজ শিমূলতলায় একহি বাত বলবে? একটু বিব্রত বোধ করে সে। কিন্তু নয়ানসুখ রাতের খাওয়া সেরে বারোয়ারি লণ্ঠন নিয়ে বেরুচ্ছে। ধনপতির বৈঠকঘরে যাবে। এতোয়ারিকে দেখতে পেয়ে বলে—কৌন বে?

—হামি এতোয়ারি কাকা। হাটুয়া ছে?

—না বেটা। ঝড়ের আগেই তো বেরিয়েছে। চৌবেলালজীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। উনহি তখন ওকে ডেকে গেলেন কি না। তাই খেয়েদেয়ে চলে গেল তখন।

অঞ্চলা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে খাচ্ছিল। চোখ বড় করে তাকায়। এতোয়ারি পা বাড়ায় তক্ষুণি। নয়ানসুখের সঙ্গে ধনপতির বাড়ি অব্দি এসে বলে—হাটুয়া ঘাটমে নোকরি করবে, কাকা?

নয়ানসুখ হাসে।—নোকরি! নোকরি কৌন দেগা উসকো? কৈ কাম হায়!

—না কাকা। হাটুয়া আর নিষাদবাগে আসবে না।

নয়ানসুখ হাঁ করে তাকায়—তুঝে বোলা?

—হাঁ।

নয়ানসুখ ভারি গলায় বলে—আচ্ছা। তারপর ধনপতির বাড়ি ঢুকে যায়। এতোয়ারি একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে সে? তুই কী করবি এতোয়ারি? একটা কিছু কর। তুই মরদ না ঔরৎ। ঝোঁকের বশে অন্ধকারে আবার হাঁটতে থাকে। গাঁ পেরিয়ে তবে বাঁধে ওঠে। খালের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে একবার ভাবে ল্যাংড়া মঘুয়ার

কাছে যাবে নাকি? অমনি হাড়মুট-মুটির কথা মনে পড়ে যায়। ভয় পায় এতোয়ারি। এই নালাতেই তো ভূতিনী মোল্লানের চলাফেরা। সে থকথক করে বারবার কেশে সাহস আনতে চেষ্টা করে। তারপর প্রায় দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে গাঁয়ের রাস্তায় যায়। কুকুরের ডাকে সাহস আসে এবার। একটা লাঠি থাকা দরকার মনে হয়। তখন সে বাড়ি ফেরে।

লম্ফের দম কমিয়ে সরস্বতী সবে শুচ্ছে, ছোটী শুয়ে পড়েছে।—এতোয়ারি!

—হাঁ গে মা।

—কোথা গিয়েছিলি বেটা? ভাত গেয়ে নে। শুত যা।

—ভাত খুলে ঢেকে রাখ, মা। আর, তোরা ঘরে শো গিয়ে।

—তুই?

—হামি ভি শুতব।…বলে এতোয়ারি চালের বাতা থেকে একটা লাঠি টেনে নেয়।

সরস্বতী হাঁ হাঁ করে ওঠে।—এ্যাই এতোয়ারি। লাঠি নিয়ে কোথায় যাবি?

—চেল্লাস কাহে গে? আন্ধার হয়ে আছে দেখছিস নে? পোকামাকড় থাকতে পারে, তাই লাঠি নিচ্ছি।

—কোথা? যাচ্ছিস কোথা বেটা? ও এতোয়ারি।

—আসছি।

এতোয়ারি আবার বেরোয়। লাঠি হাতে থাকলে সাহস দুনো হয় মানুষের। সে ধনপতির বাড়ির পাশের সরু আলপথ দিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে যায়: ঢালু পাড় পেয়ে দৌড়ে নামে। বালির চড়া ভিজে হয়ে আছে। হাঁটতে আরাম লাগে। কিছুটা গিয়ে সে পকেট থেকে মেচবাত্তি আর বিড়ি বের করে। আর সিগারেট নেই।

অল্প-অল্প হাওয়া বইছে ভাগীরথীর বুকে। উত্তরপুবে দূরে টাউনের আলো ঝিকমিক করছে। তার পশ্চিম বরাবর রাধারঘাটে চৌবেলালজী গদীতে হেজাকবাত্তি জ্বলা দেখা যাচ্ছে! বাদ-বাকি সব অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্র ঝকমক করছে। উত্তর-পশ্চিমে ওপারে কলাবেড়িয়ার একটা আলোর ফুলকি নড়েচড়ে হারিয়ে গেল আবার। চোখের কোণায় ঘাটোয়ারির হেজাকবাত্তির রশ্মি কলাবেড়িয়া অব্দি আনাগোনা করতে দেখে এতোয়ারি। ঘাটে যাবে হাটুয়ার কাছে? সে মন ঠিক করতে পারে না। তবু কোণাকুণি হাঁটতে থাকে। আশেপাশে শেয়াল দৌড়ে যায় কোথায়। মাঝেমাঝে হাটু জল খানিকটা, আবার চড়া। কোথায় জল, কোথায় চড়া, এতোয়ারি কেন, সবারই জানা। সামনাসামনি পশ্চিমে এগোলে শিয়ালমারার নীচে দহ পড়বে—যেমন দহ পূবধারে নিষাদবাগের কাছে। সে দহ এড়িয়ে উত্তর পশ্চিমে চলতে থাকে।

কলাবেড়িয়ার সামনাসামনি গিয়ে এতোয়ারি থমকে দাঁড়ায়। হাটুয়ার কাছে যাবে, নাকি···আবার বিড়ি ধরায়। লাঠিতে এক পা জড়িয়ে চুপচাপ বিড়ি টানতে থাকে। সেই চৈত-সংক্রান্তিতে কলাবেড়িয়া এসেছিল বউয়ের সঙ্গে: রাধারঘাটে হোম আর চড়কের মেলা বসেছিল। সেই উপলক্ষে শ্বশুরের ডাক। বাপের গাঁয়ে বহুর চলনবলনই আলাদা। সারাক্ষণ একশো কথা। এতোয়ারিকেই এটা দেখায় ওটা বোঝায়—যেন এতোয়ারি বাচ্চা ছেলে। মাতব্বরের বহিন ছিল সেবার। দাদার জামাইকে খুব আদর করে খাইয়েছিল। ফুলকলিয়াকে বকাবকি করছিল। চিরকাল অমনি খুকী হয়ে থাকবি গে? জোয়ান মেয়ে হয়েছিস, বহু হয়ে গেছিস—মরদের সেবাযত্ন করতে শিখবি কবে? ফুলকলিয়া ঠোঁট বাঁকা করে বলেছিল—তুই কী করতে আছিস রী পিসী? বাবা তোকে এনেছে কী জন্যে তাহলে? এতোয়ারি জানে, তার পিসিশাশুড়ী গরীব। জীবন্তীর কাছে চাঁইপাড়ায় তার বাড়ি। বাড়ির পাশ দিয়ে আনাগোনা করতেই হয়। তাই বলে এতোয়ারি বাড়ি ঢোকে না, পিসিশাশুড়ীও তেমন ডাকে না। জামাইকে খাতির করবে কী দিয়ে? দেখা হলে শুধু মুখে কিছুক্ষণ বাৎচিৎ, ওই পর্যন্ত। পিসেশ্বশুর হাঁফকাশের রুগী। জীবন্তী হাসপাতালে মাঝেমাঝে তাকে দেখতে পায় এতোয়ারি। বারান্দার কোথায় শিশি হাতে নিয়ে বসে আছে। এতোয়ারি পীচের রাস্তা থেকে একবার সাড়া দেবো ভাবে—শেষঅব্দি ছায় না। হাটুয়া টেনে নিয়ে যায়। আয় রে! খামোকো দেরি করিয়ে দেবে!

জলন্ত বিড়িটা সামনে জলে ছুঁড়ে ফেলল এতোয়ারি। জলের তলায় নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ তছনছ করে এতোয়ারি এগোয়। লাঠি ডুবিয়ে জল ঠাহর করে সাবধানে পা বাড়ায়। এতটুকু শব্দ যেন না ওঠে।

আবার হাত দশেক চড়ার পর ঢালু পাড়। আকন্দ শাঁইবাবলার ঝাড়ে ভরা। ওপরে বাঁশবন। এতোয়ারি বাঁশবনে ঢুকে যায়। মোড়লের বাড়িতে আলো জলছে। ভিজে বাঁশপাতায় সাবধানে পা ফেলে সে পাঁচিলের ধারে পৌঁছয়। মাটির পাঁচিল। পয়সাওলা লোক কি না। ঘরে টিনের চাল! সে অবশ্য মোড়লের বাবার আমলে চাপানো। মরচে ধরে ঝাঝরা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় খড়ও চাপাতে হয়েছে। এতোয়ারি উঠোনের কদম গাছটার দিকে তাকায়। তার দিকে যেন চোখ কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপরই বাড়ির মধ্যে কুকুর ডেকে ওঠে।—এতোয়ারি ঘাবড়ে যায়। কুকুরটা মস্তো। হাঁক-ডাকও প্রচণ্ড রকমের। মাতব্বরের আওয়াজ শোনা যায়—অ্যাই! কুকুরটা একটু চুপ করে থাকে। তারপর আবার ডাকে। এতোয়ারি বহুর গলা শোনার জন্যে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে কুকুরটা ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে আসে। বাড়ির পেছন দিকে এসেই

প্রচণ্ড হাঁকডাক শুরু করে। ভেতর থেকে মান্থবর ডাকে—এ্যাই কালুয়া! কালুয়াঃ!

এবার ফুলকলিয়ার গলা ভেসে আসে।—শেয়াল দেখেছে আবার কী? তোমাদের গাঁয়ে যা শেয়াল!

—চুপ্ গে! তোর শ্বাশুড়ির গাঁয়ে শেয়াল নেই? মড়া খেকো শেয়াল সব।

খিলখিল করে হাসে ফুলকলিয়া—থাকলে আছে! তো ভালই তো! শাসবুড়িকে খেয়ে ফেলবে!

—শুত যা রী বেটি। আর বক-বক করিস না।

—আজ আমি শুতব না জী।

—শুতবি না তো কী করবি?

একটু পরে ফুলকলিয়ার জবাব শোনা যায়।—হামি তারা গিনব!

—ক্যা?

—তারা গিনব, তারা। আবার খিলখিল হাসি ফুলকলিয়ার। দেখছো কেত্তা তারা ঝিলমিলাচ্ছে?

—তোর শ্বাশুড়ির গাঁয়ে তারা দেখা যায় না রী বেটি?

—নাঃ! তারা না, চাঁদ ভি না? সুরুয ভি··· উহু, এক সুরুয আছে। ধনপতিয়ার বেটা।

কুকুরটার ডাকে যে সন্দিগ্ধ ভাবে ছিল, ততক্ষণে কমেছে। থেমে-থেমে নীচু গলায় ডাকছে। কখনো গরগর করে উঠছে। একটু দূরে এসে পেছনের ঠ্যাঙ ছুটো মুড়ে সামনের ঠ্যাঙ সিধে রেখে অদ্ভুত আওয়াজ করছে। হুঁ, বাড়ির জামাইকে চিনেছে বটে। এতোয়ারি অনেক দুঃখে হাসে। হাসে আর বাপ বেটির কথাবার্তা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপের পরে হাই তুলে ঘুমজড়ানো গলায় ফুলকলিয়া কিছু বলে। বোঝা যায় না। এই সময় ওদিকে কেউ ডাকে মান্থবরকে।—মান্থ, আছ নাকি? হেই মান্থবর।—

এ গলা ভিনজাতের মানুষের। এতোয়ারি তা বোঝে। মান্থবরও দিশী বোলিতে সাড়া দিয়েছে তখন—আছি। হৈদর নাকি? এস, এস।

—তুমিই এস হে মান্থ!

মান্থবর বুঝি গেল। ওধারে গাঁয়ের রাস্তা। কুকুরটা এতোয়ারিকে ছেড়ে তক্ষুণি ওই হৈদরকে নিয়ে পড়েছে। ধমকও খেল। তারপর কেঁউ করে থেমে গেল।—বলো ভাই হৈদর!

হেরিকেনের আলো ওদিক থেকে এসে কদমগাছের গুড়িতে পড়েছে। গোল মাছধরা

জালিটা ঝুলছে সেখানে। মাস্তবর ওই নিয়ে সন্ধ্যাবেলা গঙ্গায় চিংড়ি ধরতে যায়। এতোয়ারির সেইসব কথা মনে পড়ছে। দাওয়ার নীচে লম্ফের আলোয় চিংড়ির ছটফটানি। ফুলকলিয়া নতুন বরের সামনে শরম মানছে না। নাচছে আর সুর ধরে ছড়া বলছে। আলোর ছটায় নাকছারি ঝিলমিলাচ্ছে। সব মনে পড়ে এতোয়ারির।

—পরশু আমার বেটির বিয়ে ভাই মান্তু। মণতুই কুমড়ো লাগবে।

—অত তো দিতে পারবনা স্যাথভাই। মণটাক হবে।

—সে আমি জানিনে। তুমি মোড়ল হয়েছ ক্যানে হে মান্তু? যোগারন্তর করে দেবে। এই নাও বায়না।

—দর জানো তো?—

হৈদর আর মান্তবর এইসব নিয়ে প্রচুর বাৎচিৎ চালিয়ে যায়। এতোয়ারি চঞ্চল। গিয়ে হাজির হবে এক্ষুণি, চমক পড়ে যায় তো যাক, এমনি ভাব নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে কাঁটায় পড়ে সে। তক্ষুণি মনে পড়ে যায়, বাড়ির পিছন বরাবর ঘন কাঁটা ঘেরা। চোরের ভয়ে শ্বশুর সবসময় হুঁশিয়ার। শেয়াকুল আর বাবলার কাঁটায় এতোয়ারি আটকে গেছে। কাপড়ে আস্ত একটা ঝোপও আটকেছে। ছাড়াতে গিয়ে খসখস আওয়াজ ওঠে। ওদিক থেকে কুকুরটা আবার চ্যাচায়। মান্তবর বাড়ি ঢুকতেই ফুলকলিয়া বলে ওঠে—কিস্‌কা বল্‌দা নিকলে এসেছে, বাবা। কানটামে (পিছনের ছুঁচতলায়) খ্যাড় খেয়ে লিচ্ছে।

ভেতরে মান্তবর আওয়াজ দেয়—হৈঃ হৈঃ। হাঃ হাঃ। কুকুরটাও জোর চ্যাচায়।

অমনি এতোয়ারি কাঁটার ঝোপাসুদ্ধ টেনে বাঁশবনে ঢোকে। আরও আওয়াজ ওঠে। মান্তবর হেরিকেন হাতে ঘাটে যাবার খিড়কি দিয়ে বেরোচ্ছে—হাতে হেরিকেন। এতোয়ারি দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। বাঁশবনে হেরিকেনটা উঁচুতে তুলছে। হৈঃ হৈঃ হাঃ হাঃ। কুকুরটাও চ্যাচাচ্ছে।

গঙ্গায় নেমে ঝোপটা ছাড়ায় এতক্ষণে। দুই পা জাং অব্দি জলে যাচ্ছে কাঁটার ঘায়ে। কাপড়ও ছিঁড়েছে! পায়ের তলার কাঁটা কতগুলো ফুটছে বোঝা যাচ্ছে না। জলুনিতে এতোয়ারি কাহিল। জলটুকু পেরিয়ে চড়ায় যায় সে। ভিজে বালিতে বসে পড়ে। অন্ধকারে ঠাহর করে কাঁটা তুলতে থাকে পায়ের তলা থেকে। রাগে দুঃখে অস্থির। বিড়বিড় করে গাল দেয় শ্বশুরকে, বহুকে, নিজেকেও।

সরস্বতী ঘুমোয়নি। দরজা খুলে রেখে সামনে দাওয়াতেই তালাই পেতে শুয়েছিল। ছোটী ভেতরে এক কোণায় বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এতোয়ারির বিছানা কাছে পাতা রয়েছে। মাথার কাছে ভাতের থালার ওপর মস্তো পেতলের সরা। মিটমিটে লম্ফ

জ্বলছে। তার চার পাশে এক গুচ্ছের পিঁপড়ে। সন্ধ্যায় বৃষ্টির পর পিঁপড়ের ডানা গজিয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছিল। এরা তারাই। সরস্বতী বারদুই জিগ্যেস করে জবাব পেল না। তখন চুপ করে শুল। আর ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে এতোয়ারি কাঁটা তুলতে বলল। পা দুটোয় ছড়িয়ে দিল।

আর সারাক্ষণ চোখের কোণা দিয়ে দেখতে থাকল, বিছানায় কলাবেড়িয়ার মেয়েটার একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে রয়েছে। মুখ নামিয়ে শুঁকলে মেয়েলি গন্ধটা পাবেই।…

## ॥ দশ ॥

হাঁ এতোয়ারিদা, তুমি যে একেবারে সাধু হয়ে গেলে! নয়ানসুখের বিধবা বেটি অঞ্চলা কতবার বলে একথা। এতোয়ারি কখনও হাসে। কখনও গুম হয়ে মাথা দোলায়। মনে মনে জবাব দেয়—তাই বইকি! দুনিয়াদারির সুখ তো দেখে নিয়েছি রী অঞ্চলা! কিন্তু অঞ্চলা যেন তাকে একলা পেয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ক্ষেতে, জঙ্গলে, নদীতে যেখানেই কাজে বা অকাজে সে যাবে, আচানক মাটি ফুঁড়ে হাজির হবে নয়ানসুখের মেয়ে। এমনকি একদিন এতোয়ারি গাঁওয়ালে যাচ্ছে, অঞ্চলা তার সঙ্গ নিয়েছিল। সারাপথ শুধু রঙ্গরসের কথা। পালিয়ে যাওয়া বহু নিয়ে কতরকম টিপ্পনি। মোড়লের বেটিকে ভুলতে দেবে না যেন, এমন একটা ফিকির নিয়ে পিছনে লেগেছে মেয়েটা। সেদিন এতোয়ারি এক ফাঁকে কেটে পড়েছিল। পরে অঞ্চলা ঠোঁট ফুলিয়ে কত অভিমান দেখাল। বলতে ছাড়ল না— বুঝি গে বুঝি। লুকিয়ে লুকিয়ে কলাবেড়িয়ার ঘাটে পানি পিয়ে আসছ! এতোয়ারি এই মিথ্যে কথা শুনে রেগে লাল। মোড়লের বেটির মুখে সে পেচ্ছাপ করে দেয়। এমন সাংঘাতিক কথাও বলে বসল। অঞ্চলা হি হি করে হাসে। তার প্রকাণ্ড স্তন দুটি নির্লজ্জ রকমের দুলতে থাকে। সে হাততালি দিয়ে বলে—ওগে তোরা শোন শোন! বুড়ির বেটা কী বলছে শোন তোরা। আচ্ছা জী আচ্ছা। দেখা যায়গা পিছে যিস পেড়কী পঙ্খী সেই পেড়ের ডালে গিয়ে উঠে না কী, সময় হলে দেখবে সবাই!

আরও পরে এতোয়ারি বুঝেছে, অঞ্চলা যেন তাকে যাচাই করে নিচ্ছে। মোড়লের বেটির জন্যে সত্যি সত্যি শোক বেজেছে, নাকি শুধু বাইরে বাইরে সে গোঁ ধরে আছে—এটাই সমঝে নিতে চায় নয়ানসুখের মেয়ে। কিন্তু শোক বাজুক কিংবা না বাজুক, তাতে ওর লাভটা কী হচ্ছে? এতোয়ারি কি অঞ্চলাকে সাঙা করে বসবে? দূর দূর

নয়ানসুখ যদি এতোয়ারিকে রাজা করে দেয়, তার ঘর বাড়িটা সোনা দিয়েও মুড়ে দেয়—এতোয়ারি তার বিধবা বেটিকে নেবে না। এতোয়ারি ভাবে এ ব্যাপারটা ওকে পাল্টা-পালটি সমঝে দেওয়ার দরকার হয়েছে।

কিন্তু ওই এক স্বভাব এতোয়ারির। মনের সাচ কথাটা মরে গেলেও তো মুখ ফুটে বলতে পারবে না। ওদিকে সরস্বতীর ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেছে। দিন রাত উনিশ ভরি রুপোর গয়না বাজুপৈঠা নিকড়িমল হাঁসুলির জন্যে উঠতে বসতে মাথা ভাঙছে। গাঁওবালাকে শাপমন্যি করছে। ছেলেকে অকথ্য কুকথ্য বলছে। ছেলে শুধু বলে দেখছি গে দেখছি। ধনপতিজীরও ওই এক বাত। আরও কয়েকটা দিন সবুর করো বহিন। মাস্থবর ভাল লোক। দেশে তার সুনাম আছে। নিজেই এসে মেয়েকে রেখে যাবে। এসব শুনে বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে চেল্লাচিল্লি করে গাঁয়ের আকাশে চিড় ধরিয়ে দেয়। ঠাকুরবাবার উদ্দেশ্যে বলে—মুখিয়াজী মোটা টাকা খেয়েছে! মুখিয়াজীর বেটাটা ধড়ফড় করে মরছে না কেন ঠাকুরবাবা? কেন মুখে খুন নিকলাচ্ছেনা এখনও? মুখিয়াজী এই ভয়ঙ্কর প্রার্থনার খবর পেয়েই যেন রাগের বসে মামলাটাই খারিজ করে দিয়েছে। বুড়ি শেষটা গয়নার শোকে পাগল না হয়ে যায়! গাঁওবালাদের অনেকেরই মত—এত্তা বড়া বেটা। তারই কি না বহু। সেই বেটাই যদি গাগছ না করে, লোকের কী?

এতোয়ারি নিজে গয়না দাবি করতে কেন যাচ্ছেনা, এটা কেউ বুঝতে পারে না। আরে, ওকে তো আবার স্যাঙা করতে হবেই। বুড়ি মায়ের আর কতদিন? বটতলার দিকে পাঁও বাড়িয়ে বসে আছে! ছোটিরও বিয়ের সময় হয়ে এল। তারপর কি হবে? এতোয়ারি তো ল্যাংড়া রঘুয়া নয়, সাধুও নয়। পাকা সংসারী লোক।

সাধু নয়। কিন্তু হয়ে গেলেই হল। এই তো মুখে দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেছে। কাটবার নামই করে না। চুল বড় রাখতে শুরু করেছিল, এখন কাঁধ ছুঁয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ বলে মানত মেনেছে এতোয়ারি। সময় হলে কাটবে। শহর থেকে নাপিত আসে, ভগীরথ। প্রতি শনিবার তার নিষাদবাগে রোজ। সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা তাকে কামাতে হয়। দুপুরের খাওয়াটা মুখিয়ার বাড়ি বাঁধা। তিন মাস অন্তর আধমণ খন্দ-ধান, কলাই মাকড় কিছু গম নিয়েই আধমণ সে 'ঠিক্কা' পায়। তবে রোজের দিন লোকেরা ভালবেসে তাকে এটা ওটা দিতে ভোলে না। ভগীরথের হপ্তার আনাজপাতি কয়েকরকম ডাল ইত্যাদি 'সিধা' ভালই হয়। এই ভগীরথ একদিন এতোয়ারিকে পাকড়ে ফেলল। বড় রসিক লোক ভগীরথ। এতোয়ারির লম্বা চুল আচমকা খামচে ধরে মাথার ওপর শূন্যে কচাকচ কাঁচি চালায়, আর এতোয়ারি চ্যাচামেচি করে, যেন ওকে খুন করা হচ্ছে। ছেড়ে দিয়ে ভগীরথ বলে, হাঁ রে এতোয়ারি, তোর ব্যাপারটা কী বল্‌তো খুলে? মোড়লের বেটির জন্যে তুই কি সাধু হয়ে যাবি ভেবেছিস। এতোয়ারি সরল হেসে জবাব

দেয়—না জী না। ভাল লাগছে, তাই রাখছি। লাগবনা, তখন তোমার সামনে এসে বসে যাব। ব্যস।

এতোয়ারি আজকাল আগের চেয়ে অনেক সাদাসিদে হয়ে গেছে। মধ্যে হাটুয়ার পাল্লায় পড়ে খুব শহরবাজ আর শৌখিন হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে সব ছেড়েছে। এখন ধুতিও কদাচিৎ পরে। বেশির ভাগ সময় গামছা পরে থাকে। গায়ে গেঞ্জিও চড়ায় না। কথাবার্তা কম বলত বরাবরই। এখন তো তাও কমে গেছে। আগের পাথ্থর আবার পাথ্থর হয়ে গেছে এবং আগের শ্যাওলাটুকু আর নেই। স্রেফ ন্যাড়া পাথ্থর।

ভগীরথ বলল—উঁহু। ভাল লাগালাগি নয় বে এতোয়ারি। আমি বুঝেছি তোর কী হয়েছে।

এতোয়ারি মনে মনে চমকায়। কী বুঝেছে ওর? কিন্তু মুখে জোর করে হেসে বলে—ভাগো জী! হবেটা কী আবার? আমার কিছু হয় নি।

—থাম্ থাম্। আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে চুপসে বৈঠে থাক। আমি তোর বহু এনে দিচ্ছি। এই বলে ভগীরথ তার পিঁড়িতে ফিরে যায়। হরিয়ার বেটা মাথা আধখানা ন্যাড়া করে বসে ঢুলছিল। ভগীরথ গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে—আবে দেখ দেখ! ছোকড়া মুতে ভাসিয়ে দিয়েছে! আবে, এ কী করেছিস?

জোর হাসাহাসি পড়ে যায় বারোয়ারিতলায়। হরিয়ার বউ তার অপ্রস্তুত ছেলের হয়ে বলে—দশের সামনে বেটাকে অপমান কোরোনাতো দাদা! তাই শুনে ছেলেটার কী হল, আচমকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। আবার হাসির ঝড় ওঠে। ধনপতিজীও এমন হাসে যে কলকে থেকে আগুন গিরে যায় এবং কাসতে থাকে। নয়ানসুখ ব্যস্ত হয়ে আগুন নেভায়। ধুলোয় দাপাদাপি করে। একটু অসাবধান হলেই তো রক্ষে নেই। গাঁ ছাই হয়ে যাবে।……

ভগীরথ নাপিত। নাপিত ধূর্ত হবেই, এটা জানা কথা। আর আশেপশের সব চাঁইবস্তীতে সে বাঁধা 'হাজাম।' সবার সঙ্গে ভাব। সে যখন বলল, এতোয়ারির বউ এনে দেবে। তখন যেন সারা গাঁ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিবেকের দায়ে নিষাদবাগ ভেতর-ভেতর কষ্ট পাচ্ছিল বইকি। কুঁদুলী সরস্বতীর গঞ্জনা শাপমন্যি কোন ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোক তো নাদান! ওদের হিসেবের মধ্যে আনে না নিষাদবাগ। আসলে কলাবেড়িয়ার মোড়ল যে স্বয়ং প্রতিপক্ষ সেটাই মুশকিল। মান্থবর না হয়ে যদি মামুলি আদমি হত, এতদিন কবে কোমর বেঁধে ছেলেছোকরারাই চলে যেত এবং বেটির চুল পাকড়ে নিয়ে আসত। মান্থবরকে বড় ডর নিষাদবাগওলার। গঙ্গার সারা পশ্চিমপাড় জুড়ে মান্থবরের যেন রবরবা। অন্তত ওপাড়ের গাঁওয়ালে গিয়ে এতকাল সেটাই আঁচ করেছে এরা।

ভগীরথের কথা শুনে এতোয়ারিও মনে মনে আশার নিবুনিবু সলতেটা উসকে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে হঠাৎ যখনই ভগীরথকে মনে পড়ে, একটা চাপা সুখের অস্থিরতা কয়েক মুহূর্ত তাকে আচ্ছাসে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। গাছ যেমন ঝাঁকুনি খেয়ে শুকনো পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলার মওকা পায় তারও তেমনি। নিরাশা, অভিমান, দুঃখ, প্রায়শ্চিত্তবোধ এইসব জিনিস শুকিয়ে গিয়েছিল। এরপর ওগুলো নেই। মোড়লের বেটি ফিরে এসে যেন নতুন বৃক্ষ পেয়ে নতুন মুখে তার ডালে বাসা বাঁধে। এভাবেই তৈয়ার হয় এতোয়ারি।

আর সেই প্রস্তুতির সময় নয়ানসুখের বিধবা মেয়ে এক সন্ধ্যায় নিরালা বাঁধের নীচে চূড়ান্ত বেহায়াপনা করে বসল।

এতোয়ারি গাঁওয়াল থেকে ফিরেছে। ফিরে ঘাটে গেছে নাইতে। নাইতে গিয়ে হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে মুখ আঁধারি বেলাটুকু থাকতে থাকতে একনজর ঝিঙেক্ষেতে চোখ বুলিয়ে আসবে।

ঘাটের বেশ কিছুটা দূরে পাড়বরাবর ধারের নীচে তার ওই দেড়কাঠা ক্ষেত। বাঁধের দিকটায় সারবেঁধে ভাঁড়ুলে গাছ গজিয়েছে। আবছা আঁধার হলেও খোলামেলা গঙ্গার আকাশ পশ্চিম দিকে একটা ছটা পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। এতোয়ারি দেখলো, ক্ষেতের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে কে বসে আছে। নিষাদবাগে চোর চুটটিনের শাস্তি খুব কড়া। চুরি-চামারী একেবারেই হয় না, তা নয়। ইদানিং মুখিয়াজীর ঢিলেমিতে চুরিটা হচ্ছে প্রায়ই। এতোয়ারি হাতেনাতে ধরবে বলে গুঁড়ি মেরে এগোল। কাঁটার বেড়া দিয়েছিল এক সময়। এখন বেড়াটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কতকটা। সে একটু ঘুরে কচি পাটের ক্ষেতটা পেরিয়ে বাঁধের দিকে গেল। তারপর ভাঁড়ুলে গাছের ফাঁকে মাথা বের করে চারপেয়ে জন্তুর মতো ওঁৎ পেতে রইল। কাজ শেষ করে পা বাড়ালেই ধরবে।

তার আগে ধরবে না কেন? অন্য কেউ হলে তো অনেক আগেই ধরে ফেলত। না ধরুক, দূর থেকে চোখে পড়ামাত্র চেঁচিয়ে উঠত। দৌড়ুত। এতোয়ারি আসলে এতোয়ারিই। ওর স্বভাবচরিত্র এরকমই। মানুষের মধ্যে পাথরের গুণ থাকলে যা হয়।

তো এতোয়ারি আচানক গিয়ে শেষ মুহূর্তে তাকে ধরল, যখন গুটিসুটি ক্ষেত পেরিয়ে পালাবার তাল করেছে। ধরেই দেখল, চোর নয়—চুট্টিন। তারপরই টের পেল আর কেউ নয়, নয়ান সুখের মেয়ে অঞ্চলা। খুব জোরে সামনাসামনি জাপটে ধরেছিল এতোয়ারি। অঞ্চলা আই রী বলে অস্ফুট চেঁচিয়েও উঠেছিল। তারপর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল এতোয়ারির বুকে। এতোয়ারি তাজ্জব। হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে একেবারে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে বাতই আসে না।

অঞ্চলা তার বুকে খুঁচিয়ে দিল আঙুলের ডগায়। —কী ক্ষেতের মালিক! চুপচাপ

হয়ে গেলে যে ? ভেবেছিলে না জানি কোন চোর কী চুট্টিন পাকড়ে ফেলেছ, তাই না ? আমি গে আমি, তোমার অঞ্চলা। অঞ্চলা আধো আধো স্বরে বলতে থাকে এসব কথা। আর তুমি ভাবলে কি না অঞ্চলা তোমার ক্ষেতে ঝিঙে চুরি করতে এসেছে ? মা গে মা। সোনা না, দানা না—ঝিঙে ! আঁচল থেকে একটা ঝিঙে তুলে সে খিলখিল করে হাসে আবার। তারপর মাথা দোলায়। নেহি জী নেহি। কভি নেহি। অঞ্চলা তোমার ঝিঙে চুরি করতেই আসেনি, লেকিন তোমার ক্ষেতের ঝিঙে দিয়ে উল্টে তোমাকেই পাকড়াবার মতলব করেছে।

ঝিঙে দিয়ে এতোয়ারির বুকে মৃদু আদর দিলে এতোয়ারির এতক্ষণে হুঁশ ফেরে। সে ধাঁধায় পড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এবার বলে—কী বলছিস রী ! সমঝ হয় না আমার।

অঞ্চলা ওর বুকের দিকে হটে এল একেবারে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানি লাগছে এতোয়ারির নাকে। এতে ফুলকলিয়ার সেই সৌরভ নেই—তবু সৌরভ আছে। অন্য ফুলের। অন্য আউরতের। এতোয়ারি আরও কাবু হয়ে পড়ে ভেতর-ভেতর। অঞ্চলা বলে—দেখলাম, বুড়ির বেটা নাইতে যাচ্ছে। তো একবার ভাবলাম ঘাটে গিয়েই ধরি। ভাবতে ভাবতে দেখলাম সে এদিক বাগে আসছে। অমনি ফিকির এল মাথায়। আমি ডাকলেই তো ডর পেয়ে পালাবে—বাঘ আছি ভালুক আছি, খেয়ে ফেলব। তাই চুট্টিন সাজলাম। চুন্নি হলাম। ডাকলে যদি ভেগে যায়, তো না ডেকে ফাঁদ বানাই নিজের হাতে। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ি। পড়লাম।

এতোয়ারি বলবেটা কী ? তাই বিশ্বাস করে বসেছে। অঞ্চলার একটু আধটু চুরির বদনাম না আছে এমন নয়। তাই বলে তার ক্ষেতের ঝিঙে চুরি করবে, এটা এতোয়ারি ভাবতেই পারে না। যে মেয়ে তাকে গোপন খেলায় ঠারেঠোরে আসতে ডাকে, সে তারই ক্ষেতে চুরি করবে কেন ? হুঁ, নয়ানসুখের বিধবা মেয়ের এ একটা ফাঁদই বটে। এ মেয়েকে এখন চুট্টিন সাব্যস্ত করলেও এতোয়ারির লজ্জা, সঙ্গে গোপন খেলায় যোগ দিতেও এতোয়ারির লজ্জা। এতোয়ারি ঘেমে ওঠে। ফাঁদে অঞ্চলা পড়েনি, পড়েছে এতোয়ারিই। ঝিঙেগুলো নিয়ে অঞ্চলা চলে যায় তো যাক। কিছু বলবে না সে।

আর তার এই চুপচাপ থাকার সময় অঞ্চলা তার বুকে গলায় বাহুর ওপর হাত বুলোয়। সেই অদ্ভুত আধো-আধো করে বলে—আমি এখনও জওয়ানী আছি। একটা ছেলে হয়েছে তো কী হয়েছে ? আমার বাবা মোড়ল নয়, তাতেই বা কী ক্ষতি ? ও এতোয়ারি, আমি শরতের বহুর কথায় পটিনি। কেন পটিনি তুমি শোন। আমি তোমার জন্যে ভারিভুরির কাছে মানত দিয়েছি। তুমি মোড়লের বেটির আশা কেন করবে, গাঁয়ে আমার মতো জওয়ান মেয়ে থাকতে ?

তারপর অঞ্চলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে দুহাতে এতোয়ারিকে জড়িয়ে ধরে। আর এই করতে গিয়ে আঁচলের ঝিঙেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। পায়ের তলায় পটাপট ভেঙে অঞ্চলা তার বুকে মাথা কোটে। —আমাকে নাও তুমি, ও এতোয়ারি! আমার খুব কষ্টে দিন কাটছে, তুমি বোঝ না? গরীব বাপের বাড়ি এ বয়সে আর কতদিন কাটাবো। গাঁয়ের সেরা সমঝদার হয়েও তুমি আমার কষ্ট দেখবে? তার চেয়ে বলো, গাছে ঝুলে মরি। গলায় শিল বেঁধে গঙ্গায় ডুবি। হাতে তুলে বিষ দাও, খাই।...

আর কী সব বলেছিল, পরে আর একটুও মনে নেই এতোয়ারির। তখনকার মতো বাঁচতে শুধু বলেছিল—ঠিক আছে। হপ্তাদুই টাইম দে অঞ্চলা। হামি শোচ করি।

না বললে অঞ্চলা যেভাবে তাকে টানছিল ভুঁইয়ের মাটিতে শুইয়ে ছাড়ত। এতোয়ারির তখন পবিত্রতার সাধনা চলছে যে! ভগীরথের কথায় আশার সলতে দ্বিগুণ জ্বলছে। হাটুয়ার সঙ্গে গিয়ে পাপ করে ফেলেছে, সেজন্যেই তো ভারি-ভুরি চটে গিয়ে মোড়লের বেটিকে দূরে সরিয়ে রাখল। ভারিভুরি কি প্রকারান্তরে বলল না, শওদকা ওই আঙ (অঙ্গ) মাগঙ্গার পবিত্র জলে ধুয়ে নাও, তাপরে কথা? তাই এতোয়ারির চালচলন এখন সাধুর মতো। চুলদাড়িগোঁফ হাতপায়ের নখ কাটছে না। দুবেলা নাহান করছে। প্রায়শ্চিত্তের সাধনা চলছে। মুখে খারাপ বাত এলে জিভ কেটে আটকাচ্ছে।

নয়ানসুখের বেটি এসব জানত না। জানলে পা বাড়াবার সাহসই পেত না। অবশ্য অতগুলো ঝিঙে তুলে ফেলেছিল। ঔরৎলোকের বুদ্ধিসুদ্ধি এমনি হয়। ঝিঙেগুলো কোন মুখে এতোয়ারি নেবে? বাড়ি গেলেও বিপদ। হঠাৎ এই সন্ধ্যেবেলা এত ঝিঙে তোলার কৈফিয়ৎ কী দেবে মাকে? ঝিঙে তোলার তো কথাই ছিল না আজ। যদি বা লায়েক ছেলে ঝোঁকের বশে তুলেই ফেলে, ছোটীকে চেঁচিয়ে ডাকবে। এই তো নজদিগের ব্যাপার। সরস্বতী বা ছোটী ঠমী বাউরান (কালাবোবা) নয় যে এতোয়ারির গলা বুঝতে ভুল করবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবে এতোয়ারি জোর করে অঞ্চলাকেই নিতে বলেছিল। অঞ্চলা দু'চারবার না না করে শেষে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আঁচলে ভরেছিল। কিছু এতোয়ারিও কুড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সরস্বতী ক্ষেতে গিয়ে কয়েকটা ভাঙা টুকরো পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর ক্ষেতময় ঘুরে টের পায়, তোলার মতো ডাগর হয়েছিল যেগুলো, একটাও নেই। তখন সে চেরাগলায় আকাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। প্রথমে গালটা খেল ধনপতি মুখিয়া, তারপর নিজের বেটা এতোয়ারি। ক্রমেক্রমে নিষাদবাগের মেয়ে মরদ কেউ বাদ পড়ল না। শেষে ক্লান্ত বুড়ি পা ছড়িয়ে ক্ষেতের কোণায় বসল যেখানে মড়ার মাথাটা বাঁশের লাঠির ডগায় পোঁতা আছে। বুক ফেটে কাঁদল। মাথাটাকে

গালমন্দ করার সাহস নেই। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাঁদল। কেঁদেকেটে টুকরোগুলো নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে নামল। নাহান করে বাড়ী যাচ্ছে, তখন তাকে দেখে সবার মনে হয়েছে, বেটা এতোয়ারিকে শ্মশানে পুড়িয়ে শোককাতর বুড়ি বাড়ি ফিরছে।

নির্মলা ছোটীকে বলেছিল—মাকে ধরগে না রী! মরে যাবে যে কাঁদতে কাঁদতে।

ছোটী বলেছিল—মরুক। মরলে নিষাদবাগের হাড় জুড়োবে জানো না?...

এই নির্মলার ব্যাপারটা এখন ভাল চোখে পড়ছে এতোয়ারির। ফুলকলিয়া থাকতে কত ছলে কতবার এসেছে তার বাড়ি। আশ্চর্য, ফুলকলিয়া পালাল, সেও বাড়ি ছাড়ল। এমনকি তার মায়ের কাছে কিছু টাকাকড়ি পাওনা আছে, তাও চাইতে আসে না। এতোয়ারিকে দেখে আগের মতো ঠাট্টাতামাসাও করে না। বহুটা যে পালাল সবাই এসে খোঁজখবর নিল, আহাউহু করে গেল। নির্মলা তো আসে নি। তার স্বামী শরত অবশ্য পথেঘাটে দেখা হলে প্রসঙ্গটা তোলে। বলে—বলব তোর শ্বশুরকে। দেখা হয় না যে আজকাল। আমিও খুব ঝামেলায় আছি রে এতোয়ারি। কিন্তু সে ওই মুখেরই কথা। এতোয়ারি এমন বেহায়া নয় যে শরতকে গিয়ে সাধাসাধি করবে।

কিন্তু নির্মলা যেন এতোয়ারিকে দেখলে এড়িয়ে যায়। ঠাট্টাতামাসা তো দূরের কথা। এতোয়ারি হাতুয়ার পাল্লায় পড়ে শহরের বাগানপাড়ায় গিয়েছিল বটে। কিন্তু তাই বলে মেয়েদের আঁচলে মুখ মোছার সাধও নেই, লোভও নেই তার। আর নির্মলা তো নিষাদবাগে থেকেও নিষাদবাগের কেউ নয়। গাঁওবালার সুখ দুঃখে ওর দৃকপাতই নেই। নির্মলা এতোয়ারির জন্য দুখ দেখাক না দেখাক এতোয়ারির কিচ্ছু যায় আসে না। বরং তার এখন সন্দ হয়, শরতের বউই মোড়লের বেটির কানে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল কি না। ওকে তো শহরে নিয়েও গিয়েছিল। এখন থাকলে আরও যেত। কে বলতে পারে, মন্ত্রপড়া খাবার, নয় তো জড়িবুটি খাইয়ে ফুলকলিয়ার মনটাকে বদলে দিয়েছিল কি না। তা যদি না দিল, তাহলে মানী লোকের বেটি অমন করে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালায় কে কোথায় শুনেছে?

এতোয়ারি আবার ল্যাংড়া রঘুয়ার কথা ভেবে রেখেছে। কিন্তু ওদিকে পা বাড়াতেই তার ডর লাগে। একদিন গিয়েই তো বউ ভেগে গেল। রঘুয়া মহা ধড়িবাজ যে। ও কার ভাল করবে, কার মন্দ করবে—সে ওর ইচ্ছে। এটাই মুসকিল।

ছোটীকে চুপিচুপি শাসন করে দিয়েছে—খবরদার রী। শরতের বহুর সঙ্গে কথা মাৎ বলবি। ও আসছে দেখলে রাস্তা থেকে ভেগে ভিন রাস্তায় হাঁটবি।

—কাহে গে দাদা!

—উও দুশমন ঔরৎ আছে রী বহিন!

—কাহে গে?

ছোটীকে ইশারায় কিছু বোঝানো যায় না। এতোয়ারি অগত্যা বলেছিল—তেরা ভাজকো তো ওহি ভাগা দিয়া রী!

—সাচ?

—হাঁ। সাচ!

ছোটী আজকাল যেন ঝটপট পেকে উঠেছে। চোখেমুখে বুদ্ধিমতী ঔরতের হাবভাব দেখতে দেখতে ফুটে গেল! সে একটু ভেবে বলেছে—ঠিক বলেছ গে দাদা! উও বহুৎ হারামী মৌগি আছে। বহুদিদির সাথ দিনরাত ফুসুর ফাসুর করত!

রাগে দুঃখে অতটুকু মেয়ে শেষটা প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। বিড়বিড় করে গালও দিল অনেক। তারপর চোখ মুছতে মুছতে ছোট্ট পেতলের ঘড়াটা কাঁখে নিয়ে নদীতে গেল। এতোয়ারি জানে, তার বোন বড্ড একা হয়ে গেছে। কিছুদিন বহুদিদির জন্যে তো খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। বুক ফেটে ফেটে কাঁদত। ঠায় বসে থাকত কলাবেড়িয়ার দিকে চেয়ে। চোখ দিয়ে জল ঝরত। এখন হয়তো অনেকটা সয়ে গেছে। কিন্তু এই যে গেল চোখ মুছতে মুছতে, এতোয়ারি হলফ করে বলতে পারে, ঘড়া বুকে চেপে কলা-বেড়িয়ার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে কাঁদবে।

ছোটীর দিকে তাকালেই এতোয়ারির মন নরম হয়ে যায়। মনের তলায় বুদ্বুদ কাটার মতো অস্পষ্ট দ্বিধাজড়িত একটা প্রার্থনা উঠে আসতে চেষ্টা করে বুঝি। মোড়লের বেটি, হামার ঘাট হয়েছে রী! হামি নাদান। মাফ করে দে ভাই!······

পরের শনিবার এতোয়ারি ভগীরথের আশায় গাঁওয়ালে গেল না। সে ঘর-বার করছিল। তার বাড়ির সামনে গাঁয়ের রাস্তা। রাস্তার ওপাশে উঁচু জমির ওপর হরেক গাছালি। বিশাল জামগাছের গুঁড়ির মাথায় উঁচুতে একটা ডাল গত বছর ঝড়ে ভেঙেছিল। সেটা ভরত কাজে লাগিয়েছে। এখন যে কাটা মুড়োটুকু বেরিয়ে আছে তার খোঁদলে পেঁচা থাকে। সূর্য ওখান অবদি উঠলে বোঝা যাবে ভগীরথের আসার সময় হয়েছে। সে সেই ডালটার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। সূর্য যেন বড় দেরি করছে আজ। হাঁ ঠাকুরবাবা। তুমিও কভি কভি নাদান লোকের সঙ্গে তামাসা করো!

সূর্য সেই কাটা ডালের ওপর হাতখানেক উঠে গেছে। তবু ভগীরথের দেখা নেই। বাঁদিকে উত্তরে বাঁধের স্লুইসগেটের মাথা অবদি নজর চলে। তেমন কেউ আসছে না। এতোয়ারি ব্যাকুল। এমন তো হবার কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে দেখছে, ভগীরথ একদিনও রোজ-কামাই করেনি। আজ তার জন্যেই কি রোজ-কামাই হয়ে যাচ্ছে?

এতোয়ারি থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে। স্লুইসগেটের দিকে হাঁটতে থাকে। শহরের শেষ দিকটায় মিলের পাশে বস্তীতে থাকে ভগীরথ। ওখানে দাঁড়ালে ক্রোশটাক পথ বাঁধবরাবর নজর হবে।

মালতীর মা বাঁদিকে একটা ক্ষেতে করেলার মাচান বাঁধছিল। দেখতে পেয়ে ডাকে —এতোয়ারি! আজ গাঁওয়ালে যাওনি বেটা?

—না মোসি, যাইনি।

—জামাই বলছিল, তোমার সঙ্গে 'জোট' বেঁধে যাবে। ভাবলাম বুঝি, তাই গেল।

—আমার শরীর ভাল না, মোসি। তোমার জামাই ডেকেছিল, যাওয়া হয়নি।

এতোয়ারি বিরক্ত। হাটুয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফলটা যা হবার হয়েছে। আর জোট বাঁধার মধ্যে সে নেই। মালতীর মরদটাকে সে পছন্দও করে না। যে গাঁয়ের লোক, সে-গাঁয়ের নানান বদনাম আছে। মামলামোকদ্দমা খুনোখুনি হিংসে হিংসি লেগেই আছে নাকি। নিষাদবাগে তো সেদিক থেকে কোন ঝামেলাই নেই। আজ অব্দি গ্রামে পুলিশ ঢোকেনি, এনিয়ে, নিষাদবাগের গর্ব আছে। মালতীর মরদের সঙ্গে তাই কেউ মিশতে চায় না। লোকটাও কেমন যেন বাঁকাটেরা চালচলন। যেমন সৌখিন তেমনি কথায় কথায় ফটকেমি।

—ও এতোয়ারি! কোথা যাচ্ছিস অমন করে?

মালতীর মা কি কিছু বলবে? ছোট্ট কাটারিখানা দিয়ে পিঠের ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে সে বেড়ার ধারে এল, তাই দেখে অগত্যা এতোয়ারি দাঁড়ায়। বলে—আসছি মোসি। এমনি যাচ্ছি।

—শুন গে শুন। আ না মেরা পাশ!

সস্নেহ ডাক শুনে এতোয়ারিকে আসতেই হয়। বেড়ার কাছে গিয়ে বলে—বোলো মোসি। ফিসফিস করে মালতীর মা বলে—মালতীর সঙ্গে তোর বহুর দেখা হয়েছে কাল।

এটুকু শুনেই এতোয়ারি চঞ্চল।

—কাঁহা গে?

—ঘাটমে। রাধার ঘাটমে।

পরমুহূর্তে এতোয়ারি টের পায়, সে মালতীর মায়ের সামনে বড়বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে। তাই পা বাড়াবার ভঙ্গী করে বলে ছোড় দে রী মোসি!

—আরে শুন শুন! মালতী তোকে বলবে কী করে? আমাকে বলেছে। আমি বলছি, বাতঠো শুন।

—কী শুনব রী?

—তোর বহু হাটুয়ার সঙ্গে ঘাটে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এমন সময় মালতী যেয়ে বলল—কেমন আছিস রী বহুদিদি? তোর বহু মালতীকে যেন চিনতেই পারল না। খুব দেমাগ হয়েছে মোড়লের বেটির।

—হয়েছে তো হয়েছে! আমার কী?

—আরে ছোকড়া, আসল বাতঠোতো শুন!

—কী, বলো!

—একটু পরে শরতের বহু এল।

এতোয়ারি চমকে ওঠে।—শরতদার বউ কোত্থেকে এল?

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মালতীর মা আরও চাপা গলায় বলে—ঘাট পেরিয়ে লৌকো থেকে নামল নির্মলা। নেমে মোড়লের বেটিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—ওরী ছোকড়ি, তোর কাছেই তো যাচ্ছি। মালতী একটু আড়ালে সরে গেছে তক্ষুণি। দেখল দুই ছোকড়িতে কী ফুসুর ফাসুর হল। তারপর দুটিতে লৌকোয় উঠে শহরে চলে গেল।

এতোয়ারি দম আটকানো গলায় বলে—আর হাটুয়া?

মালতীর মা বলে—হাটুয়ার কথা আর তো বলেনি মালতী। হাটুয়া যায়নি, ওরা দুজনেই গেল।

এরপর মালতীর মা গলা চড়িয়ে পিছনে গঙ্গার দিকে অদৃশ্য ছাগল খেদাতে থাকল—লিঃ লিঃ কাটকে খায়ে গা। খুন পিয়ে গা। ভাগ ভাগ।

এতোয়ারি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পা বাড়ায়। কিন্তু যেদিকে যাচ্ছিল, আর সেদিকে নয়—গাঁয়ের দিকে ঘোরে। চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। রাগে সে ছটফট করতে করতে শেষঅব্দি বাড়ি ঢুকেই পড়ে।

সরস্বতী উদুখল বের করেছে আবার। বউ যাবার পর কাত করে ঢুকিয়ে রেখেছিল রান্নাশালের কোণায়। বুড়ো হাড়ে কষ্ট হচ্ছে ধান ভানতে। তবু যেন জেদ করেই যোয়ানীর খাটুনি খাটা চাই। এতোয়ারি তেতো হয়েই ছিল। আর তেতো হয়ে বলল—ছোটী কাঁহা গে মা? তুই কেন ঝামেলা করতে গেলি?

সরস্বতী গ্রাহ্য করল না বেটার কথা। বেটার ওপর মনে মনে আজ কাল রেগেই থাকে সে। জবাবও দিলনা। তখন এতোয়ারি সেই রাগ চঞ্চলতাসুদ্ধ উঠোনের বেড়ার ধারে গিয়ে হাঁক দিতে থাকল—হেই ছোটী! ছোটী-ই-ই! হেই হারামী লডকি-ই-ই-ই!

ছেলের এমন আচানক গর্জন শুনে বুড়ি অবাক। গজগজ করে বলে—এত্তা ফাড়ছিস কাহে গে? ছোটীকে আমি কামে পাঠিয়েছি। শরীর খারাপ বলে গাঁওয়ালে গেলি না, গেলি না। আবার মেজাজ করছিস কাহে?

ছোটী গিয়েছিল বুধিনী-সুধিনীকে ডাকতে। ভোরবেলা ক'সের যব ভেজে রেখেছে। ছাতু পিষতে হবে। ছাতুটা সরস্বতী নিজেই বেচতে যাবে শহরে। অনেক দিন শহরমে যায় নি। কাল রাতে খেয়াল হয়েছে হঠাৎ। এতোয়ারি তো সে সব জানে

না। মায়ের ধমক খেয়ে গুম হয়ে দাওয়ায় বসে গেছে। কী করি-কী করি হাবভাব। হাত দুটো অবশ লাগছে।

ছোটী শিগগির এল। বুধিনী-সুধিনীকে সঙ্গে নিয়েই এল। বোবা-কালা দুই বোন এতোয়ারিকে দেখে হাসল। এতোয়ারি গুম। ছোটী বলল দাদা, ভগীরথ হাজাম তোকে ডাকছে। বারোয়ারিতলায় কামাচ্ছে ছাখ গে।

কিছুক্ষণ আগে হলে এতোয়ারি পাখির মতো উড়ত। রেলগাড়ির মতো দৌড়ুত। এখন যেন শুনেও শুনল না কানে। কানের পাশ থেকে আধখানা বিড়ি খুঁজে বের করল সে। চুলোয় সাতসকালে ভাত রান্না হচ্ছে। এতোয়ারি বাড়ি থাকলে তাই হয়। সে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে উঠোনে একটু দাঁড়ায়। কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয় অসাবধানে। ছোটীর চোখ সব সময় দাদার দিকে। চেঁচিয়ে ওঠে—আগ গিরল যে গে! তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

এতোয়ারি হন হন করে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় সে আনমনে হাঁটে। কখন এল ভগীরথ? ওই দেখা যাচ্ছে সে বারোয়ারি-তলায় পিঁড়ে পেতে বসে ভরতের দাড়ি কামাচ্ছে। মনের ঝড় চেপে রাখে এতোয়ারি। ভগীরথ সুখবর আনুক, নাই আনুক, তাকে এবার থেকে এমনি করে সব ঝড় সামলাতে হবে।

—আও এতোয়ারি, বইঠো! ভগীরথ তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে। এতোয়ারি ভাঙ্গা গলায় বলে—কতক্ষণ এসেছ দাদা?

—ঠিক টাইমে। আমার টাইম এদিক ওদিক হবে না—ঝড় হোক, বরষাক।

এতোয়ারি হাসবার চেষ্টা করে। —ঝুট্! আমি তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভগীরথ হাসে। দাঁড়ালে কী করে দেখবে? রাস্তায় আমি এলাম গঙ্গা পেরিয়ে—তোমার শ্বশুরগাঁ থেকে।

শ্বশুরগাঁ নিয়ে রসিকতায় বারোয়ারিতলায় হাসাহাসি পড়ে যায়। ধনপতি এখনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তাই নয়ানসুখেরও দেখা নেই। রামলাল প্রভুরাম দাদারাম বসে আছে। সুখলাল আছে। এতোয়ারি বিব্রত। এদের সামনেই কি ভগীরথ তার সঙ্গে কথা বলবে?

এতোয়ারি দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে তাকে ভগীরথ?

—সাচ্। তোমার শ্বশুর গাঁ হয়ে এলাম, এতোয়ারি। ভগীরথ কামাতে কামাতে বলতে থাকে। কদিন ধরে কলাবেড়িয়ার মোড়লের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। তো আজ নিষাদবাগের রোজ। ভাবলাম ভোরবেলা গিয়ে ওকে ধরব। বাত করব। তারপর নিষাদবাগে আসব।

ভরত বলল—দেখা হল কি না, সেটাই বলো শুনি।

—হুঁঠ। হল।

—কী বলল মোড়ল?

ভগীরথ ক্ষুরটা হাঁটুর নীচের মাংসে ঘষে নিয়ে বলে—যা বলল, তা ভালই বলল। ও তো মামুলি লোক নয় যে যা-তা বলবে।

ভরত অধৈর্য হয়ে বলে—আহা, বলল কী?

—প্রথমে বলল, আমার বেটি নিষাদবাগে আর যাবে না। তারপর বলল, তবে আমার বংশে কোন বেটি কখনও ছাড় নেয়নি মরদের কাছে—আমার বেটিও ছাড় নেবে না।

এতোয়ারি হাঁ করে শুনছিল। সুখলাল বলল—এ কথার মানেটা কী?

ভগীরথ হাসে।—মানে বহুৎ সিধা। এতোয়ারিকে ওর বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। বিয়ের আগে নাকি এরকম কথা হয়েছিল, বলল!

ভরত বলে—হুঁ। হয়েছিল। তবে সেটা অবস্থা বুঝলে; মোড়ল যখন বেমারিতে পড়বে, কী কমজোর হবে—তখন। এখন তো সে কথা ওঠে না।

ভগীরথ তার গালে ক্ষুরের শেষ টান দিতে থাকে।—সে তোমরা জানো দাদা, কী কথা হয়েছিল তখন। আমি সাফসুফ বুঝলাম, এতোয়ারিকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে।

রামলাল ফুঁসে ওঠে। বাঃ রে বাঃ। এতোয়ারির বোনের বিভা হবে, তবে না? কী বলো ভরত?

ভরত নিজেকে ভগীরথের হাত থেকে মুক্ত করে বলে—হাঁ হাঁ। ওহি বাত। ভুলে গিয়েছিলাম তাই বটে। ছোটীর বিভা হবে, তবে।

সুখলাল বলে—ঠিক আছে তাহলে ছোটীর বিভা দিয়ে দিক মোড়ল। তারপর জামাই নিয়ে চলে যাক।

প্রভুরাম মুখ খোলে। —সরস্বতী দিদি বুড়ি হয়েছে। ওকে কে দেখবে?

আসল সমস্যায় এতক্ষণে হাত পড়েছে। বেটার মা বেটার সঙ্গে বেয়াইবাড়ি গিয়ে থাকবে না, কিছুতেই থাকবেনা, এটাই কড়া লোকাচার। দেশজুড়ে চাঁইসমাজে থিটকেলের চূড়ান্ত হবে। সরস্বতী কোন মুখে কলাবেড়িয়ার মোড়লের বাড়ি উঠবে? মোড়ল যদি মরে যায় তাও না। তখন এতোয়ারিই তো মালিক। সে ইচ্ছে করলে সব বেচে-খুচে মায়ের কাছে চলে আসতে পারে। কিন্তু মোড়লের মেয়ে যদি বেঁকে বসে, পঞ্চগেরামী করে, তাহলে? সে যদি বলে, বাপের ভিটে ছেড়ে নড়বে না?

এইসব আলোচনা চলতে থাকে বারোয়ারিতলায়। ধনপতি আর নয়নসুখও এসে পড়ে আরও গম্ভীর হয় আলোচনা। এতোয়ারি একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ধনপতি শেষে ডাকে—এতোয়ারি!

—বলো মুখিয়াজী!

—আমি বলি, তুই যা বেটা। দেখতে গেলে এতো ভালই। পয়সাওয়ালা হবি। শ্বশুরের মানে মান পাবি। গাঁওয়াল করতে হবে না। সুখেই থাকবি। চেহারা ভি খুলে যাবে!

—হুঁ, মা? ছোটী?

—ওরা আছে, আমরা আছি। আরে বাবা এই তো নদীর ওপার আর এপার। তুই নিজেও দেখাশুনা করতে পারবি। এ আর ঝামেলা কিসের?

ভরত বলল—লেকিন একহি বাত! মান্যবর মোড়ল তাহলে এসে জামাইকে নিয়ে যাক। নিষাদবাগের বেটারও তো একটা ইজ্জত আছে। গাঁয়েরভি আছে।

ভগীরথ মাথা দোলায়।—আমি বলেছিলাম সেকথা। মোড়ল আসবে না। বলল সেদিন গিয়ে খুব অপমান হয়ে এসেছে নাকি। আর এপারে আসবে না।

—আসবে না?

—না।

—এতোয়ারিকে যেতে হবে?

—হাঁ।

বারোয়ারিতলায় স্তব্ধতা নামল কিছুক্ষণ। একটু পরে ধনপতি ডাকে।

—এতোয়ারি!

—হাঁ?

—কী করবি বেটা?

এতোয়ারি কী বলতে যাচ্ছিল, কখন ধনপতির খড়ের গাঁজার পেছনে সরস্বতী এসে দাঁড়িয়ে আছে—তার হাতে ছাগলের দড়ি এবং ছাগল আর ছোট্ট দুরমুষ—সে চিলচেঁচানি চেঁচিয়ে উঠেছে আচানক—গহনা! উন্নিশভরি গহনা! ডাকুর বেটা ডাকু উও বাত নেহি বোলা? হারামখোরকা বেটা, বাটপাড়কা বেটা, দাগাবাজকা বেটা!…

ধনপতি একবার থামাতে চেষ্টা করে—বহিন!

সরস্বতী ছাগলটাকে হ্যাঁচকা টানে টেনে নড়বড় করে এতোয়ারির সামনে এল। দুরমুষ তুলে চেরা গলায় চেঁচায়—আমার পেটে তোর জন্ম হয়েও কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটীকে যদি তুই লিতে যাস, তবে আমি তোর মা নই—কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি তোর মা—তোর মা—তোর মা—তোর মা…

বুড়ি দুরমুষটা নিজের মাথায় ঠুকতে শুরু করছে। নয়ানসুখ তাকে ধরে।

## ॥ এগারো ॥

জষ্ঠি মাসের সংক্রান্তির দিন গঙ্গা পুজো। ওই দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় বিষ্টি-বাদলা হবেই। ঝড়ঝাপটাও আসতে ছাড়বে না। দেখতে দেখতে লোকের এমন সলগুণ অভ্যাস হয়েছে যে ওদিন আকাশ তকতকে দেখলে বলবে, দূর। এবার জমবেই না। কিন্তু ও তো সকাল বেলার আকাশ। পুজোর মেলা সেই বিকেলে শুরু। তখন কিন্তু আকাশের হাবভাব বদলে গেছে। বাঁশবন, সাধুর শ্মশান আর পালিতবাবুর চিমনিভাটার পিছনের জঙ্গল থেকে শিবের চেলারা কাঁইকাঁই মাইরে করে বেরিয়ে আসছে। মা গঙ্গার পুজো। বাবা মহাদেবের ওই এক মজা করার স্বভাব। দিয়েছে ভুতনী প্রেতিন দেব চালিয়ে। ল্যাংড়া রঘুয়া সেদিন ক্রাচে ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গঙ্গার চড়া পেরিয়ে এসেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সবাই যখন মাথা বাঁচাতে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, সে নড়ছেই না আসন ছেড়ে। মড়ার খুলিতে কারণ ঢেলে খাচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে—হো হো হো। বহুৎ আচ্ছা। হো হো হো। ভাবখানা এই, মায়ের গেরস্থালি বাবার চেলারা পণ্ড করে দিচ্ছে—এবার দেখা যাক গঙ্গাবেটি তুই কী করিস।

শুধু রঘুয়া ল্যাংড়া কেন, নিষাদবাগের যোয়ান যোয়ানী ছোকড়া ছোকড়ী সব্বাই এসেছে। ফিবছর এই দিনটির মুখ তাকিয়ে থাকে ওরা। কেবল ওরাই বা কেন, কাছের আর দূরের কে না প্রতীক্ষা করে গঙ্গাপুজোর? হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, জাত-ধর্ম যাইহোক, সবাই এসে জুটবে এ মেলায়। পশ্চিমপাড়ে ওদিকে উত্তরে রাধারঘাট, এদিকে দক্ষিণে কলাবেড়িয়া, তার মাঝামাঝি সাধুর শ্মশান। শ্মশানের লাগোয়া ঢালু পোড়ো জমিটায় মেলা বসে। দেখতে দেখতে সেই মেলা গঙ্গার বুক অব্দি ছড়িয়ে যায়। শুকনো বালির চড়া ধু-ধু করে এখন। ওই দূরে পূবপাড়ে নিষাদবাগের পায়ের নীচে একফালি স্রোত বইছে কি বইছে না। চড়ার মধ্যে এখানে-ওখানে আটকে পড়া ছোটবড় পুকুরের মতো যা জল ছিল, শুকিয়ে গেছে খরায়। তাই অঢেল খোলামেলা জায়গা। যত লোক জুটুক, ভিড় ঘিঞ্জি হয়ে উঠে না। আর মেলার পরমায়ু তো সন্ধ্যাঅব্দি। অন্ধকার ঘন হতে-হতে সব ফাঁকা হয়ে যাবে। হয়তো তখনও জুগজুগ করবে দু'একটা লণ্ঠন। দু'একটা চেরা গলার ডাক। বাড়ি ফেরার। হারানো মানুষ খোঁজার। মড়াখোকো কয়েকটা কুকুর ঘুরঘুর করে। শালপাতার টুকরো, কাগজ, উনুনের ছাই, আর কড়া দুর্গন্ধ। যে যেখানে পেরেছে, কুকম্মটি করে গেছে। বৃষ্টিতেও সে-ঝাঁঝ যায়নি।

তাহলেও এ একটা বিকেলের মতো বিকেল। সন্ধ্যার মতো সন্ধ্যা। মেলা থেকে নিঃঝুম সন্ধ্যায় ভিজে জবুথবু হয়ে যদি না বাড়ি ফিরল, কিসের সুখ?

জীবনে এই প্রথম এতোয়ারি মেলায় এল না। ছোটী মাথা ভেঙে-ভেঙে অবশেষে অঞ্জলার সঙ্গ ধরেছিল। তার ফলে কোণাকোণি আধক্রোশ বালির চড়া ভাঙতে অঞ্জলার কোলের ছেলেটা যা জ্বালাল, মাগো মা! ছোটীকে বার-বার কোলে নিতে হয়েছে। নয়তো অঞ্জলা থল-থলে গতর নিয়ে যেভাবে পা ফেলছিল, পৌঁছবার আগেই মেলা ভেঙে যেত। তার ওপর সামনে কালো মেঘ। চড়ায় বালি উড়তে শুরু হলে সে এক বিপদ। ভূত হয়ে যাবে বলে নয়, চোখ বুজে বসে থাকতে হবে—নয়তো কানা হয়ে যাবে। কিন্তু বরাত ভাল যে ঝড়টা উঠল মেলায় গিয়ে এবং ঝড় প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে এল। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে লাগতে না লাগতে অঞ্জলার বেটা ভ্যা ভ্যা করে বিকট কান্না জুড়ে দিল। তখন অঞ্জলা তাকে দুমদাম পেটাতে-পেটাতে সাধুবাবার আখড়ায় মাথা বাঁচাতে দৌড়ল। সেই ফাঁকে ক্রুদ্ধ ছোটী কেটে পড়েছে। অনেকেই যখন ভিজছে, ভিজে-ভিজে পুজো দিচ্ছে, 'মানসা' করছে—সেই বা ভিজবে না কেন? এমনকি দুআনা দিয়ে গঙ্গামায়ের পুতুলও কিনে ফেলেছে। তালের ছাতার তলায় আগলে নিয়ে বসেছিল লোকটা কিনে আঁচলের তলায় লুকিয়ে পুরুত ঠাকুর বেছে নিয়েছে। অনেক পুরুত ঠাকুর এখন মেলে। বেছে-বেছে বেশ মোটাসোটা একজনকে পছন্দ হয়েছে ছোটীর। চার আনা দক্ষিণা, আর এক আনা ফুল বেলপাতা দুব্বো ঘাস সিঁদুর ইত্যাদির দাম। দাদা তাকে আজ বড় মুখে একটা টাকা দিয়েছে। ছোটী তা ভালকাজেই খরচ করতে চেয়েছিল। এর চেয়ে ভাল কাজ আর কী হতে পারে? আগের-আগের বছর তার দাদা কিংবা মা এসে পুজো দিয়েছে। তার মনেও সাধ হত, যখন বড় হবে, সে নিজেও পুজো দেবে। এবার সে বড় হয়ে গেছে না? শাড়ি পরা ধরেছে। ছোকড়িরা শাড়ি পেলেই বহুড়ি হবার মওকা এসে গেল জীবনে। শাসের কথা ভেবে একটু-আধটু ডর মনের কোণায় থাকবে না, এমন নয়, কিন্তু বহুড়ি হবার যে আরও কত মজা! গায়ে গহনা উঠবে, সিঁথায় সিঁদুর ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে কাঁখে ঘড়া নিয়ে গঙ্গামে নাহানে যাবে, সঙ্গে ননদ-জায়ের দল। বুড়িরা ঘোমটা তুলে চিবুকে আঙুল রেখে মুখখানা দেখবে। তার দিকে তখন গাঁয়ের সবারই নজর। আর শাস যত মন্দই হোক গাছগাছালি লতাপাতার প্রথম ফসলটি নতুন বহুড়িকেই তুলতে বলবে। ছোটীর কত সাফ-সাফ মনে আছে, প্রথম কলার কাঁদিটি তার মা কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটিকেই কাটতে বলেছিল। আনাড়ি বহুদিদির নতুন কাপড়ে কষ লেগে দাগ পড়ে গিয়েছিল। দাগগুলো আর ওঠেনি। চোখ বুজলেই ছোটী দেখতে পায়, ঘোমটার ফাঁকে বহুদিদি কলার সবুজ কাঁদির দিকে তাকিয়ে আছে এক হাতে কাটারি,

ঠোঁটে আধফোটা হাসি, কেমন করে এক প্যাঁচে কাটবে তাই ভাবছে। আর কলাগাছটাও যেন ডর পাচ্ছে না। সেও হাসিমুখে আরেক বহুড়ি সেজে মিষ্টি হেসে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে—তোর জন্যেই তো দিন গুণছিলাম রী! কী ভাবছিস অত? ভারিভুরির নাম নিয়েছিস তো? তাহলেই সব ঠিক আছে।

তবু যদি ডর করো, হাত কাঁপে, তোমার বিপদ। শাস বিগড়ে তো যাবেই, গাছগাছালি লতাপাতা ভি রেগে যাবে। ফলমূল খন্দে 'বরকত' হবে না। এমনকি তোমার বিপদ আরও বাড়িয়ে শুকোতে শুকোতে মরে ভি যাবে। ছেদীলালের বউয়ের বেলা তো তাই হয়েছিল। লাঞ্ছনা গঞ্জনার চোটে মেয়েটা কঞ্চে-ফুলের বিচি ছেঁচে খেতে গিয়েছিল। ধরা পড়ে লাঞ্ছনা আরও বাড়ত। নেহাৎ ছেদীরাম মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে 'আলগ' হয়ে গেল, তাই বাঁচোয়া। কিন্তু দেখগে, ওই বহুর জন্যে ছেদীরামের দুবেলা ভাত জোটানো মুশকিল। কোন পয় নেই। বরকত নেই। গাছের গোড়ায় ইঁদুর লাগে। ফল-ফলারি পাখপাখালিতে খেয়ে ফেলে। কতরকম উপদ্রব ভারিভুরির পুজো দিয়েও কিছু হয় না।

ভাগ্যিস, ছোটীর বহুদিদির হাত কাঁপে নি। ডরায়নি। ফল-মূল-খন্দ-সবজির ফলন বেড়ে গিয়েছিল। খুব পয়মন্ত বরকত-ওয়ালী বহুড়ি ছিল মোড়লের বেটি। সে তো জানে না, শাস মুখে যতই গালমন্দ করুক আড়ালে কত প্রশংসা করেছে ছোটীর সামনে। আবার ছোটীকেও চোখ টিপে শাসিয়েছে, তুই যেন আবার বলে দিসনে রী। তাহলে গুমোরওয়ালী হয়ে যাবে। একে তো বড়ঘরের বেটি!

ছোটী অনেক লুকিয়েছে, অনেক মুখ ফসকে বেরিয়েও গেছে। কিন্তু বহুদিদি এক আজব মেয়ে। শাশুড়ীর প্রশংসায় ওর দৃকপাতই ছিল না। সব কথাতেই খালি—ছোড় দো রী!......

বৃষ্টির মধ্যে পুজো দিতে-দিতে ছোটীর মনে এইসব কত ভাবনাচিন্তা এল, চলে গেল। পুরুতঠাকুর মন্তর পড়ার আগে বলে দিল, মানসা করবি মন খুলে। কেমন? আমি পুজো করি। তারপর ঢুলিকে ঢোল বাজাতে ইশারা দিল। এদিকে সবাই যা করে, ছোটী তাই করল। হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঠেকিয়ে রইল কতক্ষণ। যতক্ষণ না পুরুত বলল, ওঠ, ওঠ। হয়ে গেছে। প্রসাদ নে। উঁহু, আঁচল পাত্। একটা গেরো দিয়ে বাঁধবি যেন।

তখন ছোটী কাঁপছে। কেমন অবশ লাগছে নিজের ছোট্ট শরীরখানা। চোখে বৃষ্টির ঘোরের চেয়ে গভীর একটা ঘোর লেগেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না পষ্টাপষ্টি। কাঁপতে-কাঁপতে আঁচলে প্রসাদ বেঁধে যখন উঠল, মনে হল—ওই যাঃ! চোখ বুজে মাথা ঠেকিয়ে শুধু চুপচাপ পড়েই ছিল যে। 'মানসা' তো করেনি সে! কত কী চাইতে হয় গঙ্গামাঈজীকে। কিচ্ছু চাওয়া তো হল না।

একটুখানি দুঃখের পর ছোটীর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর ভাবল, কী-কী বলার ছিল মানসার সময়, গঙ্গামাইজী কি জানে না সে খবর? নিশ্চয়ই জানে। সে পরমন্ত বরকতওয়ালী বহুড়ি হতে চেয়েছিল। তার দুঃখী এবং বোকার হদ্দ দাদার জন্যে সুখ আর 'জেরাসে আক্কেল' প্রার্থনা করতে চেয়েছিল। আর চেয়েছিল, কল্যবেড়িয়ার মোড়লের বেটি যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিষাদবাগে ফিরে আসে!...

ততক্ষণে সে ভিজে কুঁকড়ে গেছে। গঙ্গার বুকে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া বইছে তুলকালাম। সে পাড় ঘেঁষে ওঠা বিরাট বটগাছটার দিকে দৌড়ুল। পাড়ের ওপর থেকে নীচে গঙ্গাঅব্দি গিজ গিজ ঘুলিয়ে গেছে। ভিড়ের ফাঁকে যেই না সে ঢুকেছে কে তাকে দুহাতে টেনে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

ঘুরে দেখেই ছোটি থ। নিজের চোখকে কয়েকমুহূর্ত বিশ্বাস করতে পারে না। তারপরই সে সবাইকে অবাক করে বুক ফেটে কেঁদে ওঠে—বহুদিদি গে!

তারপর দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ছোটী মুখ গুঁজে দেয় ওর বুকে। হু হু করে কাঁদে। ফুলকলিয়া ছাড়াতে চেষ্টা করে তাকে।—ছোটী! এই ছোটী! শুন্ রী, শুন! আঃ! কী করছিস রী তুই? মেলাখেলা জায়গা! এই ছোটী! চাপা গলায় সে ধমকের সুরে বলতে থাকে এসব কথা।

ছোটী হঠাৎ ওকে খামচাতে শুরু করে। গোঙিয়ে-গোঙিয়ে নাকের জলে চোখের জলে করে শুধু বলে—কাহে? কাহে? কাহে? কেন কেন কেন?

ফুলকলিয়ার কাতুকুতু লাগে। সে হাসতে হাসতে ওর হাত দুটো ধরে ফেলে। তারপর বলে—তুই একেবারে পাগলী রী ছোটী! সিরফ পাগলী! আয়, আমার সঙ্গে—আয় তো! আয়!

সে ছোটীকে টানতে টানতে নিয়ে যায় বৃষ্টির মধ্যে। ফাঁকায় গিয়ে খোলামেলা ঢালু পাড়ে ওঠে। পাড়টা পিছল হয়ে গেছে। বার-বার পা পিছলে যায় দু'জনেরই এবং আছাড়ও খায়। আছাড় খেয়ে ফুলকলিয়া খিলখিল করে হাসে। ছোটী তখন গুম হয়ে গেছে। ওপরে আসল মেলা। ছাউনি বেঁধে দোকানপাট বসেছে। সে-ছাউনি তেরপল করগেট শিট, কিংবা খড়ের টাট—নেহাৎ চট। ফুলকলিয়া মেঠাইয়ের দোকানের সামনে গিয়ে বলে—বোল রী, কী খাবি? মোণ্ডা খাবি, না রসগুল্লা? জিলিপি খাবি? আমার জিলিপি খেতে খুব ভাল লাগে!

ছোটী মাথাটা জোরে দোলায়। তার দৃষ্টি ফুলকলিয়ার কাপড়ের দিকে এখন। সে অবাক হয়ে গেছে। এমন রঙচঙে ফুলকাটা শাড়ি পরেছে বহুদিদি! এতো ভদ্দরলোকের বউ-ঝিরা পরে। ছোটী মায়ের সঙ্গে শহরে গিয়ে ভদ্দরলোকের বউঝি দেখে এসেছে। শরতের বউ নির্মলারও এমন একটা শাড়ি আছে। কখনও কখনও

পরতে দেখেছে তাকে। কিন্তু তার বহুদিদি এমন শাড়ি পরবে, সে ভাবতেই পারেনি। হুঁ, মোড়লের অনেক টাকাকড়ি আছে বটে। কিন্তু এমন শাড়ি তো এতদিন মোড়ল মেয়েকে কিনে ছায়নি।

ছোটীর মন নিরাশায় ভরে গেল। মনে হল, বহুদিদির সঙ্গে তাদের একটা আকাশ-পাতাল ফারাক এনে দিয়েছে এই শাড়িটা। নিষাদবাগে থাকতে কেন এমন শাড়ি পরেনি বহুদিদি? আর বহুদিদির চেহারায়, চোখে-মুখে, হাবভাবেও অন্য এক মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে সে। সেই চেনা বহুদিদির সঙ্গে একটুও মিলছে না। কত সুন্দর লাগছে মোড়লের বেটিকে। এখন যদি ওকে কেউ ভদ্দরলোকের বউঝি ভেবে বসে, তার দোষ নেই। ওদের ভিড়ে ঢুকিয়ে দাও, তুমি খুঁজে বের করতেই পারবে না।

—হ্যা রী? হাঁ করে তাকাচ্ছিস কেন? বল না, কী খাবি?

ছোটী মাথাটা আরও জোরে দোলায়। কিচ্ছু খাবে না। তার মন খারাপ হয়ে গেছে। আর বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভাল লাগছে না। কষ্ট হচ্ছে। শীত করছে। সে অসহায় চাউনিতে এদিক-ওদিক তাকায় আর মাথাটা দোলায়।

ফুলকলিয়ার একটু রাগ হয়। সে বলে—আমি দুসমন হয়ে গেছি রী, তাই তো? বল্ না, তোর মা বারণ করেছে। বেশ, খাসনে!

ছোটির কাঁধে বাঁ হাত রেখেছিল ফুলকলিয়া। হাতটা উঠে যাচ্ছে টের পেয়ে ছোটি নড়ে উঠে। ফুলকলিয়ার কাপড় আঁকড়ে ধরে সে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে—হামার জাড় লাগে বহুদিদি গে!

বৃষ্টি ধরে এসেছে। লোকেরা গাছপালার আশ্রয় থেকে একদু'জন করে বেরিয়ে আসছে। আবার ঢোলে কাঠি পড়েছে। যেসব সাবধানী ঢুলী জল বাঁচাতে ঢোলে কাপড় মুড়ে রেখেছিল, তারা এবার নাচতে-নাচতে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে। ফুলকলিয়া বলল—জাড় লেগেছে, তাই খাবিনে? বোকা মেয়ে। এ দাদা, এক পোয়া জিলিপি দাও!

জিলিপি ঠোঙায় ভরে ওজন করছে মেঠাইওয়ালা। ফুলকলিয়া তারপর ব্লাউসের ভেতর হাত পুরে যা বের করেছে, দেখে তো ছোটি আবার থ। ছোট্ট চামড়ার থলিয়া—থলিয়া না খাপ, কী একটা বটে। ছোটী জিনিসটা দেখেছে। কোথায় দেখেছে মনে নেই, কিন্তু দেখেছে।—ধর না রী, হাঁ করে কী দেখছিস? বলে সেই জিনিসটা থেকে ফুলকলিয়া একটা একটাকিয়া নোট বের করল।

ছোটী ঠোঙাটা নিল। পরক্ষণে মনে পড়ল, হ্যা—অমন জিনিস শরতের কাছে দেখেছে। চৌবেজীর কাছেও দেখেছে! আরে! হাটুয়ার কাছেও তো দেখেছিল! হাটুয়া তার দাদাকে কিনতেও বলেছিল বটে। হাঁ হাঁ—'বেক' বলে ওটাকে। উঁহু

শুধু বেক নয়, কী বেক যেন! ছোটী আরও হতাশ হল বহুদিদি সম্পর্কে। কিন্তু একটু হাসল সে। হেসে ফিসফিস করে বলে—বেক রী বহুদিদি?

ফুলকলিয়া ভাঙানি গুণতে বেশ সময় নিল। তারপর ছোটীর কাঁধে আবার হাত রেখে বলে—বিষ্টি ছেড়ে গেল রী! মেলা খুব জমবে। আয়, সাধুবাবার ওখানে যাই! টিউবেল আছে।

পেছনে বাঁশবনের ওপর এইসময় মেঘ ভেঙে সূর্যের ঝিলিক দেখা দিয়েছে। ঝলমলে সোনালি রোদ পড়ল কতদূর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। নিষাদবাগের দিকে তখন বৃষ্টির ছাইরঙ মেখে রয়েছে। এমন কি চড়ার ওপাশে বৃষ্টির রেখাগুলোও দেখা যাচ্ছে। ফুলকলিয়া হাসতে হাসতে বলে—উ দেখ! খেঁকশিয়ালের বিভা হচ্ছে! রোদমে বর্ষালে খেঁকশিয়ালের বিভা হয় জানিস তো?

ছোটী ঘাড় নেড়ে বলে—বেক কিনেছিস বহুদিদি?

ফুলকলিয়া বলে—মনিবেক? হাঁ রী। সেদিন শহরমে গেলাম। গিয়ে কিনলাম।

—শহরমে? কিসকা সাথ গেলি বহুদিদি?

ফুলকলিয়া দুষ্টুমির ভঙ্গীতে হেসে বলে-তোর মাকে গিয়ে সব বলবি তো! বলিস! হামি রোজ শহরমে যাই। সেনিমা দেখি!

ছোটীর এখন মুখ ফুটে গেছে। ওকে সবাই বলে 'কটকটি' মেয়ে। কটরকটর করে কথা বলতে ওস্তাদ। এখন সে সেই কটর কটর শুরু করেছে।—রোজ যাস! সেনিমা দেখিস?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলিস তোর মাকে।

—একেলা যাস, বহুদিদি?

—হুঁউ।

—ঝুট।

—কাহে ঝুট? শহর তো হুউ নজদিগমে। এ তো তোদের নিষাদবাগ না। রাধার ঘাটে গেলাম, না নৌকোয় চাপলাম। নৌকোয় চাপলাম না শহরমে পঁহুছেলাম।...... বলে ফুলকলিয়া ছোটীর মুখটা খামছে ধরে। —মায়ের হয়ে বেটি এসেছে বাত করতে!

সাধুবাবার আখড়ার গেটে ঢুকতে-ঢুকতে ছোটী বলে—হামাকে ছেনিমা দেখাস বহুদিদি।

—দেখাব। আসিস।......বলে ফুলকলিয়া টিউবেলের দিকে এগিয়ে যায়। গাঁদাফুলের বাগান করেছে সাধুবাবা। বাগানের কোণায় টিউবেল। তার পিছনে গোড়াবাঁধানো ঝাঁকড়া বটগাছ—যার শেকড় বাকড় ওপাশে গাঙ্গয়ে নেমে গেছে। বাঁধানো চত্বরে বসে

কেউ কেউ মেঠাই খাচ্ছে। আখড়ার মঠের সামনে সামিয়ানার তলায় খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তন হচ্ছে। অন্য পাশে ঢোলকাঁসি বাজছে। পুজো হচ্ছে গঙ্গামাইজীর। ফুলকলিয়া গিয়ে বসে পড়ে। ছোটীকেও বসায়। তারপর জিলিপি তুলে নিয়ে বলে—খা রী!

খেতে ইচ্ছে করছে না, অথচ জিলিপি বড় লোভের খাবার। আজকাল তো আর মেঠাই খাওয়াই হয় না ছোটীর। আগে দাদা গাঁওয়াল থেকে ফেরার সময় তার জন্যে কিছু না কিছু আনতই। মোণ্ডা হোক, কদমা হোক, জিলিপি হোক, কিংবা অগত্যা তেলেভাজার 'মেঠাই'। আজকাল আনতে ভুলে যায়। ছোটীর মনে হয়েছে, আসলে বহুদিদির জন্যেই আনত যেন।

তা হোক, তার দাদা খুব ভাল মানুষ। বোকার হদ্দ, এই যা। ছোটীর আবার মন খারাপ করে। আহা, কতদিন ধরে গঙ্গাপুজোর মুখ তাকিয়ে ছিল। পুজো দেখে রাতে যদি গানের আসর বসে, গান শুনবে। শুনে বাড়ি নাই বা ফিরল। পাশেই তো বহুদিদির বাপের বাড়ি।

—তুই খাচ্ছিস না কাহে রী? খা বলছি! ফুলকলিয়া জোর করে ওর মুখে জিলিপি গুঁজে দেয়। আবার বলে—মা বারণ করেছে, এই তো?

ছোটী মাথা দোলায়। কেন যে খেতে ভাল লাগছে না, বুঝিয়ে বলা ওর পক্ষে মুশকিল। সে অন্য কথা বলে—মেলায় তুই একেলা এসেছিস বহুদিদি?

—হ্যা। একেলা আসব না কেন? ওই তো নারকেল গাছের ডগা দেখতে পাচ্ছিস, ওই তো আমাদের বাড়ির গাছ।

গাছটা দেখে ছোটীর কত কথা মনে পড়ছে। পয়সাওলা বড়বাড়িতে কুটুম্বিতে করার কত যে আনন্দ আছে। ছোটীর সখ ছিল, কয়েকটা দিন কলাবেড়িয়ায় যেন তার বেড়াতে যাওয়ার বরাত হয়। শনবাবা তাকে কত ভালবাসে। কতবার যেতে বলেছে। কত বেশিদিন থাকতে বলেছে। মায়ের জন্যে সে সাধ মেটেনি। মা কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না। যদি বা দেয়, একবেলার বেশি থাকতেও বারণ। এখন যদি তাকে বহুদিদি তাদের বাড়ি নিয়ে যায়, সে যাবে, না যাবে না? খুব ভাবনায় পড়ে গেল ছোটী। নিয়ে গেলে সে খুবই খুশি হবে। কিন্তু তার যাওয়া কি উচিত হবে?

জিলিপিগুলোর বেশিটাই খেল ফুলকলিয়া। তারপর টিউবেলে জল খেল। জল খেয়ে ফুলকলিয়া বলল—সাধুবাবাকে দেখবি রী?

ছোটীর দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তক্ষুণি বহুদিদির মত বদলেছে। এদিকওদিক তাকিয়ে গাঁদাগাছের কাছ ঘেঁষে যেতে যেতে সে পটাপট দুটো ফুল ছিঁড়ে মুঠোয় লুকোয়। তারপর গেট পেরিয়ে মেলায় ঢোকে। একখানে ভিড় জমেছে। ভৈরবীর

ভর উঠেছে। জটা নেড়ে ভীষণ তুলছে। ফুলকলিয়া উঁকি মেরে দেখতে থাকে। ছোটী তার কাঁধ ধরে দু'পায়ে বুড়ো আঙুলে ভর দেয়। কিন্তু লোকগুলো যা উঁচু। এই সময় ফুলকলিয়া কাকে ধমকায়—চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না। খালি গায়ের ওপর পড়ছ?

বহুদিদির মুখে চাঁই-বোলিতে কথা শুনতে অভ্যস্ত ছোটী। এখন পরিষ্কার দেশোয়ালি বোলিতে কথা বলতে শুনে অবাক হয়। ফুলকলিয়া একেবারে দালালবউ নির্মলা হয়ে গেছে যেন। সে তার হাত ধরে সরে আসে ভিড় থেকে। মুখে বিরক্তির ভাব। চাপা গলায় বলে—যেখানে যাচ্ছি, গায়ের ওপর এসে পড়ছে মরদগুলো। আর চোখের নজর দেখছিস? যেন গিলে খাবে।

গঙ্গার চড়ায় গিয়ে পুজো দেখতে দেখতে 'ঘোরানি' এসে গেল। সূর্য বাঁশবনের ওধারে ডুবে গেছে। ঘন কালো মেঘের মাথায় লাল হলুদ রঙ খাপচাখাপচা লেগে আছে। হাওয়া দিচ্ছে জোরে। বৃষ্টি আবার হয়তো আসবে। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফুলকলিয়া বলে—কাপড় শুকিয়ে গেছে আমার। দেখি, তোর শুকিয়েছে নাকি?

ছোটী তার ডুরে তাঁতের শাড়ি পরখ করে বলে—হাঁ রী বহুদিদি।

—আমার শাড়িটা কেমন হয়েছে বলতো ছোটী?

—খুব ভাল বহুদিদি! কেত্তা দাম রী?

—এগারো রূপেয়া।

—এগারো কেত্তা রা?

—আধমণ ছোলার দাম। ফুলকলিয়া গর্বের সঙ্গে বলে।

—আধমণ কেত্তারী?

ফুলকলিয়া ননদের অজ্ঞতায় হাসে। হেসে বলে—তোদের বাড়িতে যে বেতের কাঠা আছে, তার বিশ কাঠা।

ছোটী কি বিশ গুণতে শিখেছে এখনও? সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তখন ফুলকলিয়া হাসতে হাসতে হাঁটু দুমড়ে বসে বালি জড়ো করতে থাকে। বলে—দেখ বিশ কাঠা কেত্তা ছোলা।

বালির স্তূপ দেখে কিশোরী ননদ অবাক।—ওত্তা রী বহুদিদি! মা গে মা ওত্তা খন্দ দেকে শাড়ি কিনেছিস?

বালি ঝাড়তে ঝাড়তে ফুলকলিয়া উঠে দাঁড়ায়। বলে ভাল লেগেছে, কিনেছি। তোরা তো কিনে দিতিস নে। থাম, থাম। এ শাড়ি কিনতে হলে তোর মায়ের কোঠি ভি (মাটির জালা) বেচতে হত!

হাসতে হাসতেই বলে! কিন্তু ছোটী খোঁটা দেওয়া হচ্ছে ভেবে দুঃখিত হয়ে জবাব

দেয়—তোর বাবা বড়া আদমি। আমরা কি বড়া আদমি? আমার দাদা গাঁওয়ালা করে খায়। সে তো মুখিয়ার বেটা সুরয নয়!

ফুলকলিয়া ভুরু কুঁচকে দুষ্টুমি করে তাকিয়ে শুনছিল। এবার ওরে মুখ থামচে ধরে বলে—হয়েছে, হয়েছে। থাম। সুরযের কথা তুলছিস কেন? হাঁ রী ছোটী, সুরযের বিভার কথা শুনে এসেছিলাম, কী হল?

ছোটী বলে—বিভা নেহি দিবে রী বহুদিদি। কাপাসীর পুরণের বেটিকেও পসন্দ হয়নি। মালতীর মা বলছিল, সুরযুয়া ভিনজাতে বিভা করবে।

—বলিস কী!

—হাঁ রী বহুদিদি। লিখাপড়হা ভদ্দরলোকের বেটি ওর পছন্দ। মালতীর মা বলছিল। ফুলকলিয়াকে একটু আনমনা দেখায়। আবছা অন্ধকারে ওর মুখের রেখা বোঝা যায় না। একটু পরে বলে—কোন দেগা উসকো? ছোড় বড়া-বড়া বাত! বাঙ্গালী লোকে ওকে বেটি দেবে?

—বাঙ্গালী কোন রী বহুদিদি?

তুই বড্ড বোকা ছোটী। কিচ্ছু জানিস নে।

—ছোটী অপ্রস্তুত হয়ে বলে—শুনেছি, শুনেছি। সবাই তো বাঙালীঠো বলে। লেকিন বহুদিদি, আমি ভেবেই পাই না, কৌন বাঙালী!

—দেশোয়ালি লোকদের বাঙালী বলে। বুঝেছিস?

—হো গা।

—হো গা নেহি রী ছোকড়ি! উ দেখ, উও সব বাঙ্গালী। ···বলেই হঠাৎ ফুলকলিয়া ছোটীকে টানে। টেনে পাড়ের দিকে হন হন করে এগিয়ে যায়।

ছোটীর মনে হয়, বহুদিদি যেন ভেগে যাচ্ছে হঠাৎ। ওপরে গিয়েও ফুলকলিয়া দাঁড়ায় না। মেলার শেষদিকটায় বাঁশবনের ধারে কাঁচা রাস্তা। রাস্তায় গিয়ে ফিসফিস করে বলে—তোদের গাঁওবালাবাও এসেছে দেখলাম!

—এসেছে। আসবেই তো। কাহে ওকথা বলছিস বহুদিদি?

—তুই কার সঙ্গে এসেছিস?

—অঞ্চলার সঙ্গে। বিষ্টির সময় অঞ্চলাকে আর খুঁজেই পেলাম না। ছোটী অবাক হয়েছে অবশ্য। হঠাৎ কেন একথা বলছে মোড়লের বেটি, সে বুঝতে পারে না। তাই ফের বলে—কাহে পুছ করছিস বহুদিদি?

—ছোটী, একবাত শুন। ·······...ফুলকলিয়া ফিসফিস করে বলতে থাকে। বাবা বারণ করে একেলা ঘুরে বেড়াতে। নিষাদবাগওলা দেখলে পাকড়ে নিয়ে যাবে নাকি! আমি ডর পাই না, জানিস তো?

ছোটী তাকায় মুখের দিকে। কিছু বলে না।

—চড়ায় তোদের গাঁওবালা ছুতিনজনকে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ফুসুর-ফুসুর করছে।······বলে ফুলকলিয়া একটা ভঙ্গী করল কাঁধ আর হাত নেড়ে।

হুঁঃ! এপারে আমার গায়ে কেউ হাত দেবে, এত তাকত কারুর নেই। ওই তো দেখছিস। কলাবেড়িয়ার কত লোক রয়েছে মেলায়।

ছোটী এবার ফোঁস করে ওঠে—ওসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কেন রী বহুদিদি? আমি ওসবের কী জানি?

—সাচ্ বল্ ছোটী, নিষাদবাগওয়ালা কোন মতলবে আসেনি তো মেলায়?

ছোটী জোরে মাথা দোলায়।—না রী, না। ভারি-ভুরির কসম। ঠাকুরবাবার কসম। গঙ্গামাইজীর কসম।

—খুব হয়েছে। আর কসম খেতে হবে না। ফুলকলিয়া এদিকওদিক তাকিয়ে বলে—তুই এখন কী করবি? বাড়ি যাবি তো?

—তুই কী করবি?

—আমায় কেমন যেন লাগছে। আমি বাড়ি চলে যাই, ছোটী।

ছোটী ভেবে পায় না, কী করবে। বহুদিদির সঙ্গ ছাড়া হবার কথা সে ভাবতেই পারছে না। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার একটু ঘন হয়েছে। মেলায় ভিড় কমতে লেগেছে। আলোও জ্বলেছে এখানে ওখানে। একটু পরেই তো মেলা ভেঙে যাবে। ছোটী দেখে, ফুলকলিয়া চলে যেতে পা বাড়িয়েছে। অমনি সে কেঁদে ওঠে প্রায়। বহুদিদি! বহুদিদি!

—কী হল রী?

—আমি একা বাড়ি যাব কেমন করে?

—তবে আমার সঙ্গে আয়।······

ননদকে এতদিন পরে পেয়ে ফুলকলিয়ারও ইচ্ছে করছিল না সঙ্গ ছাড়ে। নিষাদ-বাগের জীবনে ছুটি মেয়ের সঙ্গ তাকে ভাল লেগেছিল। শরত দালালের বউ, আর এই ছোটী। তবে নির্মলাকে তার তখন যত ভালই লাগুক, একটুআধটু গা'ছমছম ভাব ছিলই। ছোটীর বেলায় তা নয়। এই মেয়েটিকে মাঝে মাঝে মনের কথা খুলে বলেছে। সে কিন্তু মুখ ফসকে সেগুলো তার মায়ের কানে তোলেনি। তার চেয়ে বড় কথা, ছোটী কথায় কথায় ফচকেমি করে ছুঃখের মধ্যেও তাকে হাসিয়ে নাকাল করেছে। বাপের বাড়ি চলে এসেছে বটে, ছোটীর কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়েছে। একটু মন কেমনও করেছে। তাই আজ ছোটীকে কাছে দেখার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়েছে।

রাস্তায় মেলা থেকে যাওয়া লোকের ভিড় আছে। কাচ্চাবাচ্চারা বাঁশিতে ফুঁ দিতে

দিতে মনের সুখে বাড়ি ফিরছে। কলবলিয়ে কথা বলছে মুখরা মেয়েরা। কার বাচ্চা বেজায় কান্নাকাটি করছে। সে থাপ্পড় মারতে-মারতে নিয়ে যাচ্ছে। শাসাচ্ছে, ফের যদি মেলায় আনে! অন্ধকার রাস্তায় এইসব শুনতে শুনতে ননদ-ভাজে বেশ জোরে এগোচ্ছিলো। বাঁদিকে কিছুদূর ফাঁকা—নীচেই গঙ্গা, ডাইনে ক্ষেতখামার, তারপর তারা কলাবেড়িয়া ঢুকল। সামনেই মান্তবরের বাড়ি। আর ডর কিসের ফুলকলিয়ার? হাঁটল। ওইরকম আচমকা ডর পেয়ে ভেগেছে মনে পড়ে ছোটীকে দু'হাতে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে খুব হাসল। ছোটী বলল—হাস গেইলা কাহে রী বহুদিদি?

ফুলকলিয়া তার জবাব দিল না। ছোটীর চুল শুঁকে বলল—তোর মা তোকে আর নিমের তেল মাখায় না?

—না রী। পরশু আমলাবাঁটা দিয়েছিলাম। গন্ধ পাচ্ছিস না?

—আমার চুলে আবার উকুন ধরাস নে, বলে দিচ্ছি।

—ভাগ্! আর উকুন কোথায়? সব মরে গেছে কবে।······বলে ছোটী দুহাতে বহুদিদির মাথা ধরে টেনে শুঁকতে থাকে। তারপর বলে—ও রী বহুদিদি! তুই গন্ধতেল মেখেছিস শরতের বহুর মতন! তাই ভাবছি তখন থেকে, কিসের গন্ধ? বহুদিদি, ও গে! আমাকে একটু গন্ধতেল দিবি?

মান্তবরের কুকুর কালুয়া দরজার সামনে দুঠ্যাং খাড়া রেখে পেছনের ঠ্যাং দু'টো ভাঁজ করে বসে ছিল। চাপা গর গর শব্দ করল। সে ওই ছোটীর জন্যে। ছোটী কুকুরটা চেনে। বলল—কালুয়া না রী?

উঠোনে আলোর ছটা পড়েছে। দরজা খোলা। ফুলকলিয়ার সাড়া পেয়ে মান্তবর বলল—হয়ে গেল মেলা দেখা? সরযুয়া কই? ওটা কে রে? বুঁচি নাকি? না চামেলী?

ছোটী চুপ। ফুলকলিয়া ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—না। ছোটী।

—ছোটী? নিষাদবাগের?

—হাঁ গে বাবা। মেলা দেখতে এসেছিল একেলা। ধরে আনলাম।

—আয়, বেটি আয়। মান্তবর খুশি হয়ে ডাকে। তোর মা ভাল আছে?

ছোটী টের পায়, জামাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে না মোড়ল। সে একটু হেসে বলে—শুন্ বাবা, আমি বহুদিদিকে নিতে এসেছি।

মান্তবর হো হো করে হেসে ওঠে। ফুলকলিয়া তাকে ছেড়ে দাওয়ায় উঠেছে সবে, ঘুরে দাঁড়ায়। মান্তবর হাসতে হাসতে বলে—ওরে হামার বুঢ়িয়া বেটি রে! ওরে হামার কটকটিয়া রে! বহুদিদিকে নিতে এসে রে! তো কুটুমতালি কর। ভোজ-পান খা।

ছোটী দেখে, বহুদিদি কেমন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আবার কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করতেই রুষ্ট ফুলকলিয়া বলে—হুঁ, আঁধারে ছেড়ে দিয়ে এলেই ভাল হত রী! ভুতপেরতে ছিঁড়ে খেত, সেটাই ভাল হত। এসেই আপন রূপ ধরেছে নিষাদবাগের বেটি!

ছোটী কথাটা বলেই বুঝেছে, ঠিক করে নি। কেনই বা বলল? সে অপ্রস্তুত হয়ে উঠোনের কাদায় পা ঘষে। মান্তবর ধমক দিয়ে বেটিকে বলে—চুপ তো বাবা। পা ধোবার জলটল দে বেচারীকে। ওর কি কিছু বোঝবার বয়েস হয়েছে? বলেছে, বলেছে। মা ছোটী, যাও। পা ধোও গে।

ছোটী যাচ্ছে না দেখে মান্তবর ওর কাঁধ ধরে ঠেলে দাওয়ার দিকে নিয়ে যায়।……

## ॥ বারো ॥

একটু পরেই ছোটীর মন খারাপটুকু কেটে যায়। বহুদিদি তাকে এমন সুরে কথা কি এই নতুন বলল নাকি? এর চেয়ে কত খারাপ-খারাপ খোঁটা দিয়েছে নিষাদবাগে থাকতে! তাতে ছোটী যখন রাগ করেনি, এখন তার রাগ করা সাজে না। তবে এ তো নিষাদবাগ নয়, কলাবেড়িয়া। সে জন্যেই একটু দুখ বেজেছিল। তারপর বহুদিদি যখন তার পায়ে জল ঢেলে দিতে দিতে একটু জল আঙুলের ডগা থেকে মাথাতেও ফেলল, তখন ছোটীর মুখে হাসি ফুটল। মুখ তুলে দেখল, বহুদিদি ঠোঁটের কোণায় হাসছে। আহা, এই হাসিতে না জানি কী আছে গে, ছোটী তার ছোট্ট দুনিয়া ঢুঁড়ে তো কোথাও পাবে না। বীজ থেকে আঁকুর মুখিয়ে উঠলে ছোটীর যে খুশি আর বিস্ময় প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা ঠোঁটে পড়লে যে বুকের ভেতর দুলে ওঠা, ওই হাসিতে তাই আছে।

কুটুমের খাতিরে রাতে ভাত চাপল হাঁড়িতে, এও কম কথা নয়। ফুলকলিয়া বাপের বাড়ি এসে এবার বেশিরকমের আলসে হয়েছে। দুপুরের ভাতে জল দিয়ে রাখে। রাতে বাপবেটিতে খায়। তরকারিও থেকে যায়। আজ ছোটীর জন্যে রান্নাকালে রাতের বেলা উনুন ধরেছে। এনামেলের হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে। ফুলকলিয়া পিঁড়িতে বসে ঘুঁটে মাখানো পাটকাঠির আঁটি ঠেলে দিচ্ছে উনুনে আর ছোটী তার কাছে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে। কালুয়া দাওয়ার ওকোণায় বসে আছে চুপচাপ। মান্তবর মোড়ায় বসেছে শনের দড়ি পাকাতে। হেরিকেন জ্বলছে তার পায়ের কাছে। আর লম্ফ জ্বলছে উনুনের পাশের দেয়ালের তাকে। তাকটা তিনকোণা। কালি জমে

আছে চাপচাপ। তা হোক। এই তো হল গিয়ে বড়লোকী! নিষাদবাগে সরস্বতী বুড়িতো খুব বেশি দরকার না হলে লম্ফ জ্বালবেই না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাতের খাওয়া ঝটপট খাইয়ে দেবে। আর আঁধার আসতে-আসতেই শুয়ে পড়ার হুকুম। অথচ এ বাড়িতে রাতের বেলা যে চুলা জ্বলে, তার প্রমাণ ওই তিনকোণা তাকের কালি। আরও প্রমাণ ওই হেরিকেনটা। ঝকঝকে কাচ। একটুও টুটা-ফাটা নয়। কত বড় বাড়ি, যেন ছোট্ট একটা চাঁদ। ছোটীদের একটা হেরিকেন অবশ্য আছে। সেটা এমন পেটচাঁছা নয়। বেঁটে আর জালার মতো পেট। ছোটীর বাবা নাকি কিনেছিল কবে সুখের বছরে। তার আদত কাচটা এখনও আছে। বার দুই আছাড় খেয়ে কাচ ফেটেছিল। একবার ছোটীর বাবা নাকছেদী সাপ দেখে ঝটপট জ্বালতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছিল ঘরের চৌকাঠে, আরেকবার তার ছেলে এতোয়ারি বর্ষার রাতে পাকা তাল কুড়োতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। তবু ঘাট, কাঁচ টিকে আছে এই খুব। আরও ভাঙার ভয়ে সরস্বতী লণ্ঠনটা জ্বালতেও দেবে না, কাচও মুছতে বারণ করবে। তাই যদি বা কখনও জ্বলে—যেমন বিয়ের সময় জ্বালতে হয়েছিল, বাত্তিঠো কালির তলায় আধমরা হয়ে থাকবে।

তাল কুড়োবার কথা মনে আসতেই ছোটির মনে আচমকা একটা সাধ গরগর করে উঠেছিল। বর্ষা আসছে। বাঁধের তালগাছগুলোতে তাল ফলেছে প্রচুর। বহুদিদিকে নিয়ে বৃষ্টির রাতে পাকা তাল কুড়োবার কথা ছিল যে! সেই কত সন্ধ্যারাতে বাঁধের ওদিকে 'মাঠ মারতে' গিয়ে ননদভাজে কত জল্পনাও তো হয়ে গেছে। বহুদিদিকে মনে করিয়ে দেবে কথাটা?

কিন্তু সাহস পেল না মোটে। বহুদিদি আর আগের মতো নেই, সে কতভাবে টের পেয়েছে। আর এতো ওর বাপের বাড়ি! শাস নেই মাথার ওপর, মরদও নেই। মাথার ঘোমটা নেই। পড়শীদের নজর নেই। চেহারা বর্ষার নদীর মতো জোরালো চনচনে ভাব। ছোটী আড়চোখে বহুদিদিকে দেখতে থাকে। খুশি হয়। নিজেরই বহুদিদি বলে গরব জাগে। আবার তক্ষুণি মনে পড়ে যায়, কেমন করে স্যুটকেস হাতে নিয়ে চড়ায় ভেগে যাচ্ছিল দিনদুপুরে! ভেগে যাওয়া বহুগুলোকেই তো 'হুড়কি' বলে! এই মেয়েটি যে একজন হুড়কি, ভাবতেই পারছে না।

এইসময় মাস্তবর ডাকে—বেটি ছোটী রী!

ছোটী আনমনে সাড়া দেয়—উঁ?

—বাড়িতে বলে আসিস নি! খুব শোচ করবে। বুঝলি তো? খোঁজ খবর করবে।..... বলেই মাস্তবর একটু হাসে। করুক না খোঁজখবর। বুড়ির বেটীকে আমরা কুঠিতে (মাটির জালায়) লুকিয়ে রাখব!

ফুলকলিয়া বলে—ওর মায়ের যা মুখোঁড়া ! গালমন্দ করবে।

মান্তবর তক্ষুণি গম্ভীর হয় :—হুঁ তা করবে। খুব পৌঁহাতে আমি এগিয়ে দিয়ে আসব। মেলাখোলা জায়গা কি না। শোচ করবে না কেন ? লেকিন ছোটী তুই কিছু শোচ করিসনে বেটি। তুই খাওয়াদাওয়া করে আচ্ছাসে নিদ যা। কেমন ?

ছোটী মাথা দোলায়। হুঁ, এটা সে এতক্ষণ ভাবেইনি। এবার ভাবনায় পড়ে যায়। ফুলকলিয়া একটু পরে ঘুরে ওকে দেখে। তারপর খুঁচিয়ে দিয়ে বলে—ক্যা রী ? কেঁদে ফেললি নাকি বুঢ়িয়ার ডরে ? যোয়ান মেয়ে হয়েছিস, ঔরৎ বনে গেছিস। আর কিসের ডর রী ?

তখন ছোটী হাসে। বহুদিদির কথায়, চোখের দৃষ্টিতে কত যে সাহস আছে, তুমি চাইলেই কুড়িয়ে নিতে পারো। সে বলে—ভাগ্, ভাগ্ ! আমার ডর লাগে না। ··

বড়ঘরের সবকিছু সে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। তারিয়ে-তারিয়ে স্বাদ নিচ্ছিল। রান্নাশাল, দাওয়ার তাকে রাখা কত শিশিবোতল, উঠোনের মড়াই, চালের ভেতরদিকে বাতায় গুঁজে রাখা পাচনবাড়ি ছোট্ট খুরপি, কাস্তে, একটা মাছধরা জাল, মাথালি, কী পাখির একগোছা রঙীন পালক—এইরকম কত কী জিনিস ! লালহলুদ নীল চুলের ফিতে পর্যন্ত ! মান্তবর দুবার গোয়ালঘর ঘুরে এল। ছোটীর দেখতে ইচ্ছে করছিল, কতগুলো গরু আছে। নিষাদবাগের মুখিয়ার চেয়ে বেশি, না কম। আর এইসব দেখতে দেখতে মনের তলায় সরমজড়ানো আবছা সাধ নড়ে উঠছিল, ঘাসের মধ্যে ঘাসফড়িংটা যেমন নড়ে-চড়ে। এমন বাড়িতে যদি তার বিভা হয়, কত ভাল হয় ! শাস নেই, এমন ভালমানুষ শ্বশুর, আর এমন দেখনসরুত ফর্সা চিকনচাকন ননদ ! আর কী চাই রী ? সাতবেটার মা হোক না হোক, হেসেখেলে দিনগুলো রাতগুলো কীভাবে যে কেটে যাবে !

ছোটীর এই চুপচাপ ভাব ফুলকলিয়ার চোখে পড়েছে। বলে—বাড়ির জন্ম মন খারাপ করে তো বল রী, বাবা তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে !

ছোটী অমনি ব্যস্তভাবে বলে—না, না।

—তর শোচ করছিস এত্তা ?

—কুছ নেহি বহুদিদি !

মান্তবরের এক স্বভাব। খেয়েদেয়ে কালুয়াকে নিয়ে গঙ্গার ওদিকে 'মাঠ মারতে' গেল। দু'জনে মুখোমুখি হাত-পা ছড়িয়ে খেতে বসল। পাবদা মাছ, ছোলার ডালে ঝিঙে, বিশেষ পদহিসেবে পটল পুড়িয়ে 'ভত্তা'। ছোটী ভেবেছিল দারুণরকম খাবে। কিন্তু পারল না। বারবার তার মুখের তাল কেটে কেটে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, তলায় কোথায় একটা বড় ফাঁক আছে। মন ভরেও ভরছে না। ফুলকলিয়া

ধমক দিয়েও তেমন কিছু খাওয়াতে পারল না। সে তো অবাকই হল বরং। এই মেয়েটার খাওয়া সে নিষাদবাগে দেখেছে। তার দুগুণ খায়! আর খাওয়াটাই বা কী? একটুখানি ডাল সেদ্ধ, একটা-দুটো ছ্যাঁচড়া তরকারি। মাছ তো রাজার ভোগ সেখানে। মেছুনী গাঁয়ে এলে সরস্বতীর বাড়ি ঢুকবেই না। আর যদি বা বুড়ি মাছ কেনে, গুণে-গুণে গোটাকতক খলসেপুঁটি, নয়তো চিংড়ি। তার বদলে কাঁচকলা, একফালি কুমড়ো কিংবা কিছু ঝিঙে দেবে। দেবে কি সহজে? বচসা হবে। তকরার চলবে আধঘণ্টাতক। তারপর ফয়সালা হবে। কেন মেছুনী ওকে লুকিয়ে অন্য বাড়ি ঢুকবে না? অবশ্য এতোয়ারি কোন কোনদিন গঙ্গার দহে কুঁড়োজালি পেতে সন্ধ্যাবেলায় চিংড়ি ধরে আনে…

খাওয়ার পর ফুলকলিয়া ঘরে ঢুকল ছোটীকে নিয়ে। ঘরের ভেতর কেমন একটা গন্ধ। ছোটীর কাছে এই হল গিয়ে গেরস্থ-গেরস্থ গন্ধ। ধনপতির বাড়ি গিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে এই গন্ধ সে শোঁকে। এ গন্ধে তার মতো সব ছোটঘরের মেয়েরই মন কেমন করার কথা। ঘরে অনেক ধন্দ-বোঝাই কুঠি, গুড়ের জালা, মুড়ির টিন, সিন্দুক, মেঝেয় বালি বিছিয়ে রেখে তার ওপর আলু আর পেঁয়াজ রসুন, ঝুলন্ত রঙীন সিকেয় নকসাকাটা হাঁড়ি—না জানি কী মোওয়ামেঠাইয়ে ভরা। বাঁশের আলনায় কত কাপড়চোপড়। তাকে অত বড় একটা আয়না। ছোটী লম্ফের আলোয় মুগ্ধ দৃষ্টে দেখতে থাকে। এই ঘরের কথা তার আবছা মনে ছিল। কিছু মনেথাকা ঘর এবং তার জিনিসপত্তর এখন একপলকেই তুচ্ছ হয়ে গেছে আসলের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। দাদাটা বেকার হদ্দ। ছোটী ভাবে। এমন ঘরে কেন সে আসতে চাইছে না! ফিরে গিয়ে দাদাকে বলবেই বলবে—এ দাদা, তুই কারও বাত কানে নিসনে। চলে যা কলাবেড়িয়ায়।

সব চেয়ে খুশির ব্যাপার, তক্তাপোষ। তক্তাপোষে শোবে ছোটী! সুজনী কাঁথায় বিছানা। লাল নকসা আঁকা ধবধবে বালিশ। এ কি স্বপ্ন! যে মেয়ে এমন বিছানায় শুয়েছে, নিষাদবাগে মেঝেয় আজেবাজে ধুকড় কাঁথায় কিংবা খালি চাটাইয়ে কত কষ্টে না কাটিয়েছে!

বালিশের ওয়াড় দুটো ছোটী নির্লজ্জ হয়ে শুঁকল। ফুলকলিয়া বলে—সেদিন টাউন থেকে কিনে এনেছি, বুঝলি ছোটী?

—কেত্তা দাম রী বহুদিদি?

—দাম শুনলে তো তুই আবার ঝামেলা করবি। ফুলকলিয়া হাসতে হাসতে বলে। দশ আনা চাইছিল। নিম্মলাদিদি আঠ আনায় ফয়সালা করল। দো আঠ আনা কিত্তা বোল তো? এক রূপেয়া।

ছোটী অবাক হয়ে বলে—শরতের বহুকে কোথায় পেলি আবার?

—কেন ? সে তো হরঘড়ি যানা-আনা করে টাউনে। গেলেই দেখা হয়।

—তুই একেলা টাউনে যাস, বহুদিদি ?

—ফের ওই কথা ! যাই যাই যাই। হয়েছে তো ?

ছোটী ওর ভঙ্গী দেখে আবার ঘাবড়ে যায়। একটু পরে বলে—বহুদিদি।

ফুলকলিয়া ওকে চেপে ধরে শুইয়ে দেয় বিছানায়।—খালি বহুদিদি আর বহুদিদি ! শুত্‌ যা। ছেনিমার গপ্‌ শুন।

ছোটী চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ফুলকলিয়া ওর পাশে বসে গুণ-গুণ করে ওঠে। ছোটীর মনে পড়ে মুখিয়ার বেটির বিয়েতে বহুদিদি বেপরোয়া নেচেছিল। গলা কাঁপিয়ে কতরাত অব্দি গান গেয়েছিল। নতুন বউ বলে এতটুকু শরম করেনি। ছোটীর ঘুম পাচ্ছিল। মায়ের ভয়ে চলে এসেছিল। বহুদিদি আর সেরাতে বাড়িই ফেরেনি। তা নিয়ে কত ঝামেলা। মা ওকে চুল ধরে মার লাগিয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে বলেই এখন খারাপ লাগে। কার গায়ে হাত তুলেছিল তার মা !

তারপর আর নিরিবিলি জায়গাতেও গান গাওয়াতে পারেনি। অত ভাল গান নিষাদবাগের মেয়েরা জানেই না। নাচতেও পারে না অমন করে। এতদিন পরে আবার গান গাইছে ও। ছোটীর খুব ভাল লাগল।

কিন্তু এ গান কী গান ! এর সুর যে অন্যরকম। কলের গানের মতো। এর কথা সে বুঝতেই পারছে না। ছোটী অবাক, একশো অবাক। দু'কলি গেয়েই ফুলকলিয়া বলে—ছেনিমার গান। বুঝলি তো ? এবার গপ্‌টা শুন।

শুনতে শুনতে কখন ঘুমে কাঠ হয়ে গেছে ছোটী। ফুলকলিয়া দুবার ডেকে বাইরে যায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ায় খুঁটি ধরে। অপমানে গুণ-গুণ করে আবার গান গায়। তারপর খেয়াল হয়—ওই যাঃ ! দুধ খাওয়া হয়নি।

সে রান্নাশালে লম্ফ হাতে যায়। বাবার জন্যে গেলাসে দুধ ঢেলে রাখে। বাকিটুকু খেতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে। ছোটীকে খাওয়ানো হল না। কিন্তু ওর যা ঘুম, আর মাথা ভেঙেও ওঠানো যাবে না। দুধটা চোঁ চোঁ করে গিলে ফেলে সে। জল খায়। তখন মান্তবর ফিরে আসে কালুয়াকে নিয়ে।—ছোটী নিদ গেল বুঝি ?

—হাঁ জী। শুত করতে না করতে ও পাথর। দুধঠো দিতে ভুলে গেছি।

মান্তবর গম্ভীর। ওই তার স্বভাব। কখন গম্ভীর, কখন হাসিখুশি। বলে—শুত যা বেটি। পৌহাতে মেয়েটাকে রেখে আসতে হবে।

ফুলকলিয়া ঘরের দিকে ঘুরে বলে—তুমি ওবাড়ি ঢুকবে জী ? ঢুকোনা।

—নেহি। একটু পরে মান্তবর বলে—কভি নেহী।······

জীবনে এমন একটা রাত এল, অথচ জেগে থাকতে পারল না। পরে ছোটীর মনে এ জন্যে একটা কাঁটা বিঁধে থেকেছে। সে-রাতে অমন ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি। রাতচরা পাখিটা ডাকতে শুরু করেছিল। দূরে রেলগাড়ি যাচ্ছিল ঝমর ঝম। বাঁশের বনে শেয়াল ডাকতে না ডাকতে বুঝি কালুয়াই বাইরে কোথায় ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। আর কানে মুখ রেখে বহুদিদি একটা দুর্বোধ্য গপ্‌ শোনাচ্ছিল চাপা গলায়। ছোটীর চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছিল এইসব ঘটনাই। বরং সে নিজে যদি কথা বলত বহুদিদির সঙ্গে! বলত বহুদিদি চলে আসার পর নিষাদবাগের দিনকালের কথা। কত কী সব ঘটেছে! অঞ্জলার সঙ্গে কেন তামুকওলা ভগতরামের বিয়ে হচ্ছে না, ক্ষেতের ঝিঙে চুরি, মালতীর বরের সঙ্গে ছেদিরামের কেন ঝগড়া হয়েছে, আর একটা বড় সুখবর —মুখিয়ার বেটা সুরয বলেছে, আর সব গাঁয়ের মতো নিষাদবাগেও লক্ষ্মীপুজো দেবে। গাঁওবালারা বলেছে, যত পুজো দেবে দাও, তবে ছটপরব, ভারিভুরির পুজো, ঠাকুরবাবার 'পাঁছোট' পরবগুলো বাদ গেলে চলবে না! মেয়েরা উল্কি দাগবেই। তাতে বারণ করা চলবে না। আর বলার মতো ঘটনা এতোয়ারির সন্নেসীর মতো দাড়িগোঁফ চুল রাখা। এতে উদ্বেগ আছে, হাসির ব্যাপারও আছে। আর বহুদিদি গে, তুই যে লেবুচারা লাগিয়েছিলি—শুনলে অবাক হবি, সেটা শুকিয়ে যায়নি। পর-পর কয়েকটা বৃষ্টির পর খুব রঙ চাগিয়ে উঠেছে। হুঁ, মেনিদের ছাগলটা শেয়ালে ধরেছিল সেদিন দুপুরবেলা। গলার ঘায়ে হলুদবাঁটা দিয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি মরে পড়ে ছিল। খবর পেয়ে টাউন থেকে ভেঁটুয়া ডোম এসে নিয়ে গেল। ভেঁটুয়ার সঙ্গে মেনির দাদা সুখলালের বড্ড ভাব। সুখলাল আজকাল খুব গাঁজা খাচ্ছে। ল্যাংড়া রঘুয়ার বাড়ি ভেঁটুয়া আর সুখলাল খুব যাওয়া আসা করে। ভেঁটুয়ার আবার স্বভাব খারাপ। ভরত আর নয়ানসুখ বলাবলি করছিল, ভেঁটুয়া নিষাদবাগের কোন ছোকড়ি নিয়ে ভেগে না যায়। বহুদিদি গে, দাদা বলেছে—গঙ্গায় শীগগির যখন ঢল নামবে, আর কদিনই বা—টাউন থেকে জাল কিনে আনবে। আর দাদা কী বলে জানিস? গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ক্ষেতের এককোণায় ঘর বানাবে। হিজলগাছটার কাছে। সেই হিজল গাছটা—যার তলায় শীষফুল কুড়োচ্ছিলুম, মনে পড়ছে? ওখানে থাকবে দাদা। একেলা থাকবে। শুনে তো ডর লাগে বড্ড, কেন ওকথা বলছে দাদা? শ্মশান জায়গা। শিমুল গাছটাও কাছে। কোন শিমুল গাছ বল্‌ তো? সেই যে—যার ডালে জোড়া পেঁচার রূপ ধরে ভারিভুরি থাকে! একরাতে ওরা এমন জোরে ডাকছিল যে মুখিয়াজীও নাকি বেরিয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে। বাঁধে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে— চুপ, চুপ। চিল্লাস কাহে গে খামোশ? কেউ তো কোন দোষ করেনি। মিছা রাগ করেছিস বহিন! ......ওর শুন বহুদিদি, নিষাদবাগে আবার খুব হনুমানের উপদ্রব হচ্ছে। লোকে বলছে, কাপাসীর পুরণ 'বন্দুক' কিনেছে। বন্দুকের

আওয়াজে ডর পেয়ে ওদিককার হনুমান ভেগে এদিকে আসছে। কেউ কেউ বলছে তা নয়। টাউনের হনুমান। টাউনে জোর তাড়া খেয়ে গাঁয়ে ভেগে আসছে। কিন্তু এ বড্ড ভয়ের কথা। বটতলায় এ নিয়ে কথাও হয়েছে। ভরত বলেছে, ছেলেছোকড়ারা তৈয়ার থাকো। টিন বাজিয়ে হইহল্লা করে দেখিয়ে দেবে। বাড়ি-বাড়ি টিন তৈয়ার রাখা হচ্ছে। ছোটীর দাদাও রেখেছে। কোনঠো? কেন—পেয়ারাগাছে বাদুড় তাড়াতে মা যেটা ঝুলিয়ে রেখেছিল। রাতে শুয়ে-শুয়ে ঘুমের ঘোরেও দড়িটা টানত। ঢঙ ঢঙ করে বাজত। ও, সেটা তুই দেখিস নি গে। তখনও তুই নিষাদবাগের বহুড়ি হোসনি। টিনটা ঘরের পিছনদিকের দেয়ালের মাথায় চালের সঙ্গে আটকানো ছিল। এ বছর বর্ষার পর পেয়ারা গাছে ফল পাকন্ত হলে আবার টাঙানো হবে।……

এইসব কত জরুরী কথা, একশো কথা, ভালমন্দ কথা বলার ছিল বহুদিদিকে। ভোরবেলা তখন আকাশ শালিখ পাখির ডিমের মতো নীলচে ধূসর আর টানটান হয়ে রয়েছে। মান্নবরের সঙ্গে গঙ্গার চড়া দিয়ে কোণাকুণি নিষাদবাগের দিকে যেতে-যেতে ছোটী উথাল-পাথাল হচ্ছে। এই গঙ্গায়ও এত কথা ধরবে না! তার ছোট্ট মনে এত কথা ছিল, বুঝতেই পারেনি।

ভোরবেলা বহুদিদি তাকে হিমানী-পৌডার মাখিয়ে দিয়েছে। চুলে গন্ধ তেল ঢেলে বেণী বেঁধে দিয়েছে—একটা নয়, দুটো। ফিতেও দিয়েছে। কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে। গরবিনী মেয়ের মতো ছোটী পা ফেলেছে উঠোনে। তারপর সব গরব ধুয়ে মুছে গেছে চোখের জলে। বাঁশবনের সরু রাস্তায় ঢুকে সামনে দেখা গেছে ভোরের নদী। দূরের নিষাদবাগ। অমনি হু হু করে কেঁদে উঠেছে সে। বহুদিদি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—যখন খুশি, চলে আসবি রী! কাঁদিস কেন?

—বহুদিদি, ওগে! তুই যাবিনে কেন?

ফুলকলিয়া হেসেছে শুধু। মান্নবর বলেছে—যাবে রে বেটি, যাবে। আয়, বেলা বেড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তোর জন্যে নিষাদবাগে, হইহল্লা লেগে গেছে।

মান্নবরের হাতে একটা পুঁটুলি ছিল। ছোটী জাগবার আগেই পুঁটুলিটা বাঁধা হয়েছে। ওর মধ্যে কী থাকতে পারে? ছোটী ভেবেই পায়নি। পরে মনে হয়েছে, কুটুমবাড়ির রেওয়াজ। খন্দ আছে। আটা আছে। ছাতু আছে। এসব ছাড়া আর কী থাকবে?

মান্নবরের সঙ্গে কালুয়াও গিয়েছিল ছোটীকে পৌঁছে দিতে। চড়ার ওপর সে খুব ছুটোছুটি করছিল। মাঝে মাঝে বালি শুঁকছিল আর লাফালাফি করছিল। মান্নবর বলছিল—শেয়ালের মুত শুঁকছে হারামজাদা! সারাপথ মোড়ল ছোটীকে হাসাবার চেষ্টা করছিল। স্রোতের জায়গায় গিয়ে জল দেখে বলেছিল—রঙ বদলেছে পানির। ঢল এল

বলে। আজ যদি ফের বিষ্টি হয়, কাল পোঁহাত হতে-হতে ঢল এসে যাবে। তখন এক নদী বিশ কোশ হয়ে যাবে।

তখন কলাবেড়িয়াও অনেক-অনেক দূরের গাঁ হয়ে যাবে ভেবে ছোটীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তখন উত্তরে টাউন ঘুরে রাধার ঘাটে নৌকো পেরিয়ে যেতে হবে। নয়তো দক্ষিণে আধক্রোশ দূরে মহুলার ঘাট। নিষাদবাগে কারও যে নৌকো নেই।

পাড়ের ওপর নিষাদবাগ—ডাইনে দহ। এত ভোরে দহের ঘাটে কে কাপড় কাচছে। সামনে একফালি জল। মান্যবর বলেছিল—এবার আসি বেটি। এটা নে মাকে দিস।

পুঁটুলিটা আনমনে নিয়েছিল ছোটী। যতটা ওজন হবে ভেবেছিল, ততটা নয়। সে কিছু বলার আগেই মান্যবর হনহন করে চলে যাচ্ছে। কালুয়া চলে গিয়েছিল ঘাটের ওদিকে। সে তাকে ডাকছিল—হই কালুয়া : ! কুকুরটা যাবার সময় ছোটীর হাঁটুর কাছটা শুঁকে গেল।

একটুখানি মন খারাপ। তারপর খুশি হয়ে উঠেছিল ছোটী। কুটুমবাড়ির পুঁটুলি, আর তার খাতির, রাতে গরম ভাত রান্না, বড়বাড়ির ঘরে কতসব জিনিসপত্র, বহুদিদি কত সুন্দর হয়েছে, কত বোলচাল তার মুখে, এইসব কথা এবার মনে একনদী জলের তোড় নিয়ে কলকল করে উঠেছে। ছোটী চনমন করে এগোল পাড়ের দিকে। পাড়ের সাঁইবাবলার ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মালতীর মা। তাকে দেখেই ছোটী বলে উঠল—কলাবেড়িয়ার মোড়ল পঁহুচ দেইলা গে! উও দেখ! হাম বহুদিদিকী সাথ মেলা দেখলা গে! হাঁ—কেত্তা ঘুমলা! ঔর ইয়ে ত্যাখ, ক্যা দিছে। কেত্তা চিজ দিছে শনবাবা!……

মালতীর মা তো বরাবর হিংসুটে। এসব শুনেও শুধু কেমন চাহনি আর কেমন একটু হাসি? ছোটীর রাগ হয়েছে। জঙ্গল পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে ছেদিরামকে দেখে সে বলে উঠল—আমি কলাবেড়িয়ায় ছিলাম কাকা!

ছেদিরাম বলল—এতোয়ারি তোকে ঢুঁড়েছে রী! শীগগির ঘর যা।

আরও দুচারজনের সঙ্গে দেখা হল। ছোটী তাদেরও শুনিয়ে দিল ব্যাপারটা। নিজের হিমানী-পৌডার মাখা টিপপরা চেহারার 'সুরতে' নিজেই গরবিণী এবার। নিষাদবাগওলা কি দেখতে পাচ্ছে না সে কেমন রাতারাতি সুরতওয়ালী হয়ে গেছে?

—মা! মা গে! বলে বাড়ি ঢোকার সঙ্গে ওঁৎ পেতে থাকা শেয়ালের মতো তাকে ধরেছে এতোয়ারি। আর স্বরস্বতী বুড়ির হাতে ছিল ঝাড়ু। সেই ঝাড়ু এসে পড়েছে মাথায়। পুঁটুলিটা ছিটকে গেছে উঠোনে। আরেক ঝাড়ু মারতে গিয়ে বুড়ির চোখ পুঁটুলির দিকে পড়ল। অমনি সে থমকে দাঁড়াল।

এতোয়ারি জীবনে কখনও একটা চুহার গায়েও হাত তোলেনি। আজ বোনের গায়ে

হাত তুলেছে। বুড়ির মাথায় এ ব্যাপারটাও তক্ষুণি কীভাবে এসে পড়েছে। অতএব সে বেটার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠে—জেরা থাম গে!

এতোয়ারি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে থামল না। চড় থাপ্পড় কিল চালিয়ে যেতে-যেতে পুঁটুলিতেও একটা লাথি মারল। অমনি বুড়ি প্রতিবাদ করে উঠল—হুঁউ-উ! দেখো, দেখো! এবং সেটা সযত্নে তুলে নিল। ছোটী তখন দুহাতে মাথা বাঁচাচ্ছে এবং মাটিতে বসে অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছে।

পড়শীরা এমন ঘটনায় চুপচাপ থাকতে পারে না। দুজন একজন করে এসে পড়ছে। তারাই এসে এতোয়ারিকে ধরল। দাওয়ার দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। কেউ ছোটিকে ওঠাল। সে এবার গলা ছেড়ে বিকট কান্নাকাটি জুড়ে দিল। মালতীর মা রাগ করে বলল—আভি পোঁহাতমে কাওয়াও জেরা সে দানা খায়নি। আর তোরা এ কী শুরু করলি গে? ছো ছো ছো!

সরস্বতী পুঁটুলিটা দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে খুলতে থাকে। প্রথমে বেরিয়ে আসে একটা ঝলমলে রঙীন শাড়ি আর নকশাদার বেলাউজ। সারা নিষাদবাগের আর্তনাদ শোনা যায় কয়েকপড়শীর গলায়—বিভার সাজ গে! বিভার সাজ!

হুঁ, বিয়ের শাড়ি-জামা ফেরত দিয়েছে কলাবেড়িয়ার মোড়ল। বুড়ির কাঁপাকাঁপা হাত আরো একটা তাঁতের শাড়ি তুলে ধরে। তার তলা থেকে আরো একটা হলদে রঙের লালপাড় শাড়িও—। যেন ফুটন্ত সোডা জলে সেদ্ধ হওয়া কাপড় একেএকে খড়িপরা আঙুলে তুলে ধরছে বুড়ি। ছ্যাঁকা লাগবে বলে হুঁশিয়ারও বটে। গায়েহলুদের শাড়িটাও ফেরত দিয়েছে। তারপর বেরিয়ে পড়ে আরেক ছোট্ট পুঁটুলি। তার ভেতর রূপোর গয়না এক গুচ্ছের। হাঁসুলি, পৈঁঠা, নিকাড়ি, বাজু, চুড়ি ছ'গাছা, ঝুমকো জোড়া, আর বিছেটাও।

নিষাদবাগ আবার চেঁচায়—উন্নিশ ভরি ভরি গে! উন্নিশ!

এবার সবাই ছোটীকে জেরা শুরু করে। ছোটী সব কথার জবাবেই শুধু মাথাটা দোলায়। অত যত্নে সাজানো চুল আর মুখের সাজখানা বেইমান দাদাটা তছনছ করে ফেলল। এই দুঃখ-রাগ অভিমান কি ভুলতে পারবে কখনও?

এতোয়ারির দিকে তাকিয়ে রামলালের বউ সুমতি বলে—বেঁচে গেছিস বাবা এতোয়ারি! খুব বেঁচেছিস! এবার যেমন পনছী, তেমনি ভালে বাসা কর। আমি তখনই বলেছিলাম গে, কুটুম করলে সমানে সমানে!

এইসব কথাবার্তা চলতে থাকে অনর্গল। যার কাজ আছে, সে চলে যায়। আবার একজন আসে। ভিড় কমতে দেয় না কেউ। পুরুষলোকেরাও এসে যায়। ভরত, সুখলাল, ছেদিরাম, কানিকুর, তারপর নয়ানসুখও। নয়ানসুখ বলে, এতোয়ারি, মুখিয়াজীর সঙ্গে আভি দেখা কর বাবা।

এতোয়ারি চুপ। সরস্বতী পা ছড়িয়ে বসে প্রবল সুখে দুঃখের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে গুন-গুন করছে। গাঁওবালার কথারও জবাব দিতে ছাড়ছে না। আর নিষাদবাগে আবার একটা স্মরণীয় দিন তো বটেই। যারা আজ গাঁওয়ালে যাবে কি না, তাই নিয়ে ভোরবেলা উঠে দোনামনা করছিল, তারা ভাল অছিলাই পেল। কানিকুরু হাই তুলে আড়ামোড়া দিয়ে জানিয়েও দিল কথাটা। তার বউ নিশাচরী রাগ দেখিয়ে বলল—তবে তুমি বাচ্চা সামলিও। আমি দফরপুরে ঘুরে আসি। ন'বাবুর বাড়ি ভোজকাজ। টিপগাড়ি চালয়ে পাঁচদফা এল না বাবু? এইকথা শুনে হাসি পড়ে গেল ভিড়ে। নিশাচরীর ননদ কসিলা হাসতে হাসতে বলল—আধামন পটল আর দশ সের কুমড়ো ভারে ঝুলিয়ে আমার ভাজ যাবে হেলতেদুলতে দফরপুর। তোরা দেখিস গে! ভাজের কেমন তাকদ! আবার হাসি। তারপর কানিকুরু বলল—আরে, ন'বাবুকে বাকিতে মাল দেবে কৌন গে? ওহি তো বাত। দশ-বিশ রোজ ঘোরাঘুরি করে কে তখন? নিশাচরী আরও রেগে বলল—মরদকা বাত হাথিকা দাঁত! বাত দেইলা কাহে গে? তারপর সে বেরিয়ে গেল।……

কতক্ষণ পরে ভিড় সরেছে এতোয়ারির বাড়ি থেকে। এতোয়ারি লাল চোখে বিড়ি টানছে। ছোটী বড়-বড় চোখে বহুদিদির কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি দেখছে। বিশ্বাস করতেই পারছে না—এগুলো পুঁটুলির মধ্যে ছিল। কখন পুঁটুলি বাঁধাছাদা করেছিল বাপ বেটিতে—সে জানে না। হয়তো অনেক রাতে—যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন। হায় রে হায়, কেন যে অমন ঘুম এল তার!

আর বহুদিদি—অমন সুন্দর ভালমনের মেয়ে! সে কোন মুখে নিষাদবাগের দেওয়া জিনিস ফেরত দিল? না না। তার মোড়ল-বাবাটাই যত বদমাইসির গোড়া। দেখা হলে ছোটী তাকে ছেড়ে কথা কইবে না!

তাকে ফুঁপিয়ে উঠতে দেখে সরস্বতী সান্ত্বনা দেয় এবার।—চুপ গে, রো মাৎ। কাঁদিস গে। ভালই করেছিস। কাঁদবি কেন? ওই মরদ লোকটা যা পারেনি, তুই তা পেরেছিস। ওই ভড়ুয়া মাগীমুখো বেহদ্দ গিদ্ধড় যা পারেনি বেটি তুই তা করেছিস। যা—গঙ্গামে নাহান করে আয়। গরম-গরম ভাত চাপাচ্ছি।

সরস্বতী জিনিসপত্তর সামলাতে থাকে। আর এতক্ষণ বাদে অকলা এসে ঢোকে। ঠোঁটের কোণায় কেমন হাসি। প্রথমে ছোটীকে তেড়ে যায়—হাঁ গে কুট্রিন! হাঁ গে হুড়াক! কাল তোকে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হয়রান হলাম গে! আর তুই কি-না গুণবতী রূপবতীর সাথে মজা লুটে বেড়াতে গেলি? ওই টোনবাজ বাজারীর মুখে মুখ দিয়ে বেড়াচ্ছিলি গে! ছি ছি ছি!

তারপর সরস্বতীর কাছে যায়। বুড়ি ঝটপট গয়নাগাটি ঢেকে ফেলে। অঞ্চলা বলে—ও পিসি, সবকুছ চাপস দিস তো? গিনকে দেখ্, পিসি। ঝুমকাঠো দিস্ তো?

ঝুমকোজোড়ার ওপর অঞ্চলার লোভ ছিল। এতোয়ারির মা মাথা নাড়লে সে খুশি হয়। এতোয়ারির দিকে চোখ নাচিয়ে বলে—কী গো বুড়ির ছেলে? এবার স্বপন টুট-নিদ ভাঙল তো? আমি বিভার দিনই কী বলেছিলাম, মনে পড়ছে এখন?

একথায় এতোয়ারির কী হয়, সে একটু হাসে! চোখের দৃষ্টি শূন্য, অথচ ওই হাসি তার দাড়িগোঁফ-লম্বাচুলওলা সন্নেসী চেহারাকে রূপবান করে তোলে অঞ্চলার চোখে। এতোয়ারি বিড়িটা মুচড়ে নেভায়। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

আর অঞ্চলা ওইটুকু হাসি পেয়েই মনের জোর বাড়িয়ে নিয়ে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। বলতে থাকে—আর কেউ হলে এমন সংসার, এমন শাস আর ননদ, এমন ভালমানুষ মরদ পেয়ে ভাবত আমি সাতকপালীর বেটি। হুঁ, তাও তো বাঁজিন (বন্ধ্যা) ঔরত! এতদিন মরদের সঙ্গে শুতল, বেটাবেটি মা বলে ডাকতে এল না। আর দেখ্, গে, পয়মন্ত মেয়ে না হলে গাছ ফলে না, লতাপাতায় ফুল ফোটে না। কেন—কাহে? কী, নিজেই যখন বাঁজিন, তখন সবকে বাঁজিন করে ছাড়বে না? এতোয়ারিদার ভুঁইভি কমজোর হয়ে গিয়েছিল। যায় নি গে?

সরস্বতী জিনিসপত্তর নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। সিন্দুকের তালা খুলেছে। অঞ্চলা ছোটীকে ফিসফিস করে বলে—সাফ-সাফ ছাড় বলে দিয়েছে গে? নাকি আবার পঞ্চায়েত ডাকবে বলেছে?

বিরক্ত ছোটী বলে—পুছ্, গে ক্যা বোলা! বলে সেও ঘরে ঢোকে।

অঞ্চলা আর একটু বসে থাকার পর উঠে পড়ে।—পিসি, চললাম গে। কোন জবাব আসে না। রাস্তায় গিয়ে সে এতোয়ারিকে খোঁজে। ব্যাকুল হয়ে তাকায় চঞ্চল চাউনিতে। কয়েক-পা এগিয়ে দেখতে পায়, এতোয়ারি আস্তে আস্তে বারোয়ারিতলা পেরিয়ে বাঁধে গিয়ে উঠল। অঞ্চলা সেদিকেই চলতে থাকে। শিকারের দিকে বাঘিনী যেভাবে যায়।

বাঁধে পৌঁছে এতোয়ারিকে আর দেখতে পায় না সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কোথায় গেল এতোয়ারি? আহা, বেচারার মন খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় ওকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলার দরকার ছিল। হঠাৎ চোখ যায় শ্মশানের বটগাছটার তলায়, ওই তো বসে আছে এতোয়ারি! অঞ্চলা ঝোপ-ঝাড় ভেঙে, কিন্তু সাবধানে পা টিপে-টিপে, এদিকওদিক তাকিয়ে লোকেরা তাকে দেখছে নাকি বুঝে নিয়ে বটতলায় যায়।

একদিন ঠিক ওই শেকড়েই পা ঝুলিয়ে বসে ছিল কলাবেড়িয়ার অপমানিতা মোড়ল-কন্যা। শাস তার চুল ধরে থাপ্পড় মেরেছিল। শ্মশানে দুঃখ ভুলতে এসেছিল।

অঞ্চলা চাপা গলায় ডাকে—এতোয়ারিদা!

এতোয়ারি চমকে ওঠে। তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না।

—মনে দুখ বেজেছে মোড়লের বেটির জন্যে? অঞ্চলা হাসে। হাসতে হাসতে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে। তো দুখ বেজেছে যখন, যাও পাঁও পাকড়ে কেঁদে কেটে নিয়ে এসো। যাও! বসে কেন?

এবার এতোয়ারি এদিকওদিক তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—কেন এলি অঞ্চলা? তোর আক্কেল নেই রী? লোকে এক্ষুণি দেখবে আর গাঁ জুড়ে হি হি পড়বে। তোর বাবা মুখিয়ার লোক। পঞ্চায়েত ডাকবে। যা—যা! ভাগ এখান থেকে।

অঞ্চলা জেদ ধরে বলে—হাঁ। আমি গাঁও-বালার ধারি কি না! গাঁওবালা আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে কি-না!

তবে তুই থাক। আমি যাই। বলে এতোয়ারি উঠে দাঁড়ায়।

অঞ্চলা অমনি তার পা দুটো ধরে ফেলে। তারপর সেই পায়ের ওপর, অবিকল এতোয়ারির মা যেমন করে মাথা ঠোকে, তেমনি করে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ফুঁপিয়ে কাঁদে।—আমাকে নাও এতোয়ারি! তোমার খুব ভাল হবে। ভারিভুরি আর ঠাকুরবাবার কিরপা হবে। ওগে এতোয়ারি, তোমার জন্যেই তো আমাকে আবার নিষাদবাগে ফিরে আসতে হল! একটু সমঝে দেখবে না তুমি? ও এতোয়ারি! আমি বাঁজিন নই, ছেলেপুলের মা। তোমার কি ছেলেপুলের বাবা হবার সাধ নেই এতটুকু?

অঞ্চলা আরও কত কী বলতে থাকে। বিব্রত এতোয়ারি বেকায়দায় পড়ে ধুপ করে বসে অগত্যা। ওর দুকাঁধে ধরে ওকে ওঠায়। বলে—শুন রী, শুন! খিটকেল করিসনে। আর কয়েকটা দিন শোচ করতে দে! তুই এখান থেকে চলে যা অঞ্চলা! আমি কতক্ষণ শোচ করি। তুই যা অঞ্চলা, চলে যা রী!

আর শ্মশানের ওপাশে দহের ঘাটে নামার রাস্তা। সেখানে ধনপতি মুখিয়ার ক্ষেত। ধনপতি হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে। তারপর রাস্তায় পা ফেলেই নজর গেছে বটতলার দিকে। হেঁড়ে গলায় বলল—কৌন গে?

এতোয়ারি সরমে—কিছুটা আতঙ্কেও কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে অঞ্চলা উঠে দাঁড়িয়েছে। নির্লজ্জা মেয়েটা দাঁত বের করে বলে—আমি অঞ্চলা মুখিয়াকাকা। এতোয়ারিদার সঙ্গে বাত করছি!

ধনপতি সরকার গম্ভীর মুখে বলে—বাত করবার জায়গা পেলিনে? ওখানে কী বাত করছিস রী? এতোয়ারির সঙ্গে কী বাত আছে তোর? এ্যা?

অঞ্চলা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলে—মুখিয়াকাকা, হামরা বিভা কিবে।

—ক্যা? মুখিয়া কয়েক পা এগিয়ে যায়।

—বিভা, বিভা! সরস্বতী বুঢ়িয়া হামার শাস হবে জী, সমঝা?

এতোয়ারি হতভম্ব। ধনপতি সরকারও তাই হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণে সরল মানুষটি হো হো করে হেসে বলে—ভাল। বহৎ ভালো। তারপর হাসতে হাসতে বাঁধের দিকে এগিয়ে যায়।

আর বটতলায় দুটি মেয়ে মরদ আবার পরস্পরের দিকে ঘুরে তাকায়। এখন দুটি মুখেই যে ভাব—তা হিংসার। যেন পরস্পরের ওপর তারা এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

## ॥ তেরো ॥

গঙ্গাপুজোর পর কয়েকটা দিন যেতে না যেতে উত্তর থেকে গাঢ় গেরুয়াজল আসতে শুরু করেছিল। কলাবেড়িয়ার বাঁশবনের ঘাটে সেই জল আসবার খবর মান্নবর বেটিকে দিয়েছিল। বলেছিল—নিষাদবাগের ঘাটেও ভি এসেছে!

কেন বলেছিল, ফুলকলিয়া বোঝে নি যেন। বুঝল নাহানে গিয়ে। এখন আর ইচ্ছে থাকলেও তার একদমে নিষাদবাগে ফেরা যাবে না। চোখের সামনে শ্বশুরাল অনেক দূর হয়ে গেল। অচিন-অজান হয়ে গেল। বুকে একটু দুখ বাজল মোড়লের বেটির? ভুরু কুঁচকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। ছোটীর হাতে উনিশ ভরি গয়না ফেরত পাঠাবার দিন তো কই এমন দুখ বাজেনি!

বাপের বাড়ি এসে যত বেপরোয়া ঘুরুক, সাবানপোডার মাখুক, টৌনে গিয়ে ছেনিমা দেখুক—মনের তলায় আবছা ভেসে উঠত, সে তো এখনও নিষাদবাগের বহু ছাড়া কিছু নয়—ইমানসে ধরমসে। তেমন চাপাচাপি করলে আবার শ্বশুরাল যেতে আপত্তি করবে না।

কিন্তু কোথায় চাপ, কার চাপ! মান্নবর বরাবর ওইরকম আলাভোলা এবং চলছে-চলুক ভাবের মানুষ। গহনাগুলো সে ফেরত পাঠাল ছোটীকে পেয়ে, সে শুধু বেহানের খোঁটার চোটে। জামাই যা গোঁয়ার, শ্বশুরের ঘরে কিছুতেই আসবেনা এতো জানা কথাই। তাই যেন শেষঅব্দি ফুলকলিয়ার মনে কোথাও একটু ক্ষীণ আশা ছিল তাকে কোন-না কোনদিন পাকেচক্রে নিষাদবাগে ফিরতেই হবে।

অথচ দেখতে দেখতে মা'গঙ্গার বুক দামাল সোনালি জলে ভরে গেল। আর

বৃষ্টিও এবার তালে তাল দিয়ে দুগাঁয়ে ফারাক আরও বাড়িয়ে দিল। আগাম বর্ষা পড়ল এবছর। সারাদিন ঝিরঝির বর্ষায় ঠাকুরবাবার বাহনগুলো আসমানের বাথানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও দুষ্টু কালা ভুঁইসা শিঙ নেড়ে গাঁক করে উঠল। বেতমিজির সাজা দিতে ঝিলিক দেয় ঠাকুরবাবার হাতের পাচনবাড়ি। এসব সময়ে ফুলকলিয়ার মতো মেয়ে চুপচাপ দাওয়ায় বসে থাকা ছাড়া আর কী করবে! মোড়লের ভয়ে শরতের বউ বাড়ি অব্দি আসেনা কোনদিন। তার সঙ্গে দেখা হবার কথা ঘাটে। বড়জোর সে টৌন হয়ে নদী পেরিয়ে রাধারঘাটে চৌবেজীর গদীতে এসে অপেক্ষা করবে। হাসিমস্করা করবে হাটুয়া আর চৌবেজীর সঙ্গে। ফুলকলিয়া কথামতো গিয়ে হাজির হবে। ফিরে এসে যদি বা বাপের মুখোমুখি হয়, বলবে সরযুর সঙ্গে গিয়েছিল ওপারে। কেন গিয়েছিল—না, সাবান কিনতে, গন্ধতেল কিনতে। মাতব্বরের তাতে আপত্তি নেই।...

কিন্তু দিনরাত এই বৃষ্টি সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। মাতব্বর যে বাড়ি থেকে কোথাও নড়ছে না আর। না যাচ্ছে বেলডাঙার আড়তে, না যাচ্ছে ইষ্টিশানে আড্ডা দিতে। ফুলকলিয়া বরাবর বাপকে লুকিয়ে নির্মলার সঙ্গে গেছে। বর্ষায় তা একেবারে বন্ধ। অতএব খালি বসে বসে আবোল তাবোল ভাবো। ভাবতে ভাবতে নিষাদবাগ এসে পড়বেই।

আর নিষাদবাগের কথাও গাঁওবালাদের কথা। গাঁওবালাদের কথা এলে ধনপতি মুখিয়ার বেটার কথা। প্রথম-প্রথম যেটুকু শরম ছিল নিজের কাছে, এখন তা ঘুচে গেছে অনেকটা। ফুলকলিয়া সুখের কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনে হাসে। টিপগাড়ির চাকার তলায় চাপা দিয়েছিল, হায় রে হায়! ফুলকলিয়া এখনও চাপা পড়ে রইল যে! হাত ধরে তাকে ওঠায় কে এখন? নিজেকে বলে—হাঁ রী ছোকড়ি! নিষাদবাগে যদি ফেরার এত ইচ্ছে, গঙ্গাপুজোর মেলায় নিষাদবাগের লোক দেখে কেন তাহলে ডর পেয়ে ভেগে এসেছিলি?

বৃষ্টি একদিন জিরান নিল। ক্ষেত থেকে ক্লান্ত মুনিশ উঠে গিয়ে যেমন আলের হিজল তলায় বসে থাকে। আর রোদ্দুর ফুটল। ঝকমকে ধারাল হেসোর মতো রোদ্দুর। সেদিনই শরতের বউ নির্মলা সোজা রাধারঘাট হয়ে কলাবেড়িয়া ঢুকল।

বাইরে কাকে জিগ্যেস করছে মোড়লের বাড়ি, কানে যেতেই ফুলকলিয়া বেরিয়ে পড়েছে। দৌড়ে গিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে।—কোথায় ছিলি গে এতদিন? ভাবলাম বুঝি বটতলায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছিস! আয় গে দিদি, ঘরে আয়।

নির্মলাকে দেখে মাতব্বর বলে কৌন গে? দালালের বহু না? এস, এস বেটি। খবর ভাল তো?

দাওয়ায় শীতল পাটি বিছিয়ে খাতির করে ফুলকলিয়া। বাবার উদ্দেশে বলে—দিদি খুব চা খেতে ভালবাসে, বাবা! তা জানো তো? জলদি চা-পাত্তি এনে দাও।

মাস্তবর খুব হাসে।—হাঁ, হাঁ। বেটি বহুৎ টাউনবাজ আছে। উওভি আমি জানি। তো বৈঠ তোরা। আভি চাপাত্তি আনছি ঘাট থেকে। আর এ বেলা ঘর যেতে হবে না, এসেছিস যখন। খাওয়া দাওয়া কর।

বেরোবার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের সে বলে—হাঁ গে! শরত কি শাহাবাবুর কাম ছেড়ে দিল? আর তো দেখি না আড়তে!

নির্মলা বলে—কবে ছেড়ে দিয়েছে, কাকা। গঙ্গাপুজোর আগেই। এখন নিজের দাদনের কারবার করছে যে! টাউনে বাসা নিচ্ছে। আমরা গাঁ ছেড়ে চলে আসছি।

মাস্তবর আরও একচোট হেসে বলে যায়—বাস রে! কোথায় অত টাকা পেল রী শরত? এঁ্যা! তাজ্জব!

এই সময় কোত্থেকে কালুয়া এসে নির্মলাকে দেখে হাঁকডাক শুরু করে। তারপর মাস্তবরের ডাকে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। অপ্রস্তুত ফুলকলিয়া বলে—তোকে কোথাও দেখেনি কালুয়া। তাই। খুব ভাল কুকুর দিদি। ওর জন্যেই তো চুরিচামারি হয় না!

নির্মলা ফুলকলিয়াকে দেখছিল। এবার চাপা গলায় বলে—একটা খবর নিয়ে এলাম রী ফুলের কলি! খুব ভাল খবর। কী খাওয়াবি, বল!

ফুলকলিয়ার বুক ছাঁৎ করে উঠেছিল। কাঁপা গলায় বলে—কী খবর রী দিদি?

—তোর ভাতার বিভা করেছে।

ফুলকলিয়া নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর জোর করে হাসে। হাসতে গিয়ে দমআটকানো গলায় শুধু বলে ওঠে—ছোড়্ রী।

—সত্যি বলছি। নয়নসুখের বেটি অঞ্জলাকে বিয়ে করেছে এতোয়ারি। নির্মলা বলতে থাকে। ওরা ধরা পড়েছিল তা জানিস? মুখিয়া হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল। তারপর তো এতোয়ারিকে সবাই চেপে ধরল। বিধবা মেয়ের ধরম লিয়েছ, তখন সাঙা করতেই হবে। আর তোর শাস বুড়িকে তো জানিস! শুনে খুব আকাশপাতাল করল কদিন। অঞ্জলাকে ঘরে জায়গা দেবেনা কিছুতেই। শেষে এতোয়ারি নয়নসুখের বাড়িতে ঢুকেছে। এ হল পরশুরোজের কথা। কাল সারাদিন এতোয়ারি কী করেছে জানিস? নদীর পাড়ে বাঁধের গায়ে ওর একটা ভুঁই ছিল না? ঝিঙে লাগিয়েছিল। সেই ভুঁইয়ে বড়সড় একটা কুঁড়ে বানিয়ে ফেলেছে। ওখানে নতুন বউ নিয়ে থাকবে। তো বউভি পেল, বাচ্চাও ভি পেল। অঞ্জলার একটা বাচ্চা আছে দেখেছিস তো?

ঘাড় নাড়ে ফুলকলিয়া। দেখেছে।

নির্মলা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে—এখন আমার হয়েছে জালা। ভকতরামকে কেমন করে

মুখ দেখাব, তাই ভাবছি। অতগুলো টাকা দিয়েছিল। অঞ্জলাকে শাড়ি কিনে দিয়েছিল! নয়নসুখকেও নগদ হাওলাত দিয়েছিল। নয়নসুখ কেমন হারামী লোক ত্যাখ! কাল সকালে গিয়ে ধরলাম—তো বেলকুল জবাব দিলে। সাফ জবাব। টাকা? কিসের টাকা?

ফুলকলিয়া শুধু তাকিয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখ।

—ভকতরাম আমার মারফত এত টাকা দিয়েছে। আমাকে তো ছাড়বে না। নির্মলা ক্ষুব্ধভাবে বলে। তো, আমিও সহজ মেয়ে নই। ফিরে গিয়ে মুখিয়াকে ধরব। পঞ্চায়েত ডাকো! নয়তো ওই গিদ্ধড় নয়নসুখকে টানতে টানতে ভরাগঙ্গায় না ফেলিতো আমি বেজন্মা বেটি। দেখবি কী করি বুড়োর!

তারপর নির্মলা ফুলকলিয়ার মুখের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে। কী? খবরগুলো কানে ঢুকল তো? বলে সে তার গাল ধরে একটু নাড়া দেয়।

ফুলকলিয়ার ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না এ খবর সুখের, না দুখের—খুশি হবে, না হুহু করে কাঁদবে! সে কী বলবে ভেবেই পায়না। ঠোঁটে একটু কাঁচুমাচু হাসি ফুটে থাকে শুধু। শেষে বলে—আমি কী বলব? আমি তো চলেই এসেছি নিষাদবাগ ছেড়ে!

—এসেছিস! কিন্তু এখনও তো তোর ছাড হয় নি রী! তুই যে এখনও এতোয়ারির বহু হয়ে আছিস! নির্মলা একটু হাসে। ফের বলে—কী? করবি সতীনের ঘর?

ফুলকলিয়া চৌকাঠে বসে ছিল। উঠে দাঁড়ায়। রাখাল এসেছে। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে মুড়ি দিতে হবে। সে ঘরে ঢোকে।

নির্মলা বাইরে থেকে বলে—যাক গে। যা হয় তা ভালর জন্যেই হয়। চলে এসে ভালই করেছিলি। আবার এতোয়ারি যে অঞ্জলাকে স্যাঙা করল তাও তোর ভাল। এবার তোর বাবা গিয়ে নিষাদবাগে মুখিয়াকে ধরুক। ছাড লিয়ে আসুক। ব্যস! তোর ছুটি!

কোন কথাই বলেনা ফুলকলিয়া। রাখাল ছেলেটাকে মুড়ি দেয়। গিন্নির মতো এটাওটা নাড়াচাড়া করে। সরিয়ে রাখে। ঘরে ঢোকে। আবার বেরোয়। তারপর মান্যবর ফিরে আসে রাধারামের বাজার থেকে। চায়ের জন্যে তখনও উনুন ধরানো হয়নি দেখে সে অবাক হয়।

মান্যবর একবার নির্মলার দিকে একবার মেয়ের দিকে তাকায়। কুকুরটা দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে নির্মলাকে জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে আর লেজ নাড়ছে। মান্যবর বলে—কী? তোদের হলটা কী গে? হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপচাপ বসে আছিস যে?

নির্মলা ঘোমটা আরেকটু টেনে দিয়ে হাসে।—আমি এমনি এমনি আসিনি কাকা। তো' বলতে দুখভি বাজে, সরমভি লাগে। তোমার জামাইয়ের খবর শোননি?

মান্যবর উনুনের কাছে চা-পাত্তি আর চিনির প্যাকেট রেখে নিজেই উনুন ধরাতে যাচ্ছিল। ফুলকলিয়া এসে পাটকাঠির গোছা গুঁজে দেয়। তেতো মুখে বলে—হটো জী। এত তাড়া কিসের? দিদি এক্ষুণি পালিয়ে যাচ্ছে না।

নির্মলা কথাটা বলেই তক্ষুণি মোড়লের গতিক আঁচ করতে ব্যস্ত। তাকিয়ে আছে তার দিকে। মান্যবর যেন শুনেও শোনেনি এভাবে আস্তে সুস্থে উঠোনে নামে। তারপর অন্য দিকে ঘুরে বলে জামাইয়ের খবরে আমার কাজ কী রে বেটি? আর খবর বলছিস—জানলেও জেনেছি, শুনলেও শুনেছি। আমার বেটিকে লিয়ে বুড়ির বেটা সুখ পায় নি। নয়নসুখের বেটিকে নিয়ে সুখ পায় তো পাক। আমার যা মনে আছে করব। ব্যস। উওবাত ছোড়।

ফুলকলিয়া চমকে উঠেছিল। ভাঙা গলায় ডেকে ওঠে—বাবা!

—হ্যাঁ বেটি। চৌবেজীর কাছে আমি কাল সন্ধেবেলাতেই সব শুনেছি। তোকে বলিনি।

ফুলকলিয়া চেঁচিয়ে ওঠে—কাহে?

—ও শুনে তুই কী করবি?

ফুলকলিয়া মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বোঝাই যায় তার চোখ ফেটে আঁসু নিকলাচ্ছে। মমতা দেখিয়ে নির্মলা বলে—আহা তাহলেও তো এখনও ইমানসে ধরমসে তোমার বেটি এতোয়ারির বহু, কাকা! এখনও তো ছাড় লিয়ে আসোনি!

ব্যাপারটা যে অতি সামান্য এভাবে মান্যবর উড়িয়ে দেয়।—ছাড়? আজ হোক কাল হোক আনলেই হল। আসল ছাড় তো হয়েই গেছে কবে। ধনপতিয়ার বাড়ি যাব। দশবিশ তিশ রুপেয়া যা লাগে, দেব। ব্যস!

নির্মলা তর্কের ছলে বলে—এতোয়ারি যদি সহজে ছাড় না দেয়? বদমাইসির মতলব থাকে যদি ওর মনে?

ঘাড় নাড়ে মান্যবর।—দেবে না কেন ছাড়? গহনা ফেরত দিয়েছি। বিয়ের খরচও ফেরত দেব।

—এত ভাল মানুষ এতোয়ারি নয়। ...নির্মলা চাপা স্বরে বলে। চৌবেজীর কাছে তিনকুড়ি টাকা দেনা আছে। শুধতে পারছেনা। সুদই তো এখন আরও তিনকুড়ি হয়ে গেছে। তার ওপর পাট বুনবে বলেও শুনছি, টাকা নিয়েছিল। পাটগুলো গরু-ছাগলে মুড়িয়ে কবে শেষ করে দিয়েছে। চৌবেজী আমাকে তো কিছু লুকোয় না,

কাকা। চৌবেজী ওকে এত টাকা কেন দিয়েছিল, তা জানো তো? তোমার দালাল বেটার মুখ দেখে নয়।

—হুঁ, আমার মুখ দেখে! বলে মান্যবর হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাসিতে কালুয়াও যেন হাসি মেলায়। ঘেউ করে ওঠে আচমকা।

নির্মলা বলে—মোড়ল-শ্বশুরের দিকে তাকিয়েই ঘাটোয়ারিজীর টাকা দেওয়া। এখন গতিক বুঝে সে দু'বেলা নিষাদবাগে দৌড়াদৌড়ি করছে। এতোয়ারি পড়েছে বিপদে।

বলে ফের সে কণ্ঠস্বর চাপা করে।—সে জন্যে বলছি, কাকা। বদমাইসি করবে ছাড় দিতে। খুব ভেবে'চন্তে যেও।

মান্যবর বলে—অনেক টাকা চাইবে, এই তো? দেখা যাক।…

এসব বৈষয়িক আলোচনায় কান নেই ফুলকলিয়ার। সে চুপিচুপি কাঁদছে, পাটকাঠির ধোঁয়ার ছলে কাঁদা। কিন্তু কেন তার কান্না আসছে সে বুঝতে পারছে না। এমন কান্না নিষাদবাগে তার বিয়ের সময় সে কেঁদেছিল।

আর তার চেয়েও দুঃখ, বাবা তাকে এমন একটা খবর জানায়ইনি। বাবা অমন আলাভোলা মানুষ কেন? নিষাদবাগে মেয়ের বিয়ে দেবার সময় কত লোকে বারণ করেছিল। কানে নেয়নি। এখন কলাবেড়িয়াবালা বলছে—আমাদের কথা ফলল তো? আরে ছো ছো। নিষাদবাগ হল একটা জংলী জায়গা। সেখানকার লোকগুলোর চেহারা দেখেই তো বোঝা যায় কুকুর শেয়াল ছাড়া কিছু নয়। তবে শুধু ওই একটা বাদে—ধনপতি মুখিয়ার লিখাপড়হা বেটা সুরযপতিয়া। মোড়ল, দিলে বটে মেয়ের বিয়ে সেই নিষাদবাগে—সুরযপতিয়াকে জামাই করতে পারলে না! তা যদি পারতে তাহলে এ কেলেঙ্কারি, বড়ঘরের এ বেইজ্জতি কখনো হত না।

মান্যবর এর অদ্ভুত জবাব দিয়েছে—হাঁ, সুরযপতি ছেলে তো ভালই। তবে সে চেষ্টাও কি করিনি আমি? ধনপতি তো রাজীই ছিল। ওর বেটা যে রাজী হয়নি। চোখমুখওলা এলেমদার ছোকড়া গায়ে উল্কিপরা ছোকড়িকে বিভা করবে না। সাফ বলে দিয়েছিল। তো আমার মাথায় গোঁ চেপে গেল। নিষাদবাগেই সম্বন্ধ করব তো করব। তোমার চোখের সামনে—হাঁ।

এ ব্যাপারটা ফুলকলিয়া জানত না। শুনেঅব্দি মনটা কেমন করেছে। সূর্যের কথা আরও বেশি করে ভেবেছে। ভাবতে-ভাবতে চুপিচুপি ইচ্ছে জেগেছে, নিষাদবাগে যদি কোনদিন ফেরা হয়, মুখোমুখি বোঝাপড়া করবে মুখিয়ার ছেলের সঙ্গে।

তো সব ইচ্ছে এবার বরবাদ। আর নিষাদবাগ ফেরার কোন আশাই রইল না। সতীনের ঘর করাটা কোন কথা নয়, কত মেয়েতো সতীন নিয়ে স্বামীর ঘর করছে—

মাস্তবর কী এক আজব মানুষ। যা গোঁ ধরবে, তাই করবে। ছাড় সে নিয়ে আসবেই।...

চা-পানি খেয়ে নির্মলা একটু পরেই চলে গেল। ভাত খাবার ইচ্ছে থাকলেও সময় নেই। টাউনে শরত তার অপেক্ষা করবে। যাবার সময় চুপিচুপি ফুলকলিয়াকে বলে গেল খুব ভাল ছেনিমা এসেছে। কাল দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে সেজেগুজে ফুলকলিয়া যেন ছেনিমাঘরের সামনে যায়। আর তো তার অজান অচিন নয় কিছু। নির্মলা আর কষ্ট করে নদী পেরিয়ে ঘাটে এসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে না। লোকের চোখে পড়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? একদিন হয়, দুদিন হয়, সেটা সম্ভব। বরাবর তো হয় না। ফুলকলিয়াকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না?

সেদিন বেলা পড়ে এলে মাস্তবর বেরিয়ে যায়। ঘাটে গিয়ে চৌবেজীকে ধরবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নিষাদবাগে। ফুলকলিয়া বাবাকে সিন্দুক খুলতে দেখল। কত টাকা নিল কে জানে। কদিন আগে একগাদা মসুরী বেচেছিল। টাকাগুলো কোন গুপ্ত স্থানে রাখা হয়নি, তখনও সিন্দুকে ছিল। ফুলকলিয়া এটুকু অন্তত বরাবর জানে, বাবা কোথাও একটা গোপন জায়গায় নগদ টাকা-কড়ি লুকিয়ে রাখে। প্রথমে টাকাটা হাতে এলে সিন্দুকেই রাখে। তারপর কখন চলে যায় সেই অজ্ঞাত গুপ্তস্থানে।

আর এ সব কথায় ফুলকলিয়ার মনে পড়ে যায়—ওই যাঃ! নিষাদবাগ থেকে পালিয়ে আসার সময় ঘরের পেছনে চালের বাতা থেকে চাঁদির টাকাগুলো তো আনতে ভুলেছে! ছোটী যখন গঙ্গাপুজোর সময় এল, একবার ভেবেছিল তাকে বলবে টাকাগুলো বের করে নিতে। নিয়ে ছোটী নিজেই তার মালিক হোক না! ওতেও ফুলকলিয়ার সুখ। কিন্তু বলা হয় নি কথাটা। ছোটী হয় তো টাকাগুলো শেষটা তার রাক্ষুসী মাকেই দিয়ে বসবে। তার চেয়ে লুকানোই থাক।

আসলে ফুলকলিয়ার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, নিষাদবাগে আবার কোন-না-কোনদিন হয় তো তাকে ফিরতেই হবে। তাই নিজের স্বাধীনতাটা মেপেজুপে খরচ করছিল।

বাবা গেল নিষাদবাগে তার ছাড় আনতে। কালুয়া ঘাট অব্দি গিয়ে তাড়া খেয়ে একটু পরে ফিরে এল। তখন বাঁশবনে বউ-কথা-কও পাখিটা থেমেছে। অজস্র শালিখ এসে তুমুল হল্লা জুড়েছে। ওপাশের বাড়িতে পবনের বউ শাঁখে ফুঁ দিল। ফুলকলিয়া লম্ফ জ্বালল। বাবা হেরিকেন আর ছোট্ট একটা লাঠি সঙ্গে নিয়ে গেছে। ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। রাখাল ছেলেটা দাওয়ায় বসে চবচবে করে তেল মাখছে গায়ে। ফুলকলিয়া তাকে ভাত বেড়ে দিতে রান্নাশালে ঢোকে।

একটু পরে নবীনের মেয়ে সরযু আসে।—ক্যা রী ফুলি, একেলা আছিস?

—হাঁ বহিন। আয়, বৈঠ।

রাখালটার ভাত খাওয়া দেখতে দেখতে সরযু হাসতে হাসতে বলে—ইস্! ওকে বাবু করে দিয়েছিস রী। আলো জেলে ভাত খাওয়াচ্ছিস। দেখবি এর পর কোলে চেপে ভাত খেতে চাইবে।

রাখালটার নাম ফটিক। সে অমনি গম্ভীর হয়ে বলে—লম্ফ লিয়ে যাও দিদি! পোকা পড়ছে ভাতে। তারপর পা বাড়িয়ে লম্ফটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়।

ফুলকলিয়া বলে—এসেই ফটিকের পেছনে লাগলি তো?

সরযু বলে—মোড়ল কাঁহা রী? ঘাটে গেছে নাকি?

—হাঁ।

—তোর কী হয়েছে বল তো? মুখখানা পেঁচার মতো করে আছিস কেন?

—কিচ্ছু হয়নি।

—হয়েছে, হয়েছে! মরদ দুসরা বিভা করলে সব মেয়ের মুখ পেঁচার মতো হয়। সরযু তামাসা করে বলে। তো বলবি, আমি কোথায় খবর পেলাম? হাঁ—তুই আমার কতদিনের পুরনো 'দেখনহাসি।' তোর সঙ্গে গঙ্গাজল ছুঁয়ে দেখনহাসি পাতিয়েছিলাম, মনে পড়ে? লেকিন এমন একটা খবর তোর কাছে পাইনি রী! পেলাম কি না অন্যের কাছে।

—উওবাত ছোড়! বলে ফুলকলিয়া দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দেয়!

সরযু বলে—ঘাটে হাটুয়ার সঙ্গে দেখা হল জানিস? হাটুয়াই বলল, এতোয়ারি একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে। সব শুনে তক্ষুণি তোর কাছে চলে এলাম। তো আমার কথা শোন, এ নিয়ে মন খারাপ করবিনে। মরদ লোকদের স্বভাব এই-ই। দেখ না, আমার মরদ কী করল? সতীনের ঘর দেখেও তো বাবা বিভা দিয়েছিল। আমাকে ছেড়ে দিল। কেন? না—আমার খাওয়া বেশি। আমার নাকি এত্তা বড়া পেট!

বলে সরযু হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে পেটের আকার দেখিয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে। আশ্চর্য এই মেয়েটা। ফুলকলিয়ার চেয়ে বয়সে একটু বড়। গতবছর ওর ছাড় হয়েছে। এখনও আর বিয়ে করে নি। বাবার বাড়িতে মাথা গোঁজার জায়গা একটুখানি পেয়েছে। কিন্তু আলাদা থাকে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তো হাঁফকাশের রুগী। দাদারা ভাল হলে কী হবে? তাদের বউগুলো বড্ড ঝগড়াটে। সরযু পৃথক হয়ে যাবার পর মান্যবর তাকে কিছু পুঁজি দিয়েছিল। ফুলকলিয়ার সই বলেই স্নেহের বশে দিয়েছিল। সে পুঁজি অবশ্য নগদ টাকাকড়ি নয়—কিছু খন্দ। তাই বেচে সরযুর আসল পুঁজি। এর-ওর ক্ষেত থেকে বা মাচা থেকে আনাজপাতি কেনে, আর গাঁওয়ালে বেচে আসে। ফুলকলিয়া জানে সরযুকে কোন মরদ পছন্দ করে না। ওর চেহারা পেত্নীর মত যে! দাতগুলো বেরিয়ে থাকে। নাকটা বেজায় বোঁচা। আরও কত খুঁত

আছে শরীরে তার লেখাজোখা নেই। এ মেয়ের শরীরে কবে যে যৌবন এসেছিল, নাকি আদতে আসেইনি—এসব বোঝা ভারি কঠিন। এটুখানি চিমসে বুক, হাড়গিলে গড়ন। অথচ তাই বলে ওকে ঘেন্না করতে পারে না ফুলকলিয়া। কত কাজে লাগে সরযু কতজনের। এই যে এতদিন ধরে নির্মলার সঙ্গে শহরে যাওয়া আসা করছে, সে তো সরযুর নামে। মান্থবর সরযুকে খুব বিশ্বাস করে। স্নেহযত্ন তো করেই। ওর সঙ্গে ফুলকলিয়াকে বাইরে যেতে দিতে তার আপত্তি হয় না।

একটু পরে ফটিক খাওয়া শেষ করে এঁটো ভাতগুলো কালুয়াকে উঠোনের কোণায় খাওয়াতে গেছে, তখন ফুলকলিয়া চাপা গলায় বলে—দেখনহাসি, কাল আমি টাউনে যাব রী। দুপুরে খাওয়ার পর বেরুব। তুই আসিস বহিন। আসবি তো?

সরযু চোখ নাচিয়ে বলে—হুঁ। তো আমিও ভি তোর সাথ-সাথ যাব কাল। ছেনিমা দেখাবি তো?

—দেখাব। কেন দেখাব না? আনমনে জবাব দেয় ফুলকলিয়া। তার মন পড়ে আছে নিষাদবাগে। এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে!

মান্থবর ফিরল অনেক রাতে। সরযুকে আটকে রেখেছিল ফুলকলিয়া। এতদিন একলা কাটাচ্ছে, একটুও ভয়ডর লাগেনি। এই বাড়ি, ওইসব গাছগাছালি আর এই গাঁ—এসবের সঙ্গে তার কতকালের চেনা-জানা। ভয় করার কী আছে? অথচ এতদিন বাদে আজ এই রাতটার কেমন ভয়জাগানো গা-ছমছম ভাব। যেন হাজারটা চোখ দিয়ে কারা ফুলকলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই সরযুকে ছাড়েনি। মান্থবরের সাড়া পেয়ে কালুয়া গরগর করে উঠতেই ফুলকলিয়া লাফিয়ে উঠেছিল। এমন রাতে কি ঘুম হয়?

মান্থবরের মুখটা বেজায় গম্ভীর। লাঠি ও লণ্ঠন রেখে উঠোনের কোণায় হাত পা ধুতে থাকে। সরযুকে ঠেলে তুলিয়ে দিয়েছে ফুলকলিয়া।—সেও মান্থবরের দিকে তাকিয়ে আছে ঘুমঘুমে চোখে।

মান্থবর দাওয়ায় উঠে গামছায় হাত-পা মুছে বলে—ভাত বেড়ে দে বেটি!

খবর কী, সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না দুটি মেয়ে। কখন নিজে থেকে বলবে, তার অপেক্ষা করে। লণ্ঠনের আলোয় দাওয়ায় বসে ভাত খেতে খেতে মোড়লের এতক্ষণে কথা বলার সময় হল।—বেটি সরযু! থাকবি, না ঘর যাবি গে?

সরযু গতিক বুঝে বলে—ঘর যাই কাকা। নিদ লাগে বড্ড।

তাই যা! ভাত খেয়েছিস তো? ফুলি, ওকে ভাত খেতে বলেছিলি? একটু হেসে সরযু বলে—হাঁ হাঁ বলেছিল। অনেক ভাত খেয়েছি দেখনহাসির হাতে।

—তাহলে ঘরে গিয়ে ঝটপট শুয়ে পড। অনেক রাত হয়েছে।

সরযু বেজার হয়ে বেরিয়ে যায়। ফুলকলিয়া তার পিছন-পিছন গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে। সরযু ফিসফিস করেও কিছু বলে না, এতে ফুলকলিয়ার ভাবনা হয়, কাল ও তাকে টাউনে নিয়ে যাবার জন্যে মোড়লকে বলতে পারবে তো? নয়তো বা তাকে একা যেতেই দেবে না। সকাল তো হোক। নিষাদবাগের খবর ফুলকলিয়া জানিয়ে দেবে সরযুকে। তখন নিশ্চয় ওর আর রাগ থাকবে না।

মোড়ল মানুষের বাড়ি। হিসেব করে ভাতের চাল দেওয়া হয় না। তাতে ফুলকলিয়ার মতো গিন্নি। প্রতি বেলা গাদাগাদা ভাত গরুর জাবনায় ঢালতে হয়। মান্নবর চুপচাপ খেল রোজকার মতোই। বাকি ভাতে ফুলকলিয়া জল ঢালল। সিকেয় তুলে রাখল হাঁড়িটা। তারপর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল।

মান্নবর একটা দোমড়ানো সিগারেট বের করেছে ফতুয়ার পকেট থেকে। হেরিকেনের কাচ তুলে ধরিয়ে জোর টান দিল। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—হারামী বাচ্চা ছাড় দিলে না। নগদ ছ'কুড়ি টাকা দিতে চাইলাম—ওর বাপ কখনও এতগুলো দেখেনি। তাও না। সাতকাঠা ভুঁই দিতে চাইলাম। বলল—ভুঁইয়ে পেচ্ছাপ করে দেয়। চৌবেজী খুব শাসাল আমার হয়ে। শালার বেটার একহি বাত। শেষে বলল —মোড়লের বেটি নিজে এসে যদি ছাড় চায় নিজের মুখে, তাহলে ছাড় দেবে। এক পয়সাও চাইবে না। হাতির পাঁচ পা দেখেছে। দিনে আসমানের তারা দেখেছে। আমার নাম মান্নবর। কালই কোর্টকাছারি করব। মামলা ঢোকাব শালার কুঁড়েঘরে।

ফুলকলিয়া গরম শ্বাসপ্রশ্বাস ছেড়ে বলে—না! ফের বলে—না।

মান্নবর গর্জন করে ওঠে—চুপসে শুত যা। দুনিয়াদারির তুই কী বুঝিস?

## ॥ চৌদ্দ ॥

অঞ্জলার বাচ্চাটার বয়স আড়াই বছর মোটে। এতোয়ারি ডাকে গেঁদুয়া! বাচ্চাটা হাঁটতে পারে। দুহাত তুলে টলতে টলতে এসে সামনে দাঁড়ায়। এতোয়ারি কোল দেয়। ভরা গঙ্গা দেখিয়ে বলে—আবে গেঁদুয়া! পাড়ে যাবি? গাঁওয়ালে যাবি? কুমড়া বেচবি, না সোনা বেচবি বে?

অঞ্জলা শিখিয়ে দেয়—বল সোনা!

তার ছেলে তক্ষুণি বলে—ছোনা! এতোয়ারি খিটখিট করে হাসে। তার দাড়ি ধরে টানাটানি করে গেঁদুয়া। দুষ্টুমিতে পাকা। এই মাঠের মধ্যে কুঁড়েঘর, এক টুকরো

উঠোনের শেষে বেড়া, তার নীচে নদীর জল। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে টুপটাপ ঢিল ছোঁড়ে জলে। অঞ্চলা তাকিয়েও দেখে না। এতোয়ারির সবসময় সামাল-সামাল রব। আস্ত কয়েকঝাড় গেঁদাগাছ তুলে এনে লাগিয়েছিল অঞ্চলা, সেগুলো ভাঙচুর করে খেলা করেছিল বলেই এতোয়ারি বাচ্চাটার নাম দিয়েছে গেঁদা। আদর করে ডাকে—গেঁদুয়া। গাঁওয়ালে যাবার সময় ওর সম্পর্কে অঞ্চলাকে পই পই করে সাবধান করে দেয়।

ছোট্ট ঝিঙেক্ষেতের আর্দ্ধেকটা জুড়ে নতুন সংসার এতোয়ারির। অঞ্চলাও খুব কাজের মেয়ে। একটু করে উঠোন। সারাদিন কতবার গোবর দিয়ে নিকোয়। নিকিয়ে সাধ মিটে না। বৃষ্টি তো লেগেই আছে। ধুয়ে যায়। আবার নিকোয়। তুলসী গাছও পুঁতেছে বাঙালী গেরস্থবাড়ির দেখাদেখি। সন্ধ্যেবেলা গড় করে। এসব কাজে একটা শাঁখও চাই বই কি। এতোয়ারি টাউনে গিয়ে এনে দেবে। অঞ্চলা বলে—আর সব গাঁয়ে গাঁওবালারা একরকম, নিষাদবাগে অন্য রকম। দেখে এস করলহাটি, মহুলা, জীবন্তীতে। আর কেউ ছটপরব করেনা। ভারি-ভুরির মানত করেনা। ঠাকুরবাবার থানে যায় না। দুর্গাপুজো কালী পুজো লক্ষ্মীপুজো করছে। যত ঢং নিষাদবাগের! যেকালের যা ধরম সেকালে তা মেনে চলতে হবে।

এতোয়ারি বলে—মুখিয়ার বেটা এবার লক্ষ্মীপুজো দেবে বলেছে। তবে এতটা ঠিক না। ঠাকুরবাবা ভারি-ভুরি কেও মানতে হবে বইকি। ছটপরবটাও তো মন্দ নয়।

এসব ধর্মকর্মে অঞ্চলার নিজের মতামত আছে। সে নানান নজির দেখাবে এগাঁয়ের ওগাঁয়ের। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথাই বলেনা। এতোয়ারিকেও বলতে বারণ করেছে। গাঁওবালারা ওদের দুশমন নয় কি? কলাবেড়িয়ার মোড়লের পক্ষ থেকে এতোয়ারির লাঞ্ছনার একশেষ করল না সে-রাতে? অঞ্চলার পরামর্শেই চলেছে এতোয়ারি। বলেছে, মোড়লের বেটী এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলুক, তখন এক কথায় ছাড় দেবে।

আসলে অঞ্চলার টাকার লোভ যতই থাক, রূপের ডালি গুমোরওলী ছোকড়িটার চোখের সামনে দেখিয়ে দেবে, ত্যাখ গে ত্যাখ! ভাতারের সংসার কেমন করে করতে হয়। খুব তো বাপের পয়সার গরম। এবার ত্যাখ্, ও দিয়ে দুনিয়ায় সুখ হয় না। সুখ কিসে হয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে যা অঞ্চলার উঠোনে।

তবে হ্যাঁ, টাকার দাবিও ছাড়লে হবে না এতোয়ারিকে। টাকা চাই। অন্তত এতোয়ারির স্যাঙার দরুণ গাঁ খাওয়াতে যে খরচ হক্ত, তা লাগবে। আর লাগবে অঞ্চলার গয়নার খরচা। মোটমাট দশ কুড়ি টাকা তো চাই! অগত্যা সাত-আট কুড়ি।

অঞ্চলার মতে, ফুলকলিয়া ছাড় নিতে আসবে এবং সে ওই খেসারতীও দিয়ে যাবে। ব্যস ছুট্টি। তাতে আর এতোয়ারির অন্যমত কী?

মাস্তবর মোড়ল শাসিয়ে গিয়েছিল মামলা করবে। এতোয়ারির মনে দুরু দুরু ভয় ছিল যথেষ্ট। অঞ্চলা সাহস দিয়েছে—করুক না মামলা। বেটিকে কাছারিতে তুলুক না। বড় ঘরের মুখ হাসুক না! কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল। কোথায় কী? গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে আনমনে বাঁধে ঘোরাঘুরি করে এতোয়ারি। অঞ্চলা বাপের কাছে একটা ছাগল পেয়েছে। বিয়ের যৌতুক। এতোয়ারি বাড়ি থাকলে ওভাবে ছাগলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাতা ভেঙে দেয় গাছ থেকে। গেঁদুয়া নীচে খেলা করে। সে নীচে থেকে আধো আধো বুলিতে বাবা ডাকলেই এতোয়ারির দুনিয়া এখন সুখে দুলে ওঠে। অঞ্চলা শিখিয়ে দিয়েছে বাবা বলতে। ছেলের মুখে বাবা ডাক শুনে প্রথম প্রথম কেমন লাগত। এখন কী যে ভাল লাগে এতোয়ারির।

সেই সময় একদিন—এতদিন পরে রাধারঘাট থেকে হাটুয়া এল।

চেনাই যায় না আর। ধোপায় কাচা ধুতি, পায়ে সানডিল, গায়ে ফুলহাতা কামিজ ভি। বাঁধ থেকে ডাক দেয়—এতোয়ারি!

এতোয়ারি লাউ গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছিল। খুরপি হাতে উঠে দাঁড়ায়। দুই পুরনো দোস্ত পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। হাটুয়ার বাবুর চেহারা আর এতোয়ারির সাধুসন্নেসীর মতো গোঁফদাড়ি লম্বা চুল।

—আরে এতোয়ারি। একী করেছিস? হাটুয়া অবাক হয়ে বলে।

অঞ্চলা কুড়েঘর থেকে বেরিয়ে বলে—এ্যাদ্দিনে মনে পড়ল রে? দিদির ভালমন্দে খবর নিলি কী নাই নিলি, বুড়ো মামাটার কথাও ভুলে গিয়েছিলি?

হাটুয়া বলে—চুপ, চুপ গে। তুই কী জানিস তার? মামা তো হরঘড়ি ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। টাকাকড়িও নিয়ে আসে। পুছ করে দেখিস।

অঞ্চলা হাসে।—বেশ, বেশ। তাই হল। তো দিদির বিভাতে আসিসনি। তুই।—এই তো এলাম গে। তোদের বিভার সময় আমি পূর্ণিয়া গিয়েছিলাম না চৌবেজীর সঙ্গে?

হাটুয়া কত কী এনেছে। অঞ্চলার জন্যে রঙীন শাড়ি, গেঁদুয়ার জন্যে জামাপেন্টুল আর এতোয়ারির জন্যে একটা গেঞ্জি আর এক প্যাকেট সিগারেট। তার ওপর শালপাতার ঠোঙা ভর্তি মেঠাইও আনতে ভোলেনি। খুশির ধুম পড়ে যায় বাড়িতে। গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে মেঠাই খাওয়াতে গিয়ে হঠাৎ হাটুয়ার চোখে জল এসে যায়।

—তোর খুব ভাল হবে এতোয়ারি! মা-গঙ্গা তোকে দেখবেন। দিদি খুব কষ্টে ছিল!

এতোয়ারি লজ্জা পায় মনে। ছি, ছি! এই হাটুয়ার সঙ্গে টাউনে বাগানপাড়ায় গলিতে… আঃ! সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে, কে জানে!

—তা সাধুর চেহারা ধরেছিস কেন রে এতোয়ারি ?

এতোয়ারি হাসে।—সামনে মাসে কাটব। বনমালী কখন আসে গাঁয়ে, তখন থাকি না।

অঞ্চলা সুযোগ পেয়ে ফোঁস করে ওঠে—সমঝে দে তোর পুরনো বন্ধুকে। আচ্ছাসে সমঝে দে! ও কি মানুষের চেহারা, না ভূতের ? কখন দেখবে, পাটকাঠির আগুন ধরিয়ে দেব।

দুই বন্ধু প্রচুর হাসতে থাকে। সিগারেট ধরায়। তারপর বাঁধের দিকে যায়। দুজনে অনেক পুরনো কথা বলাবলি করে। তারপর ঘরের খবর, টাউনের খবর। শেষে হাটুয়া কলাবেড়িয়ার কথা আনে। এতোয়ারি বলে—থাক। হাটুয়া বলে—শোন না রে!

মামলা করবে বলে শাসিয়ে গিয়েছিল মাস্তবর। এখনও না করার কারণ, ওর অসুখ। অসুখটা খুব খারাপ। ওদের বাড়ির পিছনে বাঁশবন। বাঁশবনের নীচে গঙ্গার পাড়ের একটা ফোকরে মড়া আটকেছিল। গন্ধে বাড়িতে টেঁকা দায়। তখন মোড়ল করেছে কী, বাঁশ দিয়ে মড়াটা স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ওই হল বিপদ। কে জানে কার মড়া। যাবার সময় মাস্তবরের নাকে একথাবলা গন্ধ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আর ব্যস। মোড়লের খাওয়াদাওয়া বন্ধ। বেটির কাছে ফুলেল তেল নিয়ে মেখেছে। তাতেও গন্ধ ঘোচেনি। তখন ঘাটে গিয়ে চৌবেজীর কাছে আতর নিয়েছে। তাও ঘোচে নি। খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ। শেষে ডাক্তার কবরেজ করেছে, তাও কিছু না। যা খায়, হড় হড় করে বমি করে ফেলে। মোড়লের অবস্থা কাহিল। বিছানায় ধুঁকছে। পাগলের মতো কী সব বকছে আবোল তাবোল। মড়ার ভূতটাও ওকে ধরে ফেলেছিল হয়তো। চৌবেজীর সঙ্গে সকালে হাটুয়া দেখে এসেছে। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। অমন মোটা সোটা মানুষটা হাড়গিলে হয়ে গেছে। চিঁ চিঁ করে কথা বলছে। জলও খেতে পারে না। বলে—গন্ধ লাগছে। থু থু করে ফেলে দিচ্ছে।

আর তার বেটি তো সারাক্ষণ বিছানার পাশে বসে আছে। কান্নাকাটি করছে। কুটুম এসেছে এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে। আর বোধহয় রাতটাও কাটবে না।

এইসব বলে হাটুয়া এতোয়ারির দিকে তাকায়। ওর মতামত জানতে চায়। এতোয়ারি একবার ঘুরে এদিক ওদিক দেখে বলে—গেঁদুয়া কোথা গেল ? গেঁদুয়া ? গেঁদুয়া!

হাটুয়া বলে—ছোড় রে! বাত শোন। এই ব্যাপারটা দেখেই আমার এখানে আসা। তা নইলে আর নিষাদবাগে আসতাম ভেবেছিস ? এ শালা জংলী ভূতের

গাঁ! ভদ্দরলোক আছে নাকি? তো শোন ভাই এতোয়ারি, তুই আমার মামাতো এদিনকে ন্যাঙা করেছিস, খুশি হয়েছি। মরদের দুচারটে বউ থাকা খারাপ না। তোর মোড়ল শ্বশুর মারা গেলে সব সম্পত্তি তো তোর বহুর হাতে যাবে। তুই এই সুযোগ ছাড়বিনে।

এতোয়ারি বলে—না।

—না কেন? এতোয়ারি তুই চিরকাল বোকা থেকে যাবি? চৌবেজীর অত দেনা শুধবি কিসে রে?

—শুধব।

—নিজেকে বেচতে হবে রে বুদ্ধু! হাটুয়া চাপা গলায় বলতে থাকে। তুই কলাবেড়িয়া চল আমার সঙ্গে। গিয়ে খুব দরদ দেখাবি—ডাক্তার হাসপাতালের কথা তুলবি। এ সময় তুই গেলে রাজা হয়ে যাবি। মোড়লের ঘরভর্তি খন্দ, গুড়, হরেক জিনিস। মতগুলো গরু। তুই তো এখনও ওবাড়ির জামাই। গিয়ে একটু ফন্দি-ফিকির করতে হবে এই যা!

এতোয়ারি গোঁ ধরে বলে—ভাগ। ভাগ! তুই বড্ড ফিকিরবাজ রে।

হাটুয়া হতাশভাবে বলে—ভুল করছিস, এতোয়ারি।···

এতোয়ারি যা সমঝাবার সমঝে নিয়েছে। এতোয়ারি মোড়লের বাড়ি গিয়ে থাকলে অঢেল পয়সাকড়ির মালিক হবে। হাটুয়া ভেবেছে, সেই সুযোগে এতোয়ারির ঘাড়ে কাঠাল ভেঙে খাবে। ছেনিমা দেখবে রোজ। বাগানপাড়ায় ভি যাবে। দারু ভি পিবে। এতোয়ারি কোন মুখে না সব খরচ যুগিয়ে যাবে এইসব স্ফূর্তিবাজীর!

মনে মনে তাই রেগেছে এতোয়ারি। ইচ্ছে করছে, হাটুয়া যা সব এনেছে, এক্ষুণি ওকে ফেরত দিয়ে দেয়। এই আচানক উটকো কুটুম্বিতের পেছনে কী আছে, বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু মুশকিল অঞ্চলাকে নিয়ে। পিসতুতো ভাইয়ের উপহার ফেরত দেওয়ার কথা তুললে মার মার কাট কাট আওয়াজ তুলবে। সত্যি বলতে কী, অঞ্চলাকে এতোয়ারি ভয় করে চলে। মেয়েটার কোথায় একটা মস্তো জোর আছে, এতোয়ারি ওকে ঘেন্না করতে করতেই তো আদর দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে। বুকে বুক মিশিয়ে শুচ্ছে। শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আজকাল তার হঠাৎ মনে হয়, খুব কাছে এমন কেউ আছে—দুনিয়াদারির একটা মজবুত ঠাঁইয়ের মতো এবং একটা উঁচু শক্ত জলটুঙির মতো যেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশের বানবন্যার জলকে তুচ্ছ লাগে। আশ্চর্য, পয়সাওলা মোড়লের একমাত্র বেটিকে বিয়ে করেও এই জোরটা মনে পায় নি।

অঞ্চলা সাধাসাধি করল ভাইকে। সে খাবার জন্যে আর দেরি করল না। সূর্য ডোবার আগেই চলে গেল। যাবার সময় এতোয়ারিকে আরও বারকতক ভাবতেও বলে গেল।

একটু পরে সন্ধ্যা হতে না হতে পুবের বাঁধের ওদিকে বিরাট চাঁদ উঠেছে। এতোয়ারি গেঁদুয়াকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখাচ্ছে।—উও দেখ, তোর মামা যাচ্ছে চাঁদের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছিস তো?

হুঁ, বাগানপাড়ায় আজকাল হাটুয়া যায় কি না জিগ্যেস করা হল না। তার গায়ে ঘাফোট নিকলেছিল কি না, তাও একটা জানার মতো কথা।

—আ রে গেঁদুয়া। তোর মামা চাঁদ ধরতে যাচ্ছে, বুঝলি তো। এতোয়ারি প্রবল হাসে। বাচ্চাটাও খিটখিট করে হাসে। থামলে কাতুকুতু খায়।

অঞ্চলা চকচকে ছোট্ট উঠোনে ভাত বাড়তে বাড়তে বলে—এত্তা হাসি কাহে জী।

হাটুয়া যাবার দুদিন পরে চৌবেজী নিষাদবাগে এল। বটতলায় বসে এতোয়ারিকে ডাক পাঠাল। এতোয়ারি গাঁওয়ালে গেছে। সরস্বতী তার বাড়ির সীমানায় লাগানো আনাজ-পাতির এক চিলতেও দেয়না বেটাকে। ছোটী মালতীদের সঙ্গে ঝুড়ি ভরে করে গাঁওয়ালে বেচে আসে। কখনও টাউনেও বেচতে যায়। কিন্তু টাউনে 'তোলা'র পায়সাটা বেশি দিতে হয়। তাই গাঁওয়ালে বেচতেই আগ্রহী সবাই। এদিকে এতোয়ারি শুধু মাঠের দু'টুকরো ক্ষেতের ফসল নিয়ে নতুন দুনিয়াদারিতে মেতেছে।

এতোয়ারির মাঠের ঘরে শেষঅব্দি চৌবেজী এসে হাঁক পাড়ে।—নয়নসুখের বেটি! তোর মরদ তো গাঁওয়াল করে বেড়াচ্ছে। এলে বলবি টাকাগুলো তো খেলাং পাত্তি নয়। যদি এ মাসের মধ্যে না শুধে দেয়, ভুইক্ষেত যেটুকু আছে দখল লিয়ে ফেলব, হাঁ। বলিস বুড়ির বেটাকে।

অঞ্চলা ছেলেকে মাই দিচ্ছিল দুই ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে। উঠোনের খোলামেলায় উনুনে আউষ ধান সেদ্ধ হচ্ছে। লকড়ি ঠেলে দিয়ে আস্তে বলে—হাঁ, গাঁয়ে লোক নেই অসমানে চাঁদসুরয ভি নেই। দিন রাত হয়ে গেছে। ভুঁইয়ের দখল নেবে। পারলে নেবে।

চৌবেজী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তার ময়ূরমুখো ছড়িটা তুলে বলে—নয়নসুখের বেটির বড় বড় বাত হয়েছে বী। তো মরদকে বলিস, বাগানপাড়ায় দারু আর রাণ্ডীবাজী করার সময় হুঁশ ছিল না কেন?

অর্থাৎ এতোয়ারির টাকা নেওয়ার গূঢ় কারণ ওকে জানিয়ে দেওয়া। অঞ্চলা জলন্ত লকড়ি তুলে চেরা গলায় চেঁচায়—খবর্দার! মুখ সামলে বাত করো ঘাটোয়ারিজী।

চৌবেজী আরও খাপ্পা।—দেখ অঞ্চলা, তুইভি ছোট মুখে বড় বাত করবিনে। ঔরত বলে খাতির করব না। বনবিহারী এমনিতে খুব ভাল-মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে কিছু পরোয়া করেনা।

পান্টা অঞ্চলার চেঁচামেচিতে এদিকে ওদিক থেকে নিবাদবাগওলারা এসে যায় অনেকে। ভরতও আসে। অঞ্চলাকে ধমক দেয়। বোঝায়। অঞ্চলার বাচ্চাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এমন কান্নাকাটি জুড়ে দেয় যে তখন তাকে না সামলালে আর বাত করাই মুশকিল। চৌবেজী বলে এতোয়ারি তো ইচ্ছে করলেই দেনা শুধতে পারত। এখনও ভি পারে। কলাবেড়িয়ার মোড়ল ছাড় নিতে এসে অতগুলো টাকা দিতে চাইলে, তাতেও বাবুর মন উঠলনা। তখনই তো আমার ওর ওপর থেকে দয়ামায়া চলে গেল, বলো, যায়, না যায় না ?

ভরত সায় দেয়—আলবাৎ ! যাবে বইকি।

—তো ফির ভি হাটুয়াকে ভেজলাম। যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে এতোয়ারিকে কলাবেড়িয়া নিয়ে যেতে পারে।

বাধা দিয়ে অঞ্চলা প্রায় আর্তনাদ করে—ভাল মতলব দিয়েছিলে জী। আমায় দুশমনী করতে পাঠিয়েছিলে।

চৌবেজী বলে—কাহে ! তুই যেমন আছিস এখন থাকতিস এখানে। পরে এতোয়ারি তোকে লিয়ে যেত কলাবেড়িয়া। মোড়লের বেটীকে আমি চিনিনে ? বয়স কম। আর মনটাও খুব ভাল। কোন ফেরেববাজি জানে না। দুনিয়াদারিতে একদম আনাড়ি। তোর মতো মেয়ে গিয়ে ওর ঘরসংসারে ঝক্কি মাথায় নিলে ও খুশি হত ! এমনকি সেদিন মেয়েটাকে আমি এসব বুঝিয়ে ছিলাম না ? একেবারে রাজী না হলেও নিমরাজী হয়েছিল ও। কোন হঁ্যা না করে নি। তার মানেটা কী ? তার মানে, এ বিপদের দিনে কেউ মাথার উপর দাঁড়ালে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলবি, ওদের কুটুমসোদর তো এসেছিল ! আরে দূর দূর ! সব মড়াখেকো শেয়ালশকুন ! সম্পত্তি টাকা কড়ির লোভে হামলে পড়েছিল। এতোয়ারি গিয়ে পড়লে তক্ষুণি ভেগে যেত।

এই কথাটা এবার অঞ্চলার মনে ধরে। সত্যি তো ! পরে যা হবার হত, একবার কলাবেড়িয়ার সংসারে ঢুকে পড়তে পারলে ছুরতওয়ালীকে কীভাবে জব্দ করতে হয় অঞ্চলা জানে। কিন্তু তার অবাক লাগে হাটুয়া এসব কথা বলতেই এসেছিল সেদিন। অথচ এতোয়ারি তার কাছে সব গোপন করে রেখেছে।

অভিমানে দুঃখে অঞ্চলা সবার সামনে সুর ধরে কাঁদতে থাকে। তার কপালটাই এই !...

কিন্তু এত গোলমালের মধ্যেও নয়ানসুখ এলো না একবারও। ধনপতিয়া পাশে বাঁধ দিয়ে আস্তেসুস্থে হেঁটে দূরের ক্ষেত দেখতে গেল। সেও একবার ব্যাপারটা জানতে এল না। আসলে এতোয়ারির রকম সকম দেখে সমঝদার লোকেরা মনে মনে বিরক্ত। শুধু ভরতের ব্যাপারটা আলাদা। সব তাতে তার নাক গলানো অভ্যাস, তাই এসেছে।

সামান্য দূরে ছোটী শ্মশানবটের শিকড়ে বসে গঙ্গার জলে পা ডুবিয়েছিল। ছাগলটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে বটের পাতা চিবুচ্ছে। গাছভর্তি লাল গুটিফল পেকে রয়েছে। পাখপাখালি কলরব করে খাচ্ছে। ছোটী কলাবেড়িয়ার দিকে নজর রেখে বসেছিল। রোজ ওই অভ্যাস। দাদার ঘরের দিকে গণ্ডগোল শুনে সে উঠে এসেছিল। গাবগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সবটা শুনল আগাগোড়া। তারপর দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে খবরটা দিল।

শুনে সরস্বতী বলে—হুঁ, এ কী গে! আরও কত হবে দেখবি।

ছোটী আজ গাঁওয়ালে যায় নি। মালতীর জ্বর। আর কারও সঙ্গে বিশ্বাস করে তাকে পাঠায় না বুড়ি। উঠতি বয়েস। কোথাও কি বিপদে পড়ে যায়।

ছোটী মায়ের কথা শুনে ক্ষুব্ধভাবে বলে—মা গে! ঘাটোয়ারিজী যদি ভুঁইগুলো কেড়ে নেয় দাদার কাছে!

সরস্বতী রেগে যায়।।—আমি কী করব গে? যাস না তুই, দাদার বহিন তো আছিস!

ছোটী মাকে ইদানীং আগের মতো ভয় করে না। নিজে গাঁওয়াল করে পয়সা আনছে যে! সে পাল্টা রাগ দেখিয়ে বলে—তোর জন্যেই তো এমন হল মা গে!

তোবড়ানো মুখ আরও ভয়ঙ্কর করে বুড়ি বলে—কাহে।

—কলাবেড়িয়ার বহুদিদিকে নিলে তোর কিরে লাগবে বলেই তো দাদা নিতে গেল না। ছোটী অকুতোভয়ে বলে ওঠে। তুই তো দাদাকে কিরে দিয়ে বলেছিলি গে, ও বহু তোর মা হয়। দাদা আর কোন মুখে বহুদিদিকে নিতে যাবে?

সরস্বতী মেয়ের স্পর্ধা দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মুখে কথা সরে না।

ছোটী ফের বলে—তুই মা না গে, তুই শকুন। নিজের বেটার মাথা নিজেই কামড়ে কামড়ে খেয়েছিস। দাদাকো তু গাঙমে ফেক দেইলা গে!

বলেই সে কান্না চেপে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। শ্মশানবটের ছায়ায় ছাগলটা একলা আছে। আজকাল গঙ্গার পাড়ে ঝোপ ঝাড়ে সব সময় মড়ার খোঁজে শেয়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। ছোটী দূর থেকে ছাগলটা দেখতে পেয়ে আশ্বাস দেয়—মুংলি। হেই মুংলি। আমি যাচ্ছি রী!

আওয়াজটায় কান্না ঠেলে বেরুচ্ছে।

নিষাদবাগের লোক চৌবেজীর কাছে টাকা নিচ্ছে কতকাল থেকে। সুদে আসলে শোধ করতে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তবু গণ্ডগোল করেনি। মুখ বুজে মেনে নিয়েছে সব। কিন্তু এতোয়ারির বেলায় অন্য রকম ঘটল। কাপাসী থেকে লাঠিয়াল এনে চৌবেজী এতোয়ারির দু'টুকরো জমিই দখল করে নিল। এতোয়ারি গাঁওয়াল থেকে ফিরে দেখে

তার পটল আর করেলার সবুজ ভুঁই এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছে লাঙলের ফলা। অন্য ভুঁইয়ে পাট লাগিয়েছিল চৌবেজীর দাদন খেয়ে। খরায় মরে হেজে গিয়ে কিছু পাট টিঁকে গিয়েছিল শেষ মেষ। সে পাটও মাটির চাঙড়ে দলা পাকিয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চাঙড়গুলোতে লাথি মেরে-মেরে এতোয়ারি কিছুক্ষণ রাগ দেখায়। ওখানে কুঁড়েঘরে অঙ্কলা সমানে চেঁচানি জুড়েছে তো জুড়েছে। বনবিহারী ঘাটোয়ারির চোদ্দ-পুরুষকে ভরা গঙ্গায় চুবিয়ে নাকাল করছে। বর্ষার ভেজা আর বাতাসে উর্বর গাঙেয় মাটির গন্ধে এতোয়ারির দম তখন আটকে যাচ্ছে। তার মাও এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছে! উনিশভরি গয়না কোথায় যে সামলে রেখেছে বুড়ি, প্রাণ গেলেও তা বলবে না। বেহায়ার মতো এতোয়ারি মায়ের কাছে গিয়েছিল। খুব সাধ্যসাধনা করেছিল। বুড়ি দেয়নি। দিলে সেগুলো বেচে এই বিপদ ঠেকাতে পারতো।

অন্ধকার মাঠের হাওয়ায় ওল্টানো মাটির কড়া গন্ধ, আর পাশের গঙ্গার জলের চাপা ছলছল শব্দ এতোয়ারিকে হঠাৎ একটু বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ তার মনে হয়, যাবে নাকি কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটির কাছে নিশুতি রাতে, যখন দুনিয়া ঘুমিয়ে থাকবে, কেউ টের পাবে না, চুপিচুপি? বলবে—তোর তো অনেক টাকাকড়ি আছে বহু গে, আমি তো এখনও তোর মরদ আছি—

যেন সাপের ছোবল খায় বুকের ভেতর থেকে। অন্ধকারে ভূতের মতো নড়াচড়া করে এতোয়ারি। ওভাবেই বলতে চায়—না, না, না।—

বাঁধের দিকে সাইকেলের ঘন্টি বাজে এবং এক চিলতে আলো দেখা যায়। মুখিয়ার বেটা বাড়ি ফিরছে। কী ভেবে এতোয়ারি বাঁধের দিকে পা বাড়ায়। চেঁচিয়ে ডাকে—সুরয! সুরযুয়া!

সূর্য সাড়া দেয়—কে? এতোয়ারি দা নাকি?

—হাঁ ভাই সুরয। এতোয়ারি হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে তার সাইকেলের হাণ্ডিলে হাত রাখে—সুরয! চৌবেজী আমার ভুঁই কেড়ে লিয়েছে। আমাকে খতম করে দিয়েছে ভাই।

সূর্য সাইকেল থেকে নেমে ভারি গলায় বলে—হুঁ। শুনেছি।

এতোয়ারি ব্যাকুল হয়ে বলে—তুমি লিখাপড়াহ আদমী। আমি নাদান। একটা কিছু তো বাৎলাও ভাই! সুদে আসলে ছকুড়ি টাকার জায়গায় বারোকুড়ি দাবি করেছিল ঘাটোয়ারি। আর দেড়কুড়ি পাটের দাদন। আমার ভুঁই দুখানার দাম আরও বেশি।

সূর্য বলে—কাগজে টিপছাপ দিয়েছিলে এতোয়ারিদা?

—হাঁ হাঁ। আমি দিয়েছিলাম। মা ভি দিয়েছিল।

—তাহলে তো মুশকিলের কথা। আচ্ছা, আমি দেখছি।...বলে সূর্য পকেট থেকে

সিগারেটের প্যাকেট বের করে। এতোয়ারিকে দেয়। নিজে নেয়। দেশলাই জ্বালে হাওয়া বাঁচিয়ে।

এতোয়ারি সিগারেটটা হাতে ধরে থাকে। বলে—পরে খাব সুরয।

সূর্য কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর বলে—ঘাটোয়ারির জুলুমবাজীর কথা আমি অনেক দিন থেকে ভেবেছি এতোয়ারিদা। ভেবেছি একটা কিছু করা দরকার। তো এতোয়ারি দা, দেশে এতদিন বৃটিশ রাজ্য, আমরা পরাধীন ছিলাম। এবার স্বাধীন হচ্ছি। আর কিছুদিন পরেই আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। তখন আর কারও জুলুম চলবে না। তখন গাঁওবালাদের আর কষ্ট হবে না।…

এতোয়ারি কিছু বোঝে না। সে কথা কেড়ে বলে—তুমি লিখাপড়াহ ছোকড়া। সুরয, তুমি আর কিছুদিন পরে গাঁয়ের মুখিয়া হবে। আমার ভুঁই দুটো কেড়ে নিল ঘাটোয়ারি—তুমি আমাকে একটা ফিকির তো বাৎলাও ভাই!

সূর্য একটু হাসে। স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিষাদবাগওয়ালারা বোঝেই না। তার বাবা ধনপতি সরকারও বোঝে না। আর ওই ভরত তো অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেয়—গরীবের ভালো হবে? ছোড় জী! ঠাকুরবাবা যদি ভাল করেন তো হবে নয়তো ওই যে বলছ 'কাঁকরেস' ( কংগ্রেস ) না কী যেন—

সূর্য বলে—কিন্তু ভুলটা তো তোমারই এতোয়ারি দা! কলাবেড়িয়ার মেয়েকে ছাড় দিলেই তো অনেক টাকা পেয়ে যেতে! মান্যবর কাকা এসেছিল পর্যন্ত! তুমি গোঁ ধরে রইলে। এখন তো মান্যবর কাকা নেই যে আমি গিয়ে টাকার কথা তুলব।

এতোয়ারি আস্তে আস্তে বলে—আমি তোমাকে তা বলিনি গে!

পরক্ষণে সে তার কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সূর্য ডাকে—এতোয়ারিদা শোন, শোন। কথা আছে।

এতোয়ারি জবাব দেয় না। সূর্য বোঝে, রাগ হয়েছে এতোয়ারির। কলাবেড়িয়ার মেয়েটির ব্যাপারে কেন তার এমন অদ্ভুত রাগ? নিষাদবাগের লোকেরা যেমন ব্যাপারটা বোঝে না, সূর্যও তাই। মোড়লের বেটি বেচারিকে বড় বেশি শাস্তি দিচ্ছে এতোয়ারি।

আজ টাউনে অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। সূর্যের সঙ্গে শরম না মেনে কত কথা যে বলল। সূর্য অবাক হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর কলাবেড়িয়ার মেয়ে যেন কোত্থেকে প্রচণ্ড জোর পেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে বলেই কি? এতোয়ারিকে এই ব্যাপারটাই বলতে চাইছিল।

ফুলকলিয়া সূর্যকে একবার যেতে বলেছে। খুব জরুরী বাত আছে। যাবে সূর্য? আজ সারাক্ষণ মনে সেই তোলপাড় চলছে। যাবে, না যাবে না?

## ॥ পনের ॥

ভোররাতে ঘুম ভেঙে এতোয়ারি টের পেয়েছিল আবার আসমান জোর বর্ষাচ্ছে। তিনদিন থেকে এই বাদলার উপদ্রব। সেদিন হাটবার মহুলায়। মা গঙ্গার বুকের কাছে বড় যত্নে অঞ্চলা যে মাচান বেঁধেছিল শশা আর শিমের, অঢেল ফলেছে ভারিভুরির দয়ায়। এই টুকরো উঠোনের কোণায় এককাঠা ক্ষেতটুকু ছাড়া আর তো ভুঁই নেই এতোয়ারির। ওখানেই মাগ-মরদে খেটেছে সকালসন্ধ্যা। ক্ষেতের শেষে বেড়ার নীচে জল ছলছল করে সারাক্ষণ। মা গঙ্গার খুব করুণা। পাড় ধসিয়ে নিষাদবাগওয়ালাদের ক্ষতি করেনা কস্মিনকালে। পুরুষ-পুরুষানুক্রম দেখে আসছে, তত কিছু বানবন্যা হয় না এ নদীতে। সেই বিশ্বাসেই এতোয়ারির এমন কিনারায় ঘর বেঁধে থাকা এবং আনাজপাতির মাচান। রাতে ভেবেছিল, ভোরবেলা উঠে মাগ-মরদে শশাগুলো তুলবে। শিম তুলবে। তারপর জামবাটিভরা ছাতু খেয়ে এতোয়ারি যাবে মহুলার হাটে। বাবুদের পুজো এসে গেছে। তাই অঞ্চলাও ছেলেকে কোলে নিয়ে সঙ্গে যাবে ঠাকুর দেখিয়ে আনবে। হঠাৎ ভোরে এই তুলকালাম বিষ্টি। আসমান কি ফুটো হয়ে গেল রী? বলে এতোয়ারি বাইরে উঁকি দিয়েছিল। তারপর অবাক হল। সারারাতের পচা গন্ধটা আর পাচ্ছে না।

বর্ষায় ভাগীরথী আর তার দুই কূলে বড় শোভা। ভরা গঙ্গায় পচাগলা মড়া বুকে শকুন কী দাঁড়কাক নিয়ে ভেসে যাওয়াও তো সেই শোভার এক শোভা। এ নদী কিনা দেবদেবতা! যার শিয়রে বসে আছেন স্বয়ং ঠাকুরবাবা দুই কাঁধে দুই কন্যা ভারি ঔর ভুরি। কিছু অপবিত্র লাগবেই না তোমার। যদি লাগে তবে জানবে মনে তোমার পাপের বাসা। তোমার চোখ পাপের চোখ। পাপের নাক বদগন্ধ শোঁকে। ওই জন্যেই তো মান্যবর মোড়লের ওই ভয়ঙ্কর শাস্তি হল। এতোয়ারির বেড়ার নীচে আগের সন্ধ্যায় একটা গরুর লাশ এসে ঠেকেছিল। সারারাত সেই পচা গন্ধ। তবু ভয়ে লাশটা ঠেলে সরিয়ে দেয়নি। এখন গন্ধটা পাচ্ছিল না। তার মানে স্রোত হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গেছে। এতোয়ারি খুশি হল। কলাবেড়িয়ার মোড়লের পয়সা ছিল। কিন্তু ভক্তি ছিল না। এতোয়ারির আজকাল বড় ভক্তি।

একটানা বর্ষাচ্ছে আসমান। অঞ্চলা আবছা অন্ধকারে চোখ খুলে অস্পষ্ট কিছু বলল। এতোয়ারি তালপাতার ছাতাটা খুঁজে নিয়ে বলে—উঠ্ যা রী বহু।

সে ছাতা মাথায় কংক পা গিয়ে দেখে মাচানের তলায় জল এসেছে। আসুক। এর বেশি বাড়ে না। সে শশাগুলো তুলতে শুরু করে এবং মাঝে মাঝে অঞ্চলাকে ডাকে। চারদিক ধুসর। গঙ্গায় কেমন চাপা গম্ভীর একটা শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে সেই আজব আওয়াজ এতোয়ারিকে একটু ডর পাইয়ে দেয়। কিন্তু অঞ্চলা আসছেনা দেখে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচায়--ও রী গতরওয়ালী! খুব রাণী হয়ে গেলি নাকি? হাটের বেলা বয়ে যাবে সমঝাচ্ছিস না?

তখন অঞ্চলা বেরিয়ে আসে। মাথা থেকে পিঠের দিকটা ঢেকে রাখার মতো একটা তালপাতার 'খোপড়ি' বানিয়েছিল নিজে। সেইটা চাপিয়ে বেরিয়েছে সে। ঝুড়িও নিতে ভোলে নি। মাচার কাছে এসে আঁতকে ওঠে।—মা গে! এত্তা পানি কাঁহে গে!

এতোয়ারি বলে—পানি জেরাসে বেড়েছে গাঙমে। বাড়ুক না। ঝটপট শিমগুলো তুলে ফেল।

—তো এত্তা বিষ্টির মধ্যে হাট কি বসবে জী?

—বাত মাৎ কর রী! বিরক্ত এতোয়ারি শশা তুলতে তুলতে বলে। কমসে কম তিরিশটি ফলেছে। মন্দ কী! কোণার দিকে প্রথম জন্মানো শশাটা রেখে দেবার রেওয়াজ আছে। ওটা ভারি-ভুরির নামে চালের বাতায় ঝুলিয়ে রাখা হবে বীজের জন্যে।

এইসব বিষ্টির নাম 'গাজল।' গাজলের ফোঁটা হাল্কা এবং দিনভর রাতভর চললে তখন 'ডাত্তর।' ডাত্তরের সঙ্গে উত্তাল হাওয়া বইতে থাকলে 'ফাঁপি।' ফাঁপি বাড়লে 'তুফান।' একটু পরে পিছনে নীচু বাঁধের দিকে থেকে যে হাওয়া এল, তার গতিক ভাল নয়। উত্তর পূর্ব কোণের এই হাওয়া ফাঁপির আভাস কিনা কে জানে! দু'ঝুড়ি শশা আর শিম দাওয়ায় রেখে এতোয়ারি যখন ছাতু খাচ্ছে, হাওয়াটা বেড়ে গেল। অঞ্চলা একটু হেসে বলল—মহুলার হাটে কেমন করে যাবে জী? ছাত্তি তো তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গাঙমে ফেলবে।

এতোয়ারিও একটু হাসে। ঢকঢক করে জল খেয়ে মুখ মোছে। বিড়ি ধরায় চকমকি ঠুকে। আজকাল আর দেশলাই কিনে বাজে খরচ করে না সে। খরার সময়কার সেই টাউনবাজী শৌখিনতা এখন স্বপ্নের মতো লাগে।

বেচারী অঞ্চলা ছেলেকে নিয়ে মহুলায় ঠাকুর দেখতে চেয়েছিল। হলনা। এতোয়ারি ঘুমন্ত গেঁদুয়াকে খুব আদর করতে গিয়ে জাগিয়ে ফেলল। একটু পরে যখন বেরুল, তখন গেঁদুয়া কাঁদছে। বাঁধে হাওয়া আর বিষ্টির মধ্যে টলতে টলতে ভার কাঁধে নিয়ে এতোয়ারি চলল। গেঁদুয়ার কান্নার আওয়াজ কানে আবছা ভেসে আসছিল।

অঙ্কুলা বেটাকে মাই দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করছে। গেঁতুয়া এতোয়ারির এতো কোল-লাগড়া হয়ে গেছে যে গাঁওয়ালে বেরুলেই সঙ্গে যাবার জন্যে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। বাঁধের পথে অতি কষ্টে যতদূর যায় এতোয়ারি, ওর জন্যে মনটা কেমন করে।

আধাআধি রাস্তা যেতেই হাওয়া আরও বেড়ে গেল। তারপর অঙ্কুলা যা বলেছিস, ঠিক তাই হল। তালপাতার ছাতাটা ছেড়ে না দিলে এতোয়ারি গিয়ে নির্ঘাৎ গঙ্গায় পড়ত। ছাতাটা ছেড়ে দিল সে। উড়ে গিয়ে ঝুপ করে স্রোতে পড়ল হাত বিশেক দূরে। তারপর বোকার মতো ভার কাঁধে নিয়ে এতোয়ারি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। ছাতাটা বৃষ্টির ধুসরতায় আবছা হতে হতে যখন জলের তলায় হারিয়ে গেল, সে রেগে গেল হঠাৎ। জেদ চড়ে গেল মাথায়। যা কিছু ঘটুক, মহুলার হাটে যাবেই সে। ঘা খাওয়া জানোয়ারের মতো চাপা গর্জন করে কুঁজো হয়ে দুলেদুলে চলল এতোয়ারি। পিছল মাটিতে পা রাখা মুসকিল। বারবার টলে আছাড় খাবার উপক্রম, তবু সে অন্ধ জেদে ফুঁসে ওঠে। চাপা গলায় হুঙ্কার দেয়। আর চলতে থাকে।

এই সেই এতোয়ারি, যে কলাবেড়িয়ার মোড়লের ঘরজামাই হতে চায়নি—তার টাকার লোভে এতটুকু টলেনি। এত অপমান আর দারিদ্র্যের দুঃখকষ্টের মধ্যে মাথা উঁচু করে চলতে চেয়েছে, তবু ইমানসে ধরমসে যে পয়সাওয়ালী মেয়ে তার এখনও বহু, তার কাছে হাত বাড়াতে যায়নি।

সারাপথ কোথাও কোন লোক নেই। এই দুর্যোগে কেউ তার মতো গোঁয়ার্তুমি করে বেরোয়নি। বাঁয়ে করলহাটি, ডাইনে গঙ্গার পাড়ে ঘোড়ামারার বস্তী ফেলে মাঠের আলপথে নামে সে। তখনও কারো সঙ্গে দেখা হয়না। সামনে মহুলার 'বাম্বুক' দেখা যাচ্ছে—সে আমলের এক রেশমকুঠির পোড়ো দালানবাড়ীতে ইটের উঁচু মিনারের মতো একটা স্তম্ভ। বাম্বুকটা তাকে হাতছানি দেয়। সাহস যোগায়।

ছোটী সেদিন মনমরা। আগের দিন সন্ধ্যায় শহর থেকে মালতীর সঙ্গে আনাজ বেচে ফেরার সময় একখানা সাবুন আর ছোট্ট এক শিশি আমলা তেল কিনেছিল। সাবুনের দাম ছয় আনা, গন্ধ তেলটার দাম দশ আনা। তার জন্যে মা তাকে চুল ধরে মার দিয়েছে। এ বাজারে একটা টাকা ওই কিনে কোন্ আক্কেলে খরচ করল হারামজাদী মেয়ে! এক্ষু টাউনবাজ হয়ে গেল? এদিকে দুবেলা পেটের খাবার জোটে না! আর ঘরে যোয়ান বেটা নেই—ভুঁইক্ষেত নেই, শুধু এই ভিটে। উঠোনের দুটোচারটে ফলের গাছ আর মাচান সম্বল।

অকথ্য গাল দিয়েছে সরস্বতী। শরত দালালের বহুর পাল্লায় পড়েছে বলে সন্দেহ করেছে। মালতীর নামেও কুচ্ছো করেছে। তাই শুনে মালতীর মা-বেটিরা এসে

ঝগড়া করেও গেছে। রাতে রাগে দুঃখে খায়নি ছোটী। সারারাত হঠাৎ ঘুম এসেছে, স্বপ্ন দেখেছে আর হঠাৎ ঘুম ভেঙে কতক্ষণ মনে ছটফটানি। আজ কী হল। খালি কলাবেড়িয়ার বহুদিদির স্বপ্ন। গঙ্গাপুজোর মেলায় হাত ধরাধরি করে বেড়ানো আর জিলিপি খাওয়া। মধুর আশ্রমে বড় বড় লাল হলুদ গাঁদা ফুল তুলতে গিয়ে সে কী বিপদ! সাধু রাক্ষুসে মূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসে পালানো যায় না। ও বহুদিদি, তু কাহা রী! ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না। চোখের জলে বালিশ ভেজানো।...

ভোরে বৃষ্টি। তারপর 'ফাঁপি' শুরু হলে সরস্বতী বলেছে—ওঠ্। উঠে মুখ ধুয়ে দানাপানিগুলো খা। খুব হয়েছে। আর রাগ দেখাতে হবে না।

যদ্দিন বটতলায় না যাই তদ্দিন বকব। তারপর যা করবি তা তো জানি।

এইসব শুনে মায়ের চাপা দুঃখটা টের পেয়েছে ছোটী। মনটা ভাল হয়ে গেছে তার। আহা, মা তো বটে। দাদা নিদয়া হয়ে ফেলে গেল। বুড়ি মা আর কদিনই বা বাঁচবে? এখন তার মাকে কোনভাবে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সত্যি তো, পরের ঘরে চলে যেতে হবে ছোটীকে। তখন কত সাবুন মাখবে, কত গন্ধ তেল চুলে ঢালবে! আজকালকার বরগুলো সবাই টাউনবাজ হয় কি না।

সাবুন আর তেলটা কাকেও বেচে দেবে বরং দু আনা কম পেলেও চলবে। কিন্তু যা 'ফাঁপি' লেগে গেল, বাড়ি থেকে বেরুনোই মুশকিল। ছোটী মুখ ধুল। রাতের পান্তাগুলো খেতেও ছাড়ল না। তারপর খুব গিন্নিপনা দেখাতে শুরু করল। ভরতের বাড়ি থেকে সরস্বতা পাঁচসের ছোলা এনেছে। ভেজে ছাতু করে দেবে। তার বদলে ভরত দেবে দেড়কাঠা আউস চাল। চালটা না পেলে পরদিন আর ভাত খাওয়া যাবে না। গাঁয়ে চাল কোথায় কিনবে? কিনতে হলে সেই টাউন। 'ফাঁপি' যখন লেগেছে, কয়েকটা দিন থাকবেই।

এসব ভেবে ছোটী ঘরের পিছনে শুকনো ঘুঁটে ছাড়াতে গেল। বৃষ্টির ঝাপটানিতে সব ভিজে যাবে একে একে। আর ঘুঁটে ছাড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল পিছনের চালের বাতায়। খড়ের এক জায়গায় উঁকি মেরে আছে একটুখানি ন্যাকড়া। একটু অবাক হল! বহুদিদির কীর্তি! ছি ছি, ওখানে কেউ গোঁজে নাকি? ওই খারাপ স্বভাবের জন্যেই তো এ বাড়িতে ওর থাকা হল না—বাপের বাড়ি পালিয়েও কি সুখ পেল? বাপটা আচানক মারা পড়ল ভূতের হাতে।

ঘুঁটে ছাড়ানো বন্ধ রেখে কাস্তের খোঁচায় ন্যাকড়াটা টেনে সে ফেলে দিতে চাইল চালের বাতা থেকে। আর তারপরই চমকে উঠল।

ন্যাকড়াটা নোংরা নয় এবং ওটা একটা 'উরমাল' অর্থাৎ রুমাল। বহুদিদির কাছে উরমাল থাকতে দেখেছে ছোটী। এবং ওই উরমালে কিছু গিট দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

ওজনে ভারি। ধুপ করে গড়িয়ে পড়ছে ছাঁচতলায়। চালগড়ানো বৃষ্টিতে ভিজতে লেগেছে। ছোটী ঝটপট কুড়িয়ে নিল। তারপর কাঁপা কাঁপা আঙুলে খুলতে থাকল। খুলতে কষ্টই হচ্ছিল। জলে গিটটা আঁটো হয়ে গেছে। তখন সে কাস্তের ডগা দিয়ে ফেড়ে ফেলল। অমনি বুক ছাৎ করে উঠল তার। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এক গুচ্ছের রূপোর টাকা!

কার এ টাকা, তা বোঝাই যাচ্ছে। বড়লোকের বেটি বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে লুকিয়ে রেখেছিল এবং পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু গঙ্গাপুজোর সময় তো ছোটীর সঙ্গে দেখা হল, কথাটা বলল না কেন? নাকি ভুলেই গেছে? এতগুলো টাকার কথা মানুষ ভুলে থাকতে পারে?

হয়তো পারে। ওর বাপের যে অনেক টাকা।

ছোটী টাকাগুলো নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মাকে দেখালে কী করবে, সে জানে না। মা হয়তো আনাজপাতির ব্যবসা করতেই চাইবে। নয়তো ছাগল কিনে ফেলবে আরেকটা। ছোটী খুশি, দ্বিধা, ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে। শেষে ভাবে, লুকোনোই থাক্ এখন। পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। তবে একটা টাকা নিতেই বা দোষ কী? বহুদিদি তাকে ভালবাসে, একথা তো মিথ্যে নয়। একটা টাকা বাজে খরচ করেছে বলে রাতে কত লাঞ্ছনা হল। এখন মায়ের মুখের সামনে ঝলমলিয়ে একটা রূপোর টাকা ঠকাস করে ফেলে দেবে।—লো গে, তেরা রূপেয়া! হাম খরচা কিইলে, হাম ফেরৎ ভি দেইলে! আঃ! মায়ের মুখের যা ভাব হবে!

ছোটী গুণে দেখল—এখন সে গুণতে শিখেছে। সাতটা টাকা রয়েছে। টাকাগুলো রুমালের ছেঁড়া অংশটা বাঁচিয়ে ভাল করে বেঁধে রাখে এবং একটা টাকা কোমরের কাপড়ে গোঁজে। তারপর টাকার রুমালটা অন্য এক জায়গায় চালের খড়ের মধ্যে সাবধানে গুঁজে দেয়।

—ছোটী রী। ওখানে কী করছিস।

ছোটী চমকে উঠে দেয়ালের উঁচু ভিত থেকে আছাড় খায়। এদিকে মালতীদের বাড়ির পিছনকার সজ্জিক্ষেত। বৃষ্টির মধ্যে মালতীর মা কলার কাঁদি কাটতে বেরিয়েছে। দেখে ফেলল না তো? ছোটী সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—ঘুঁটে তুলছি গে মোসি! কলা কাটবার আর সময় পেলিনে তুই?

মালতীর মা বলে—ফাঁপি উঠেছে। পাকন্ত কাঁদিটা গিরে গেলে বরবাদ হবে রী। তাই কেটে নিই। গোড়ার মধ্যে জাগ দিয়ে রাখব।

শুকনো ঘুঁটেগুলো আঁচলে নিয়ে ছোটী তক্ষুণি চলে আসে। মা উনুন ধরিয়েছে দাওয়ায়। ছোলাগুলো বের করেছে বাঁশের টুকরিতে। ঘুঁটে দেখে খুশি হয়ে বলে—

আয় দেখি বেটি। বালি গরম হয়েছে। ভাজতে পারবি কিনা ছাখ। আমি ছাগলটাকে আমানি দিই।

একে আনাড়ি হাত। তাতে টাকার ভাবনাচিন্তা মনে। ছোটীর হাত কাঁপে। ছোলাগুলো পুড়ে যাবার দাখিল। সরস্বতী এসে দেখে হাঁ হাঁ করে ওঠে। কেড়ে নেয় মেয়ের হাত থেকে। কিন্তু মুখে হাসি রেখে বলে—শ্বশুরাল গিয়ে তুই কী যে করবি বেটি, ভেবেই পাইনে। তাই তো অত করে বলি, কাজকাম মন দিয়ে শিখে নে, যদ্দিন বেঁচে আছি।

ছোটী মিষ্টি হেসে ডাকে—মা।

—উঁ ?

—কাল একঠো রুপেয়া হামি খরচা কইলে। তো ইয়ে লে গে তেরা রূপেয়া। বলে সে ট্যাঁক থেকে চাঁদির টাকাটা মায়ের পেটের কাছে ফেলে দেয়। খিলখিল করে হাসতে থাকে। যেন ভোজবাজি যাদুর খেল দেখিয়ে দিয়েছে।

সরস্বতী বাঁ হাতে পেটের কাছটায় কাপড়ের ভাঁজ খুঁজে টাকাটা তোলে। দেখে উল্টেপাল্টে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছোটীর দিকে তাকায়। ফোকলা মুখটা ফাঁক হয়ে গেছে। ভেতরে আধা অন্ধকারে জিভটা দেখা যাচ্ছে। ঘোলাটে দৃষ্টি নিষ্পলক। ভুরু কোঁচকানো। কড়াইয়ে বালি পুড়ে কালো। ধোঁয়াচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি আর উত্তাল হাওয়ার একটানা শব্দ। গাছপালা দুলছে। বাহানে শিম করেলা শশার লতা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারপর সে শ্বাসপ্রশ্বাস মিশানো স্বরে আস্তে বলে—কোথায় পেলি ?

ছোটী হাসতে হাসতে বলে—বোঁলু কাঁহে গে ? নেহি বোঁলু। শোধ তো হল—ঔর ক্যা ?

কালো বালির ধোঁয়া বাড়ছে। সরস্বতী ফের বলে—কোথায় পেলি ?

ছোটী রাগ করে বলে—পেয়েছি। এত বাত কাঁহে গে ? পেলি—ব্যস !

সরস্বতী কড়াই নামিয়ে রাখে! তারপর ঘুরে বসে বলে—মালতীর বর দিয়েছে তোকে ?

ছোটী চমকে ওঠে। জোরে মাথা দোলায়।

—ঘুঁটে আনতে গিয়ে মালতীর বরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আর তোকে রূপেয়াঠো দিলে ? সরস্বতী হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করে একথা।

ছোটী চেঁচিয়ে ওঠে—না। না!

—হরঘড়ি মালতীর বরের নজর তোর দিকে। টৌন যাচ্ছিস, হাট যাচ্ছিস। আর আমি অন্ধা রী ? আমি কি কিছু সমঝাইনে রী ? ও রী বলি, কুত্তিন, বাজারওয়ালী খানকি! তুই ওর কাছে রূপেয়া লিয়ে এলি। আ থু থু। আ ছেঃ ছেঃ। ওয়াক থু।

বলতে বলতে সরস্বতী মেঝের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আবার রাতের মতো হামলা। ছোটী এখন রাতের মতো চেঁচিয়ে ওঠে না। বোবা হয়ে গেছে। মা তাকে গরম বালিতে পুড়ে যাওয়া কুচির গোছা দিয়ে মুখে মারছে। দুহাতে মুখ ঢাকে ছোটী। নিঃশব্দে মার হজম করে।

টাকাটা সরস্বতী কাদায় ভরা উঠোনে কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছে। হাওয়া ততক্ষণ গেছে বেড়ে। দাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসছে। হঠাৎ সরস্বতী গরম বালির কড়াইটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—গরম ঢালব কুত্তিনের মুখে।...

সঙ্গে সঙ্গে ছোটী আর্ত চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠোনে নামে। দিশেহারা হয়ে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায়। পালাতে থাকে।...

মঙ্গলার হাট সেই দুর্যোগে প্রায় খাঁ খাঁ। দুপুর নাগাদ ঝড়বৃষ্টি বাড়লে আটচালা-গুলোর যে সব মরীয়া হাটুরে এসে জুটেছিল দোকানপাটের দাওয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল। কেউ কেউ বাড়ি ফেরার চেষ্টা করল। তারাই মাঠ থেকে ফিরে এসে খবরটা দিল। বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে মাঠে। অথৈ সমুদ্দুর চারদিকে। হইচই পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এতোয়ারি হাটের অবস্থা দেখে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে শশা আর শিমগুলো নয়ছয় করে বেচেছে। তারপর বাজারে এসেছে গেঁদুয়ার জন্যে মেঠাই কিনতে। আর কেনা হল না। হাটতলায় তখন জল ঢুকে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে ঝড়। মড়মড় করে চোখের সামনে হাটের পুরনো বটগাছটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। আটচালাগুলো ডালপালার তলায় চাপা পড়ল। ব্যস্ততা হইচই পালাই-পালাই হট্টগোল চারদিকে। হাঁটুজল ভেঙে এতোয়ারি 'বাঁইকটা লাঠির মতো ডুবিয়ে-ডুবিয়ে চলতে থাকে। ঝুড়ি দুটো পিঠে ঝুলিয়ে রাখে। গাঁয়ের লোকেরা উঁচু জায়গার দিকে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ঝড়ের শব্দের মধ্যে আবছা হাঁকা-হাঁকির শব্দ। এতোয়ারি জল ভেঙে মাঠের ধারে এসে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যতদূর চোখ যায় জল, শুধু জল। সেই জল দুলে উঠছে। ফুলে উঠছে। গাছপালা ভেঙে পড়ছে। 'মা' ভৈরবী সন্ন্যাসিনীর মতো আলুথালু জটা দুলিয়ে নাচছে। এতোয়ারির বুকের ভেতর একটা তীব্র চিৎকার ওঠে—গেঁদুয়া-আ-আ-আ! কিন্তু জিভ নিঃসাড়। বুকে এতটুকু দম নেই।

এতোয়ারি বাঁইকটা ফেলে দেয়। ঝুড়ি দুটো ফেলে দেয়। মাঠে হুড়মুড় করে নামে। সাঁতার কাটতে থাকে। ঠাকুরবাবা! এতদিনেই কি এতোয়ারির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে? এ যে অনেক বেশি হয়ে গেল ঠাকুরবাবা!

সে বাঁধের ভাঙনের ওপারে পৌঁছতে চেষ্টা করে। বাঁধটা ওদিকে ডুবু-ডুবু হয়ে জেগে আছে কিছুদূর। জলের তোড়ে বারবার দুরে যায় সে। এক সময় হাঁচড় পাঁচড় করে বাঁধের মাটি আঁকড়ে ধরে। টলতে টলতে হাঁটে। দুধারে জল। বাঁয়ে নদী, ডাইনে মাঠ দুদিকেই অতল জল। বাঁধটা শিগগির তলিয়ে যাবে মনে হয় তার। দৌড়তে থাকে নিষাদবাগের দিকে।

মধ্যে মধ্যে ভাঙন। তীব্র স্রোত ঢুকছে নদী থেকে। অনেক কষ্টে ওপারে ওঠে। আবার কিছুটা ভাঙা, আবার ভাঙন। নিষাদবাগের কাছাকাছি গিয়ে সে তার কুড়েঘরটা খুঁজতে চেষ্টা করে। এ কি চোখের ভুল? এই তো শ্মশানবট, ওই ধনপতি মুখিয়ার বাড়ি! সবখানে জল। কিন্তু তার কুঁড়েঘরটা কই? এতোয়ারি গর্জন করে ডাকে —অঞ্চলা আ-আ! গেঁদুয়া—আ-আ! ঝড় বৃষ্টি আর বন্যার শব্দের মধ্যে কোথায় তলিয়ে যায় সেই ভাঙাগলার চিৎকার!

বাঁধের ভাডুলে গাছের নীচেই ছিল তার ঘর আর ক্ষেতটুকু—গঙ্গার পাড় বরাবর। ভাডুলে গাছটা কাত হয়ে জলে পড়ে আছে। স্রোত তাকে মূলসুদ্ধ টানছে। এতোয়ারির কুঁড়ে ঘর নেই। বিশাল ধসের দাগ বাঁধের কিনারায়। টের পাওয়ামাত্র এতোয়ারি জ্ঞানশূন্য হয়ে বিকট চেঁচিয়ে ঝাঁপ দেয়।

তারপর বুঝতে পারে মা'গঙ্গা তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে চোখ খোলে সে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে তাকানো যায় না। তখন চোখ বোজে। হেই ঠাকুরবাবা। যেখানে নিয়ে যাবি, নিয়ে চল না, এতোয়ারির পরোয়া নেই।......

শেষ রাতের দিকে ঝড় বৃষ্টি থেমেছিল। নিষাদবাগের লোকেরা তখন উত্তরের স্লুইস গেট পেরিয়ে শহরের কাছাকাছি বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। ওদিকটা যথেষ্ট উঁচু। যে যে-অবস্থায় ছিল পালিয়ে বেঁচেছে। ল্যাংড়া রঘুয়ার পিসি অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে। কদিন আগে শরত তাকে শহরে নিজের নতুন ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। নির্মলার গালমন্দে বুড়ির গেরাহ্যি কখনও ছিল না। কানে কালা। চাট্টি খেতে পেলেই ও খুশি। শুধু ল্যাংড়া গুনিনের বিপদ হল। তাকেও যেতে বলেছিল শরত। দেমাক দেখিয়ে যায় নি। ঝড়বৃষ্টি থামলে সকালে আকাশে মেঘের কুটোটি নেই, খাঁ খাঁ উজ্জ্বল নীল। কিন্তু বাঁধে ল্যাংড়া রঘুয়া নেই। ঠ্যাঙ ভাঙা একটা দাঁড়কাক অশত্থ গাছে ডাকছে দেখে অনেকেই ধরে নেয়, গুনিন এখন গতিক বুঝে দাঁড়কাক হয়ে গেছে। তার দুধের গরু আর বাছুরটা এসে অবশ্য আশ্রয় নিয়েছে। শরতের দেওয়া ছাগলটা বুড়ি তক্ষুণি নিয়ে যায় নি, পরে শরতের এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল। ছাগলটাও বুদ্ধিমতীর মতো ঠিক

সময়ে বাঁধে গিয়ে জুটেছিল। সকালে একমাইল অটুট উঁচু বাঁধের ওপর নানা বয়সী মানুষ আর হরেক জন্তু-জানোয়ারের ভিড় জমে গেছে। আর বুকফাটা কান্না, কান্না, বিলাপ। ঠাকুরবাবার ভারিভুরির উদ্দেশ্যে করুণ অনুযোগ। নয়ানসুখ বুক চাপড়ায় আর বলে—পাপ ঢুকেছিল গে! পাপ নিষাদবাগের ধরম হরণ করেছিল গে। আর ধনপতি গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বউ—সুরযের মা হিজলগাছের তলায় মড়াকান্না কাঁদছে। ধনপতির বুড়ি মা—যাকে কতবার চিতেয় পোড়ানোর আয়োজন হয়েছে, সে বহুকে গম্ভীরমুখে ঠাকুরবাবার লীলা সমঝাচ্ছে। প্রৌঢ়া বহুকে সমঝানো সহজ নয়।

আর সূর্য গেছে টৌনে। এমন বিপদের দিনে লিখাপড়হা ছেলে টৌনে কি রঙবাজী করতে গিয়েছিল? মোটেও না। সকাল হতে-হতে রিলিফের নৌকো সারসার বেরিয়ে পড়েছে শহরের ঘাট থেকে। কয়েকটা নিষাদবাগের দিকে চলেছে। সেই দলে সূর্য। চিনতে পেরে এরা চেঁচিয়ে ওঠে—হেই সুরযপাতিয়া। সূর্য হাত নাড়ে। কিন্তু কোথায় নিষাদবাগ? অতল জল।

রাধারঘাটের ঘাটোয়ারী চৌবেজীর সব নৌকো রিলিফে নেমেছে। ওদিকটা উঁচু। কলাবেড়িয়ার বাঁশবনের তলা দিয়ে জল বইছে আগের মতোই। এতটুকু জল ওঠেনি পাড়ের ওপর। চৌবেজীর নৌকায় সেই খবর এল। শহরের বাবুরা ভি এসেছেন। নিষাদবাগওয়ালাদের জন্যে শহরে স্কুলবাড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে মানুষ আর গৃহপালিত পশুপাখির মিছিল স্তব্ধভাবে শহরের দিকে এগিয়ে যায়।

ভিড়ের মধ্যে সরস্বতী কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলে। হঠাৎ পাশের লোকটার হাত ছুঁয়ে চুপিচুপি বলে বেটা! আমার ছোটীর পাত্তা মিলেছে?

—নেহি রী মোসি।

শান্ত কণ্ঠস্বরে কখনও বলে—বেটা। আমার এতোয়ারিকে দেখছিনে কাঁহে গে?

—এতোয়ারি? সে তো কাল মহুলার হাটে গিয়েছিল।..

জবাব শুনে সরস্বতী শুধু মাথাটা দোলায়। ছাগলটা টেনে আনতে ভোলেনি সে। দড়ি টানতেও হয় না। ছাগলটা তার পিছন পিছন আস্তে আস্তে হেঁটে যায়।

পরদিন দুপুরে স্কুলবাড়ির লোঙ্গরখানায় বিরাট-বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি চেপেছে। ক্ষুধার্ত নিষাদবাগওয়ালা ছোঁক-ছোঁক করছে সেদিকে তাকিয়ে। মাথায় গামছা জড়িয়ে সূর্য ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সরস্বতী বুড়ি ছাগলের দড়ি হাতে বারান্দার কোণায় বসে একেওকে মিনতি করছে, সামনের ওই গাছ থেকে একটা ডাল অন্তত ভেঙ্গে দিক, ছাগলটা মারা পড়বে যে। সেই সময় হাটুয়াকে দেখা গেল। তার সঙ্গে ছোটী। ভিড় জমে গেল তাকে ঘিরে। হাটুয়া একশো মুখে জানায় ছোটীকে কোথায় পেল। বাজারে থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল বেচারী। ভাগ্যিস হাটুয়া একটা কাজে আজ

শহরে এসেছিল। না-খাওয়া মুখ দেখে সে এতোয়ারির বোনকে পেটভরে ভাত খাইয়েছে হোটেলে। পান ভি খেতে চেয়েছে ছোটী। ঠোঁটে এখনও লাল রঙ। রাঙা ঠোঁটে মায়ের দিকে তাকিয়েই সে কেঁদে ওঠে। মা তার পিঠে শান্ত হাত রেখে বলে—দাদার খবর জানিস গে?

ছোটী জানেনা। ফুঁপিয়ে কাঁদে—দাদা রে! ওরে আমার সোনার চাঁদি দাদা!··

বিকেলে ইস্কুলবাড়িতে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কলাবেড়িয়া থেকে দুটো ছোট্ট নৌকো এসেছে। দু'বস্তা চাল, একবস্তা ডাল আর একগাদা আনাজপাতি বাঁধে বয়ে আনছে লোকেরা। তারপর বাঁধ থেকে নীচে ইস্কুল বাড়ির লোঙ্গরখানায় এনে ধনপতির ছেলে সূর্য বলে—তোমাদের গাঁওবালারা পাঠিয়েছে বুঝি? খুব খুশি হলাম দাদা! নিষাদবাগবালা একথা ভুলবেনা। নতুন মোড়লকে বোলো। বোলো, নিষাদবাগের মুখিয়ার বেটা বলেছে একথা।

লোকটা বলে—নেহি জী। গাঁওবালারা এখনও চাঁদা তুলছে। এসে যাবে সাঁঝতক। এগুলো নিয়ে এসেছে—ওই যে, পুরান মোড়লের বেটি।···তারপর একটু হেসে ফের বলে—নিষাদবাগের বহু। শ্বশুরগাঁয়ের বিপদে সে কি চুপ করে থাকবে জী? কলাবেড়িয়ার বেটির মনটা নিষাদবাগের বেটার মতো পাত্থরকা মাফিক নয় ভাই সুরযপতিয়া।

সূর্য তাকায়। হ্যাঁ, ওই তো এতোয়ারির সেই রূপসী বহু। নিষাদবাগের মেয়েরা তাকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে। এতোয়ারির বোন তার কোমর জড়িয়ে ধরে পিঠে মুখ গুঁজেছে। সূর্য আরও অবাক হয়। ফুলকলিয়ার চোখে জল ছলছল করছে। তারপর ভিড় ঠেলে এতোয়ারির মা ঢোকে। যে-বহুর চুল ধরে পিট্টি দিয়েছিল, উঠতে বসতে যার হাজার নিন্দামন্দ করেছে—এখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে—ও গে হামার সোনাচাঁদির বহু গে। হামার এতোয়ারি কাঁহা গেইলে, ঢুড়কে আন গে।

তারপর সরস্বতী আবার দম নিয়ে চেঁচায়—হারামী নয়ানসুখ! ওই হারামীর বেটি রাক্ষুসী আমার জানের বেটার জান খেয়ে ফেলেছে বহু গে। নিজে ভি গেছে, বালবাচ্চা ভি সঙ্গে লিয়ে গেছে—ঔর হামার বেটাকো ভি খা লিছে বহু গে!

কোথায় ছিল নির্মলা, ভিড় ঠেলে ঢুকে বলে—চুপ তো বুড়ি। তোর বেটাকে কেউ খায়নি। আমার মরদ রিলিফের নৌকোয় গিয়েছিল। এতোয়ারিকে তুলে এনে হাসপাতালে দিয়েছে। চৌরিগাছির ওদিকে বিলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে জলটুঙ্গিতে উঠেছিল এতোয়ারি। তিনদিন না খাওয়া। মড়ার মত কাহিল। গাছের ডালে ডালে সাপ ঝুলছে। তার মধ্যে বেচারা ধুঁকছে। ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল ওদের।...

ধবধবে সাদা নরম বিছানা। এমন বিছানায় শোয়া ভাগ্যের কথা বইকি। এতোয়ারি বারবার হাত বুলিয়েছে। বিশ্বাস হয়নি। ঠাকুরবাবা তাকে এখনও স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তবে স্বপ্নের একটা অংশ এখনও ভারি খারাপ—যখন তাকে ওষুধ গেলানো হয়। জোর করে ধরে সুঁই ভি ফুটিয়ে দেয়। কারোর পায়ের শব্দ পেলেই সে ভয়ে চোখ বোজে।

—এতোয়ারি। ও গে এতোয়ারি। উঠ, উঠ। দেখ কৌন আয়া।

নির্মলার কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খোলে এতোয়ারি। আশ্বস্ত হয়ে একটু হাসে।—বহুদিদি।

—ইধার দেখ না, ভড়ুয়া কাঁহেকা!

এতোয়ারি ঘুরতে গিয়ে চমকে ওঠে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় কয়েকমুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নির্মলা তার পাশে বসে ফের বলে—ভেড়ুয়া কাঁহেকা! এতদিন বাদে দেখছিস, মুখে কি সেলাই পড়েছে? বাত বলছিস না কেন গে?

পরম অভিমানে এতোয়ারি আস্তে বলে—কী বলব? বড়ঘরের বেটি। হামি এক নাদান। আর এখন তো হামি ভিখিরি বনে গেছি বহুদিদি গে! হামার ভুঁই নাই। ঘর বানাবার মাটিভি একটুকুন নাই!

নির্মলা ফুলকলিয়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে এতোয়ারির পাশে বসিয়ে দেয়। তারপর বলে—এলি তো একেবারে আকাশপাতাল করতে করতে! এখন তোর মুখেও বোবা ধরল বহুরি-কালী মেয়ে কোথাকার? বাত তো বলবি মরদকে!

অস্ফুটস্বরে ফুলকলিয়া অভিমানে বলে—কী বলব রী দিদি! পাত্থর! বরাবর পাত্থর যে, তাকে কি বলব?

এতোয়ারি বলে—বলেছিলাম, কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি যদি এসে নিজ মুখে ছাড় চায়, একঠো রুপেয়া ভি নেবনা—ছাড় দেব। তো আজ কলাবেড়িয়ার মোড়লের বেটি এসেছে। বেশ। মরদকা বাত, হাঁতিকা দাঁত। হামি ওকে···

ফুলকলিয়ার রেশমি চুড়ি পরা ডানহাতটা গিয়ে পড়ে গোঁফ দাঁড়িওলা জঙ্গুলে মুখে। সে অস্ফুট আর্তস্বরে বলে—না! না! হামি ছাড় লিতে আসি নি জী!

—তবে কেন এসেছে মোড়লের বেটি? হাতটা সরিয়ে দিয়ে এতোয়ারি একটু হাসে। হামার দশা দেখতে? হামি নকছেদীর বেটা এতোয়ারি। হামি আবার বিভা করব। আবার মহাজনের কাছে রুপেয়া ধার করব। মাগঙ্গার পাড়ে ডেরা বাঁধব। হাঁ—হামি নকছেদীর বেটা!

নির্মলা চোখ পাকিয়ে বলে—তুই বীরের বেটা মহাবীর! বুদ্ধু কোথাকার! চোখ আছে তোর? গিদ্ধড় বুড়বাক বেকুফ। বহুটা কাঁদছে, আর বড়বড় বাত ফোটাচ্ছে মুখে!

এতোয়ারি অবাক হয়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে। ফুলকলিয়ার দু'কাঁধে হাত রেখে বলে—কাঁদছিস বহু? কাহে গে? হামাকে তোর এত্তা পসন্দ? তো কভি এমন কথা বলিসনি, কাহে বলিস নি বহু? হামি নয়ানসুখের বেটিকে ভাগিয়ে দিলাম। যদি ও কথা জানতাম, বেচারীকে বিভা করতাম না। আর বিভা না করলে সে হামার সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে ঘরভি করতে যেত না। না গেলে বেচারী জানে বেঁচে যেত। ওর বাচ্চাটাও বেঁচে যেত। এখন দেখ্, তো গে কী মুশকিল! ওই বাচ্চাটা মরার পাপ আমাকে লেগে গেছে। আমি কী করি, তুই-ই বল বহু।

হাসতে হাসতে নির্মলা বলে—তো একটা বাচ্চা হলেই সে পাপ চলে যাবে ভাই এতোয়ারি। তোরা তো বাঁজাবাঁজিন নোস।

এতোয়ারি চুপ করে আছে দেখে সে ফের বলে—হামার বাতঠো সমঝালি?

এতোয়ারি তাকায়।

নির্মলা ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে—চষ্টিমাসে যখন তোর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যায়, তখনই ওর পেটে তোর বাচ্চা ছিল, জানিস? মোড়ল মরার পর একদিন গিয়ে দেখি, উঠোনের কোণায় বসে ওয়াক তুলছে। তারপর আর কোন মুখে ছাড়ের কথা ভাবে, বল্ না তুই?

এতোয়ারি শুধু ঘন-ঘন মাথা দোলায়। নিষাদবাগে তার ঘরের সেই পুরনো সুন্দর মেয়েলি গন্ধটা আবার সে ফিরে পেয়েছে। তন্ময় হয়ে শোঁকে সে। খালি মনে হয়, তার খুব কাছেই আরেক শান্ত নির্জন গঙ্গা বয়ে চলেছে।

**শেষ**